এই বেদবাক্য হইতে বুঝা গেল যে ব্রাহ্মী-শক্তি ব্রহ্ম হইতে অস্বতন্ত্র, ব্রহ্মরূপে স্থিতা, পরব্রহ্মের আত্মভূতা এবং বিবর্ত্তকারণরূপে জগতের জন্মস্থিতিভঙ্গের মূল হেতুভূতা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবস্বরূপিণী চৈতন্যময়ী শক্তি। পরমার্থ দৃষ্টিতে তিনি নির্গুণা। এবং তিনি সাংখ্য-পরিকল্পিত প্রধান, এবং জীবের অজ্ঞান ও কর্ম্মরূপিণী সমলা প্রকৃতির অব্যক্ত ও ব্যক্ত-তত্ত্বের আশ্রয়স্বরূপিণী অথচ মহানির্গুণ। এই আশ্রয় আশ্রিত লক্ষণাবশতঃ উক্ত প্রধান ও প্রকৃতির গুণ তাহাতে উপন্যস্ত ও আরোপিত হওয়ায় তিনি সগুণা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

তথাচ প্রাণতোষিণী (৮পৃ) সারদায়াং—"তে রুদ্র ব্রহ্মরমাধিপাঃ শিব, ব্রহ্ম, নারায়ণা যথা ক্রমঃ জ্ঞানশক্তীচ্ছাশক্তি ক্রিয়াশক্তিস্বরূপা ইত্যর্থঃ।" গোরক্ষসংহিতায়ামপি "ইচ্ছা ক্রিয়া তথাজ্ঞানং গৌরীব্রাহ্মীতুবৈষ্ণবী॥"

জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি এই ত্রিবিধা শক্তি। এ তিনটিই ঐ একমাত্র ব্রহ্মের একই শক্তি। কেবল তিনভাগে দৃষ্ট হন। তন্মধ্যে জ্ঞান গৌরীশক্তি, ইচ্ছা ব্রহ্মাণী শক্তি এবং ক্রিয়া বৈষ্ণবী শক্তি। অতএব ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মিকা। ইহার মতান্তরও আছে। যাহা হউক, তিনি পরব্রহ্মেরই জ্ঞান, ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিস্বরূপিণী। তিনি কদাপি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র নহেন। তবে যে তিনি জগদুদয়-স্থিতিলয়ের কারণ তাহা কেবল "বিবর্ত্ত-উপাদান" ন্যায় দ্বারা। জীব স্বীয়কর্ম্মসূত্রে যে পরিমাণ প্রকৃতি বা স্বভাব উপার্জ্জন করেন তাহার মূল ভাণ্ডার ঐ শক্তি বটে, কিন্তু কর্ম্মব্যপদেশ হেতু উক্ত শক্তি তাহার বিবর্ত্ত-উপাদান কারণ মাত্র। অতএব উক্ত শক্তি নির্ম্মলা, মহাবিদ্যা ও ব্রহ্মময়ী। কিন্তু সৃষ্টিতে পরিণতা কর্ম্মজা শক্তি সমলা, অবিদ্যা এবং বন্ধন-স্বরূপিণী। মর্ত্ত্যপুরেও তিনি বন্ধন, স্বর্গেও তিনি বন্ধন। কিন্তু ব্রহ্মময়ী বিদ্যাশক্তির আবির্ভাব দৃষ্ট হইলে ঐ বন্ধন মোচন হয়। আর তাঁহার পরোক্ষজ্ঞানাবলম্বিত অর্চ্চনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধিরূপ মুক্তির পথ প্রস্তুত হয়। "সর্ব্ব-বেদময়ী দেবী সর্ব্বমন্ত্রময়ী তথা।" (প্রাঃ তোঃ ১০ পৃষ্ঠা)। বেদ ও আগমমন্ত্রো-চ্চারণযুক্ত ক্রিয়াতে ঐ আবির্ভাব ও চিত্তশুদ্ধি উভয়ই লাভ হয়। সেই মহাদেবী শব্দব্রহ্ম-রূপিণী, অতএব সর্ব্ববেদময়ী এবং সর্ব্বমন্ত্রময়ী মহাবিদ্যাস্বরূপিণী।

৭৪। এস্থানে সমস্ত হিন্দুধর্ম্মসেবী মহাত্মা-গণের পক্ষে একটি কথা বিশেষরূপে মনে রাখা কর্ত্তব্য। আমি ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি যে, দুর্গা কালী প্রভৃতি দেবীগণ, দর্শনশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য প্রকৃতি বা মায়া নহেন; কিন্তু বেদ পুরাণ ও আগমবিহিত অর্চ্চনীয়া পরমা প্রকৃতি ও মহামায়াস্বরূপিণী মহাশক্তি। মন্ত্র ও যজ্ঞ-শাস্ত্রানভিজ্ঞ, উপরিউক্ত দর্শনসমূহের অপরিপক্ক জ্ঞানিরা মানবের অবিদ্যাপ্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে পরব্রহ্ম হইতে অপৃথগ্‌ভূতা ব্রহ্মময়ী পরমা-প্রকৃতিকেও পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহাকে অচেতন জড়শক্তি কহেন এবং ভব-বন্ধনের কারণ বলিয়া অনুমান করেন। কিন্তু আগম শাস্ত্র, তদ্বিপরীত এমন আশ্চর্য্য ও মনোহর শিক্ষা দিয়াছেন; শুদ্ধ শিক্ষা নহে, কিন্তু ঘরে ঘরে মন্ত্রদীক্ষাপ্রণালী স্থাপন করিয়াছেন; শুদ্ধ তাহাও নহে, গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে এমন আশ্চর্য্যরূপে উক্ত মহামায়া

শক্তিদেবীর নানা মূর্ত্তি উপলক্ষিত নিষ্কাম পর্ব্বোৎসব সকল অনুষ্ঠানে পরিণত করিয়াছেন; এমন আশ্চর্য্যরূপে শব্দব্রহ্মস্বরূপ বেদ হইতে কুলবধূর ন্যায় গুপ্ত বীজমন্ত্রসকল উদ্ধার করিয়া যাহাতে গুরু পুরোহিত অধ্যাপক ও যজমান-দিগের বোধগম্য হয়, তাদৃশভাবে প্রসারণ করিয়াছেন এবং তদ্ভিন্ন এমন আশ্চর্য্যরূপে সতিঅঙ্গপূত পীঠস্থান সকলের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করিয়াছেন যে, এই সকল আশ্চর্য্য শিক্ষাদ্বারা পরমা প্রকৃতিশক্তির অচেতন ও মায়াবন্ধকত্বরূপ মিথ্যা অপবাদ রহিত হইয়া তাঁহার চৈতন্য-স্বরূপত্ব ও পূর্ণব্রহ্মত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শুদ্ধ তাহা নহে, সমস্ত আগমে ইহা বিজ্ঞাপিত হইয়াছে যে শক্তি বিনা ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব অচেতন ও প্রেতমাত্র।

(১২) ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ, মহামায়াশক্তিতে সমুচ্চিত।

৭৫। ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব একই পরমেশ্বর এবং দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীগণ একই মহাশক্তি। এই মহাশক্তি, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবা-ত্মিকা এবং ব্রহ্মময়ী। তিনি পরব্রহ্ম পরমেশ্বর হইতে অস্বতন্ত্রা। একথা পূর্ব্বে বুঝান গিয়াছে। সেই শক্তিকে যদি ব্রহ্মাদি সংজ্ঞিত ঈশ্বরগণ হইতে ব্যতিরেক কর, তবে তাঁহারা শক্তিহীন সুতরাং জড় অথবা প্রেতমাত্র হইবেন। অতএব ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আদি ঈশ্বরগণের স্ব স্ব শক্তি সমুচ্চিত পূর্ব্বক তাঁহাদের আরাধনা করিবেক। অবশ্য পক্ষান্তরে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, সেই মহাশক্তি তাহাদিগ হইতে স্বতন্ত্রা নহেন। তিনি শুদ্ধ তাঁহাদিগের গর্ভধারিণী নহেন, কিন্তু চৈতন্যরূপিণী ব্রহ্মশক্তি। কেননা সেই মহামায়া-শক্তির যোগে, পরব্রহ্ম আপনার ঐ সমস্ত রূপ প্রকাশ করেন। অতএব আগমশাস্ত্রে কহিতেছেন। (প্রাণতোষিণী)

ব্রহ্মাণী কুরুতে সৃষ্টিং
ন তু ব্রহ্মাকদাচন।
অতএব মহেশানি
ব্রহ্মা প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাং
ন তু বিষ্ণু কদাচন।
অতএব মহেশানি
বিষ্ণুঃ প্রেতো ন সংশয়ঃ॥
রুদ্রাণী কুরুতে গ্রাসং
ন তু রুদ্র কদাচন।
অতএব মহেশানি
রুদ্রপ্রেতো নসংশয়ঃ॥
ব্রহ্মবিষ্ণু মহেশাদ্যা
জড়াশ্চৈব প্রকীর্ত্তিতাঃ।
প্রকৃতিঞ্চবিনাদেবি
সর্ব্বকার্য্যাক্ষমাধ্রুবং॥ নির্ব্বাণতন্ত্রে প্রথম পটলে। প্রাঃ তোঃ ৯পৃ॥

প্রেতেপূজা মহেশানি
কদাচিন্নাস্তি পার্ব্বতি।
রুদ্রস্য পরমেশানি
রৌদ্রীশক্তিরিতীরিতা॥
রৌদ্রীতু পরমেশানি
আদ্যা কুণ্ডলিনী ভবেৎ।
বর্ত্ততে পরমেশানি
ব্রহ্মবিষ্ণু শিবাত্মিকা॥
শক্তিং বিনা মহেশানি
প্রেতত্বং তস্যনিশ্চিতং।
শক্তিসংযোগমাত্রেণ
কর্ম্মকর্ত্তা সদাশিবঃ॥ লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে দ্বিতীয় পটলে। প্রাঃ তোঃ ৩৬৬পৃ।

এই সকল বচন সহজ বিধায় অর্থ লেখা গেল না।

স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ রাম কৃষ্ণাদি ভিন্ন ভিন্ন নামাবলম্বিত যে একমাত্র পরমেশ্বর তিনি সদা মূলপ্রকৃতিরূপিণী বিদ্যা-শক্তিযুক্ত। অতএব তিনি ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়া প্রভৃতি সর্ব্বশক্তিমান। আর দুর্গা রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী ও সাবিত্রী প্রভৃতি নামরূপাবলম্বিত যে একমাত্র মহামায়া শক্তি বা পরমা প্রকৃতি তিনি সদা উক্ত নানা নামরূপাত্মক একমাত্র পরমেশ্বরে যুক্ত। অতএব তিনি ব্রহ্মময়ী। বিপ্রতিপত্তি-বিচারানুরোধে এই "যুক্ত" শব্দের ব্যবহার। নচেৎ আমাদের ভবনে ঐ যত দেবতার অর্চ্চনা হয়, আমরা তাঁহাদিগকে, যথা যেমন ব্যবহার এক এক ঈশ্বর অথবা ঈশ্বরী জ্ঞানে পূজা করিয়া থাকি। আমাদের ফলকামনা থাকিলেও, তাদৃশ ঈশ্বরজ্ঞান ( বিহিত সংকল্প ও বিহিত ব্রহ্মার্পণ জন্য ) সে কামনাকে অর্থবাদের সীমা হইতে উদ্ধার করিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রের উপদিষ্ট কর্ম্মযোগের সার্থক্য সম্পাদন করে। এই সমস্ত উপাসনাই ক্রমে জ্ঞানসাধনের অধিকার সমুৎপন্ন করে। তন্মধ্যে শ্রুতি, বেদান্ত, আগম, পুরাণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং অন্যান্য গীতা প্রভৃতি যে কোন শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য আত্মবিদ্যার যৎপরিমাণ শ্রবণ ও ব্রহ্মবিচার যে উপাসকের আছে তাঁহার উপাসনা তৎপরিমাণ মোক্ষের অনুকূল। উপনিষৎ ও ভগবদ্গীতাতে যেরূপ ব্রহ্মোপাসনা ও আত্মজ্ঞানপ্রতিপাদক উপদেশ আছে, তন্ত্রশাস্ত্রেও সেইরূপ উপদেশ সকল প্রচুররূপে দৃষ্ট হয়। ষষ্টিবর্ষপূর্ব্বে তান্ত্রিক সাধকদিগের মধ্যে তাহার মহা অনুশীলন ছিল। তন্ত্রের ব্যাখ্যাত আত্মজ্ঞানের মর্ম্মানুধ্যানপূর্ব্বক তাঁহারা শক্তি, শিব ও কৃষ্ণভক্তির সহিত তাহা সংযুক্ত করিতেন, কখন বা তান্ত্রিক জপ যজ্ঞ সাধনে ও যোগাভ্যাসে সেই আত্মজ্ঞানের অমৃতরস সংযোগ করিতেন। নিম্নস্থ কয়েকটি সঙ্গীতাংশ হইতে তাঁহাদের আত্মজ্ঞানানুশীলনের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

(১) ভজরে বোসে মন মদনান্তকরমণীমানসে।
নাহি পর্য্যটন শ্রম, প্রেমগন্ধ ভাবকুসুম,
তৈজধূপদীপ মন আছে তব পাশে॥
সহস্রারামৃতপাদ্য অর্ঘ্য দেহ মন।
ভক্তিসুধা নবনৈবেদ্য কররে অর্পণ॥
কাম আদি ছয় জন, বলির আছে নিয়োজন,
জ্ঞানরূপাণে ছেদন কর অনায়াসে।
হোমকুণ্ড কর শ্রদ্ধা সমিধসমাধি।
ব্রহ্ম অগ্নি জ্বাল তাহে মন এই বিধি॥
হোতা হও ত্যজ কর্ম্ম, দার্ঢ্যঘৃতে রাখ মর্ম্ম,
আহুতি দেও ধর্ম্মাধর্ম্ম তুমিরে হেঁসে।

(২) কবে সমাধি হব শ্যামাচরণে।
অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসার বাসনা সনে।
ইত্যাদি॥

(৩) করযোগে মনোযোগ মনরে আমার।
সাধিয়ে সমাধি বিধি ভাব ভবাম্বুধিপার।
তোমার বলি কর স্তুতি, ভজ ব্রহ্মানন্দ জ্যোতিঃ,
তত্ত্বমসি ইতি শ্রুতি তন্ত্রেতে নিস্তার।
ইত্যাদি॥

(৪) অবিদ্যাঘনে করিল নিবিড় অন্ধকার।
অহমেতি মমেতি নাদে গর্জ্জে বারেবার।
ইত্যাদি॥

উঁহাকে "সূর্য্যবংশ" বলিয়া থাক, তাহাও ভ্রষ্ট বিকৃতি হইতেছে।

বলিবে, তবে কেন মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে বলিলেন "ক সূর্য্য প্রভবোবংশঃ"? কালিদাস বলিয়াছেন, তাহা ঠিক, কিন্তু তাঁহার কি ভ্রম প্রমাদ হইতে পারে না?। কালিদাস কি উক্ত রঘুবংশে ইহাও লিখিয়া যান্ নাই যে অযোধ্যার রাজবংশ বৈবস্বত মনু হইতে প্রাদুর্ভূত!

বৈবস্বতো মনুর্নাম
মাননীয়ো মণীষিণাং।
আসীন্মহীক্ষিতামাদ্যঃ
প্রণবশ্ছন্দসা মিব॥ ১১
তদন্বয়ে শুদ্ধিমতি
প্রসূতঃ শুদ্ধিমত্তরঃ।
দিলীপ ইতি রাজেন্দুরিন্দুঃ
ক্ষীরনিধাবিব॥ ১২—১ম স্বর্গ।

বিবস্বতের পুত্র মনু, মনুর পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র দশরথ, দশরথের পুত্র রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। সুতরাং এই বংশকে বৈবস্বত বংশ ভিন্ন কি প্রকারে ও কি কারণে সূর্য্যবংশ বলা যাইতে পারে?

বলিবে, সূর্য্য ও বিবস্বান্ ত একই বস্তু! হাঁ, তোমরা শূন্যের জড় সূর্য্যকে সূর্য্য, বিবস্বান্, আদিত্য, ভগ, পূষা, অর্য্যমা, মিত্র, মার্ত্তণ্ড, ও কাশ্যপেয় প্রভৃতি আরও কত কি বলিয়া থাক। উহাও প্রমাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তোমরা যে—

জবাকুসুমসঙ্কাশং
কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং
প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

বলিয়া জড় সূর্য্যের স্তুতি করিয়া থাক, ইহাও প্রমাদভূয়িষ্ঠ। জড়-সূর্য্য কি দেবমাতা অদিতির গর্ভে কশ্যপের ঔরসে সঞ্জাত? যদি তাহা যুক্তিসিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে তোমরা উঁহাকে কোন্ কারণে আদিত্য বা কাশ্যপেয় বলিয়া প্রখ্যাপিত কর? আর জড়-সূর্য্যের বিবস্বান বা ভগাদি নামের সমাগমই বা কোথা হইতে হইল? ফলতঃ মানুষ যখন নরদেবতা বিবস্বান্ ভগ ও অর্য্যমা প্রভৃতির কথা ভুলিয়া গেলেন, নরসূর্য্য যখন জড়সূর্য্যে পরিণত হইলেন, তখন নরসূর্য্যের ভ্রাতা বিবস্বান্ প্রভৃতিও যাইয়া জড় সূর্য্যের অভিধেয় হইয়া পড়িল। বস্তুতঃ এতৎ সমুদয় জীবন্ত প্রমাদ। অবশ্য জড় সূর্য্যের নাম ভাস্কর, দিবাকর, রবি, ভানু, সূর্য্য, তপন, ও মিহির প্রভৃতি। কিন্তু তাই বলিয়া তোমরা মানুষ-সূর্য্যকে ভাস্কর বা তপন ও জড়-সূর্য্যকে আদিত্য বা বিবস্বান্ বলিয়া সূচিত করিতে পার না।

তবে বিবস্বান্ প্রভৃতি প্রকৃত প্রস্তাবে কে? দেবমাতা অদিতির গর্ভে ধাতা, ভগ, অর্য্যমা, মিত্র, ত্বষ্টা, বরুণ, বিবস্বান্, সূর্য্য, সবিতা, ইন্দ্র, পূষা ও বামনবিষ্ণু, এই দ্বাদশ পুত্র জন্মে। অদিতির পুত্রত্বনিবন্ধন ইঁহারাই দ্বাদশ আদিত্য নামের বিষয়ীভূত। শূন্যে নিত্যদৃশ্যমান জড়-সূর্য্যের এই নাম গুলি নহে।

মারীচাৎ কশ্যপাৎ জাতা
স্তেঽদিত্যা দক্ষকন্যয়া॥ ১৩০॥
তত্র বিষ্ণুশ্চ শক্রশ্চ
জজ্ঞাতে পুনরেব চ।

# কয়েকটা ভুল।

—★—

সেই বৈদিকযুগের সায়াহ্নকাল হইতে কয়েকটা ভুল চলিয়া আসিতেছে, এবং এখন সেগুলি শিকড় গজাইয়া সত্যে পরিণত হইয়া আসল হইয়া বসিয়াছে। সাহিত্যজগৎ কি এখনও সেই ভুলগুলিকে সাদরে আলিঙ্গন করিবেন?

১। প্রথম ভুল, তোমারা যে চন্দ্র ও সূর্য্য-বংশকে Lunar ও Solar Race বলিয়া দাগাইয়া থাক, উহাই। মানুষ কি কখন কোন জড়পিণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে? না কোন জড়পিণ্ডের গর্ভাধান করিবার শক্তি থাকা সম্ভবপর!

সাগরমন্থনে চন্দ্র হইল উৎপন্ন।
হইল চন্দ্রের পুত্র বুধ অতি ধন্য॥
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুন্দর।
চন্দ্রবংশ রচনা করিলা কবিবর॥

প্রথমতঃ সমুদ্রমন্থনে জড় নর কোন চন্দ্রেরই উৎপত্তি হয় নাই ও হইতে পারে না। কবিগণ উৎপ্রেক্ষাচ্ছলে মনঃপ্রহ্লাদন শূন্যের জড় চন্দ্রকে সমুদ্রমন্থনসমুত্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তৎপর সেই জড়চন্দ্র বুধের মাতার গর্ভোৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুধ ও চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হইয়াছে, ইহা কি যুক্তির অতীত পদার্থ নহে? বস্তুতঃ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র অত্রি, সেই অত্রির পুত্র মহারাজ চন্দ্র। তাঁহার রাজ্যের নাম চন্দ্রমণ্ডল, 'উহা মঙ্গলিয়ার ঠিক উত্তরে অবস্থিত। উহার নামান্তর মহর্লোক বা রম্যকবর্ষ, অর্থাৎ দক্ষিণ-সাইবিরিয়া। তথায় অপর্য্যাপ্ত শস্য হইত, ঐ শস্য খাইয়া ইন্দ্রাদি দেবতারা জীবনধারণ করিতেন, তজ্জন্য সেই নরচন্দ্রের নাম "ওষধীশ"। এবং সুপর্ণ সর্ব্বাদৌ তথায় সুধা বা মদ্যের উৎপাদন করেন, তজ্জন্য চন্দ্রের নামান্তর "সুধাকর"। এই চন্দ্রই সুরজ্যেষ্ঠ ব্রহ্মার সময়ে প্রজাপতি বা সামন্তরাজপদে বরিত ছিলেন। তিনিই শ, ষ, স, হ, এই উষ্মবর্ণচতুষ্টয়ের উদ্ভাবয়িতা ও চান্দ্র ব্যাকরণের রচয়িতা। অতএব সাহিত্যজগৎ যে চন্দ্রবংশকে Lunar Race বলিয়া থাকেন, ইহা সঙ্গত কি না, ও সকলে যে শূন্যবিহারী জড় চাঁদকে চন্দ্রবংশের প্রবর্ত্তয়িতা বা বীজী পুরুষ বলিয়া ভাবিয়া আসিতেছেন, তাহাও ব্যাহত সংস্কার বটে কি না, তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। এই কুসংস্কারবশতই চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় যবনগণ আপনাদিগের পতাকাদিতে অর্দ্ধচন্দ্র বিলসিত করিয়া থাকেন।

২। তোমাদের দ্বিতীয় মহাভুল অযোধ্যার রাজবংশকে "সূর্য্যবংশ" বলিয়া প্রখ্যাপিত করা। উক্ত রাজবংশ শূন্যের জড় সূর্য্য হইতে নিশ্চয়ই প্রাদুর্ভূত হয় নাই, সুতরাং উহা Solar race পদভাক্ হইতে পারে না। তৎপর উক্ত রাজবংশ যখন জড় বা নর কোন সূর্য্য হইতেই সমুদ্ভূত হয় নাই, তখন তোমরা যে

অর্য্যমা চৈব ধাতা চ
ত্বষ্টা পূষা তথৈব চ ॥ ১৩১ ॥
বিবস্বান্ সবিতা চৈব
মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাদিতিজা
আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ॥ ১৩২ ॥
বিষ্ণুপুরাণ, ১৫অ, ১ম অংশ।

ধাতা মিত্রোঽর্য্যমা রুদ্রো
বরুণঃ সূর্য্য এব চ।
ভগো বিবস্বান্ পূষা চ
সবিতা দশমস্তথা।
একাদশস্তথা ত্বষ্টা
বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে ॥
শব্দসার।

অর্থাৎ ধাতা (পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা, তিনি শেষে উত্তরকুরুতে যাইয়া বাস করেন), মিত্র, অর্য্যমা, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ইন্দ্র, ত্বষ্টা ও বামন বিষ্ণু, অদিতিগর্ভে এই দ্বাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অংশ বা অংশু নাম বোধ হয় লিপিকরপ্রমাদে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। রুদ্রও কশ্যপাত্মজ বটেন, কিন্তু তিনি অদিতিপ্রভব নহেন। শব্দসার ইন্দ্রকে বাদ দিয়া রুদ্রকে গ্রহণ করিয়াছেন, উহাও যেন ঠিক হয় নাই। বেদে মার্ত্তণ্ডের নামও দৃষ্ট হইয়া থাকে। বোধ হয় তিনি বাল্যে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিলেন। অবশ্য মহাভারত বলিতেছেন—

ত্রয়োদশানাং পত্নীনাং
যা তু দাক্ষায়ণী বরা।
মারীচঃ কশ্যপস্তস্যাং
আদিত্যান্ সমজীজনৎ ॥ ১০ ॥
ইন্দ্রাদীন্ বীর্য্যসম্পন্নান্
বিবস্বন্তমথাপি চ।
বিবস্বতঃ সুতো জজ্ঞে
যমো বৈবস্বতঃ প্রভুঃ ॥ ১১ ॥
মার্ত্তণ্ডস্য মনুর্ধীমান্
অজায়ত সুতঃ প্রভুঃ।
যমশ্চাপি সুতো জজ্ঞে
খ্যাতস্তস্যানুজঃ প্রভুঃ ॥ ১২ ॥
৭৫অ, আদিপর্ব্ব।

কশ্যপের ত্রয়োদশ পত্নীর মধ্যে দাক্ষায়ণী অদিতি সর্ব্বজ্যেষ্ঠা। মরীচিতনয় কশ্যপের ঔরসে তাঁহার গর্ভে ইন্দ্র ও বিবস্বৎপ্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বিবস্বানের পুত্র যম ও মনু। যম, মনুর বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন।

এখানে ব্যাসদেব বা অন্য কেহ বিবস্বানের পরিবর্ত্তে মার্ত্তণ্ডশব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। নীলকণ্ঠও বলিয়াছেন—

মার্ত্তণ্ডস্য বিবস্বতঃ যমশ্চেতি
পুনরুক্তিমনুতঃ কনিষ্ঠত্বপ্রখ্যাপনার্থায়।

অর্থাৎ মার্ত্তণ্ড ও বিবস্বান্ একই ব্যক্তি। বেদে মার্ত্তণ্ডের নাম আছে, কিন্তু তিনি ও বিবস্বান যে একই ব্যক্তি, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। যথা—

অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতে
যে জাতা স্তন্বস্পরি।
দেবান্ উপপ্রৈৎ সপ্তভিঃ
পরা মার্ত্তণ্ডমাস্যৎ।
৮—৭২সূ—১০ম।

তত্র সায়ণঃ—অষ্টৌ পুত্রাসঃ পুত্রা মিত্রাদয়ঃ অদিতের্ভবন্তি যে অদিতে স্তন্বঃ পরি শরীরাৎ জাতা উৎপন্নাঃ। অদিতেরষ্টৌ পুত্রা

অধ্বর্য্যুব্রাহ্মণে পরিগণিতাঃ—তথাহি—তান্ অনুক্রমিষ্যামঃ—মিত্রশ্চ বরুণশ্চ ধাতা চ অর্য্যমা চ অংশশ্চ ভগশ্চ, বিবস্বান্ আদিত্যশ্চ।

অদিতির গর্ভে অষ্ট পুত্র জন্মে। তন্মধ্যে তিনি মার্ত্তণ্ডকে পরিত্যাগ করিয়া ( পরে নিয়াছিলেন ), অপর সাতটি পুত্র লইয়া দেবলোকে গমন করেন। অধ্বর্য্যুব্রাহ্মণ সেই আট পুত্রের নাম—মিত্র, বরুণ, ধাতা, অর্য্যমা, অংশ, ভগ, বিবস্বান ও আদিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আর চারি পুত্র পরে হইয়া থাকিবেন। এক ব্যক্তির দুই নাম হওয়া বিচিত্র নয় তাই মনে হয় অংশের নামান্তর পূষা বা অন্য কিছু হইবে। অধ্বর্য্যু যাঁহাকে আদিত্য নামে প্রখ্যাপিত করিতেছেন, তিনিই সূর্য্য-নামা হইতে পারেন। যাহাই হউক, বিবস্বান্ যেমন জড়সূর্য্য ও নহেন তদ্রূপ তিনি নর-সূর্য্য ও নহেন, তিনি নর-সূর্য্যের ভ্রাতা, সুতরাং বিবস্বানের বংশকে সূর্য্যবংশ বলা ভ্রান্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে? মহাভারত যে বিবস্বান ও মার্ত্তণ্ড শব্দ একই ব্যক্তি বুঝাইতে প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও যেন সেই মৌরুসি ভ্রান্তি। ফলতঃ সূর্য্য ও বিবস্বান্ যখন এক ব্যক্তি নহেন, তখন রঘুবংশকে বৈবস্বত বংশ না বলিয়া সূর্য্যবংশ বলা ভ্রমেরই বিষয়। চণ্ডীর প্রারম্ভেই রহিয়াছে—

সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো যো মনুঃ কথ্যতেঽষ্টমঃ।

যে মনু অষ্টম মনু বলিয়া কথিত, তিনি চতুর্দ্দশ মনুর মধ্যে অষ্টম মনু এবং তাঁহার পিতার নাম সূর্য্য ও মাতার নাম সবর্ণা। এই সূর্য্যই সামবেদের মন্ত্রসমাহর্ত্তা, পরন্তু sun নহে। SamaVeda from Sun ইহাও পূর্ণপ্রমাদ, ইহাদ্বারাও সূর্য্য ও বিবস্বানের সম্পূর্ণ পার্থক্য অনুভূত ও প্রতীত হইতেছে। কেননা বৈবস্বত মনু সপ্তম মনু ও তাঁহার পিতা সূর্য্য নহে, পরন্তু বিবস্বান্। অতএব যে সূর্য্য-তনয় অষ্টম মনু হইতে অযোধ্যার রাজবংশ প্রসূত নহে, তাহাকে সূর্য্যবংশ বলা প্রমাদের কার্য্য কি না তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখুন।

বলিতে পার, যদি শূন্যের জড়-সূর্য্যেরই নাম, ভগ, অর্য্যমা ও বিবস্বান্ প্রভৃতি না হয়, তাহা হইলে নিরুক্তকার শাকপূণি প্রভৃতি ও সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় কেন এরূপ বলিতেছেন?

"অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে, ভগ সেই কালের সূর্য্য। যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজঃ অত্যগ্র না হয়, তাবং তাদৃশ স্বল্পতেজা সূর্য্যকে পূষা কহে। অথাৎ পূষা ভগোদয়ের পরকাল-বর্ত্তী সূর্য্য। পূষোদয়ের পরই অর্দ্ধোদয়কাল। ইহার পরই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকে অর্ক বা অর্য্যমা কহে। মধ্যাহ্নকালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে।

দত্ত মহাশয়ের ঋগ্বেদ ১ম খণ্ড—২৯ পৃষ্ঠা। নিরুক্তের টীকাকার দুর্গাচার্য্য বলিতেছেন—( ঋগ্বেদের ২২ সূক্তের ১৬ মন্ত্রের যাস্কক্বত ব্যাখ্যার টীকায় ) বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি যত আহ ত্রেধা নিদধে পদং নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক তৎ তাবৎ? পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে, দিবি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবঃ অগ্নির্ভূত্বাপৃথিব্যাং যৎ কিঞ্চিৎ অস্তি তৎ বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা দিবি সূর্য্যাত্মনা। যদুক্তং তমূ অকৃণ্বন ত্রেধাভুবে কমিতি। সমারোহণে উদয়গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে বিষ্ণুপদে, মধ্যন্দিনে

অন্তরিক্ষে। গয়শিরসি অন্তর্গয়ৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্যো মন্যতে।"

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও আলোচনা করিয়া এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। দত্ত সাহেব— ৪৫ পৃষ্ঠা প্রথম ভাগ।

আমরা সর্ব্বান্তঃকরণেই সামশ্রমী মহাশয় ও দুর্গাচার্য্যের এই ব্যাখ্যার অলীকত্ব প্রখ্যাপনে বদ্ধপরিকর। সামশ্রমী মহাশয় কেন প্রমাণদ্বারা স্বমতের সমর্থন করিলেন না? কে কহে? বা কে কহিয়াছেন? কেহ কহিয়া থাকিলেও আমরা এহেন অযৌক্তিক কাহিনীর সমর্থায়তা হইতে পারি না। শূন্যের স্বর্য্যের নামান্তর যে বিষ্ণু, তাহা কোন বেদে নাই। কেহ ইহা বেদদ্বারা সপ্রমাণ করিয়া দিলে আমরা পসন্ন মনেই স্বীকার করিব। নিরুক্তকারগণের অধিকাংশ কথাই প্রামাণ্য নহে। অবশ্য সায়ণ তাঁহার ভূমিকায় একত্র বলিয়াছেন যে

তস্মাৎ বেদার্থাববোধায় উপযুক্তং হি নিরুক্তম্।

কিন্তু সায়ণ নিজে বা মহীধর কি বা সামশ্রমী মহাশয় পর্য্যন্ত বহুস্থলে যাস্ককে পরিত্যাগ করিয়া নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমরা এহেন রুক্তকভক্তির পক্ষপাতী নহি। ফলতঃ দুর্গাচার্য্য শাকপূণি, ঔর্ণবাভ বা সামশ্রমী মহাশয়, ইহাঁদের কাহার কথা জড়স্বর্য্যের বিবস্বানাদি নামকরণবিষয়ে শ্রোতব্য নহে।

৩। তোমাদের তৃতীয় ভুল এই যে তোমরা গ্রহণকালে চন্দ্র ও স্বর্য্যোপরি পতিত পৃথিবীর ছায়া ও চন্দ্রের অন্তরালকে "রাহু" চণ্ডাল বলিয়া সংসূচিত কর। উহা একটা তমঃ বা অন্ধকার বটে, কিন্তু উহার নাম রাহু হইতে পারে না। পৌরাণিক ভ্রান্তি তোমাদিগকে এই উন্মার্গে নিপাতিত করিয়াছে। কেন? অমরাদিতে তমঃ ও রাহুকে এক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

তমস্তু রাহুঃ স্বর্ভানুঃ সৈংহিকেয়ো বিধুন্তুদঃ।

হাঁ, অমরে এইরূপ ভ্রান্তি বহু রহিয়াছে। অমর এবিষয়ে প্রমাণ নহে। যদি তমঃ বা অন্ধকারের নাম রাহু হয়, তাহা হইলে কোন কাব্যে বা কপোলচল ভাষায় অন্ধকারকে তোমরা রাহু বলিতে দেখ না কেন? অন্ধকার কি চন্দ্রকে পীড়া দেয়? সিংহিকার অপত্যের নাম সৈংহিকেয়। আঁধারের মাতার নাম কি সিংহিকা? ফলতঃ- বিপ্রচিত্তি দানবের ভার্য্যার নামই সিংহিকা, তাঁহার গর্ভে যে ত্রয়োদশ জন দানব জন্মগ্রহণ করেন, রাহু তাঁহাদের জ্যেষ্ঠতম। স্বর্ভানু উক্ত রাহুর ক্ষুল্লতাত। এই রাহুই সময়ে সময়ে মানুষ-চন্দ্র ও মানুষ-স্বর্য্যেকে আক্রমণ পূর্ব্বক উৎপীড়িত করিতেন। কালে মানুষ সকল যখন শাস্ত্রের পঠনপাঠনাপরিশূন্য হইয়া কথকদিগের শরণাপন্ন হইলেন, তখনই রামের অকাল-দুর্গোৎসব ও কুশায় কুশের জন্মের ন্যায় জড় চন্দ্র স্বর্য্যের গ্রহণ ব্যাপার এই মানুষ চন্দ্র স্বর্য্যের মানুষ রাহুকৃত উৎপীড়নে পর্য্যবসিত হইল। হরিবংশ বলিতেছেন—

এতে সর্ব্বে দনোঃ পুত্রাঃ
কশ্যপাদভিজজ্ঞিরে।
বিপ্রচিত্তি প্রধানাস্তে
দানবাঃ সুমহাবলাঃ॥ ৮৯
সিংহিকায়া মথোৎপন্না
বিপ্রচিত্তেঃ সুতাস্তদা। ৯৭
রাহুর্জ্যেষ্ঠস্তু তেষাং বৈ
স্বর্য্যচন্দ্রবিমর্দ্দনঃ॥ ১০১—৩অ

এখন আমরা হরিবংশের এই ঐতিহ্য বিশ্বাস করিব, না যুক্তিশূন্য পুস্তির গল্পে আস্থাবান্ হইব? ক্ষোভ ও দুঃখের বিষয় এই যে ছান্দোগ্যও এই পমাদের মহাকবল হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। উহাতে আছে—"অশ্বইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্রইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য।"

৪। তোমাদের চতুর্থ ভুল এই যে তোমরা স্বর্গ, নরক ও পিতৃলোককে পারলৌকিক ও অভৌম বলিয়া বিশ্বাস কর, আর স্বর্গ ও পিতৃলোককে দুইটি পৃথক বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাক। বিষ্ণুপুরাণ ও শুক্রনীতি এই পারলৌকিক স্বর্গের অস্তিত্ব বিষয়ে একবারেই অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া গিয়াছেন।

মনঃ প্রীতিকরঃ স্বর্গো
নরকস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ।
নরকস্বর্গসংজ্ঞে বৈ
পাপপুণ্যে দ্বিজোত্তম॥

বিষ্ণুপুরাণ।

ভূমৌ যাবং যস্য কীর্ত্তি
স্তাবৎ স্বর্গে স তিষ্ঠতি।
অকীর্ত্তিরেব নরকোনান্যো
ঽস্তি নরকো দিবম॥

শুক্রনীতি।

অর্থাৎ সংকার্য্য করিলে মনে যে প্রীতি বা আত্মপ্রসাদ জন্মে, উহারই নাম স্বর্গসুখ, এবং তদ্বিপরীতই নরক। মানুষের পৃথিবীতে যত দিন সুখ্যাতি থাকে, তত দিন তিনি স্বর্গে বাস করিতেছেন। অকীর্ত্তিজনিত গ্লানিই নরক ভোগ। ইহা ছাড়া স্বর্গ বা নরক বলিয়া কিছু নাই। স্বয়ং জৈমিনি ও ভাষ্যকার শবরস্বামীও পারলৌকিক স্বর্গে আস্থাবান্ ছিলেন না।

স স্বর্গঃ স্যাৎ সর্ব্বান্
প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ।

১৫—৪অ—৩য় পাদ।

তত্র শবরস্বামী—ইদং ইদানীং সন্দিহ্যতে কিং যৎকিঞ্চিৎ উত স্বর্গঃ? যৎকিঞ্চিৎ ইতি প্রাপ্তং বিশেষানভিধানাৎ তত উচ্যতে স স্বর্গঃ স্যাৎ সর্ব্বান প্রত্যবিশিষ্টত্বাৎ সর্ব্বে হি পুরুষাঃ স্বর্গকামাঃ। কুত এতৎ প্রীতির্হি স্বর্গঃ।

জৈমিনি স্বর্গের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান হইয়া বলিতেছেন, বস্তুতই কি স্বর্গনামে কোন স্থান আছে? না, তাহা নাই, বহুমানুষ উহা কামনা করে মাত্র। ফলতঃ মনের প্রীতিই স্বর্গ।

ঈশ্বরের বিশেষ বাসস্থানের নাম কি স্বর্গ নহে? সর্ব্বব্যাপী পরমেশ্বরের আবার কোন পরিমিত বাসস্থান আছে, ইহা কিরূপে বলিতে পার? ফলতঃ স্বর্গ ও নরক বলিয়া কোন পারলৌকিক স্থান নাই। বিষ্ণুপুরাণ বিশদাক্ষরেই বলিয়াছেন—

ভৌমাহেতে স্মৃতাঃ স্বর্গাঃ।

এতে ইন্দ্রাদিদেবানাং বাসভূমিঃ স্বর্গঃ ভৌমঃ। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে যুধিষ্ঠির কেমন করিয়া হাঁটিয়া সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন? মেরু বা বর্ত্তমান আলটাই (ইলাবৃত্তী) পর্ব্বতের সানুদেশই আদিস্বর্গ বা আদি ব্যোম। এবং উহাই মানবের আদি জন্মভূমি। তৎপর তিব্বত, চীন তাতার, মঙ্গলিয়া ও সমগ্র সাইবিরিয়া দেবগণের বসবাসনিবন্ধন স্বর্গ বলিয়া প্রথিত হয়। বায়ুপুরাণ বলিয়াছেন—

স এষ পর্ব্বতোমেরু *
দেবলোক উদাহৃতঃ।

বসন্তি মেরৌ সুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
ঊর্দ্ধে চ সর্ব্বে নরকাঃ সদৈত্যাঃ।

দেবতারা মেরু বা আল্টাই পর্ব্বতে সিদ্ধ ঋষিগণ সহ বাস করেন, আর মানসরোবরের উত্তরে যে কদর্য্য জলাভূমি আছে, যেখানে দৈত্য ও দানবেরা বাস করে, উহারই নাম নরক। মানুষ যম, এই আদি স্বর্গ ও নরক এই উভয় জনপদেরই ধর্ম্মরাজ বা রাজা ছিলেন। এই আদি স্বর্গ হইতেই সংস্কৃতভাষা ও সামবেদ লইয়া দেবতারা ভারতে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়া আর্য্যনামে বিশেষিত হয়েন। উক্ত আদিস্বর্গেরই নামান্তর পিতৃলোক। পিতৃলোকে কাহারা গমন করে? পিতারা? বস্তুতঃ যেস্থান আমাদের পিতা বাপূর্ব্বপুরুষগণের পূর্ব্ববাসস্থান, তাহারই নাম পিতৃলোক বা Fatherland. যদাহ শঙ্করাচার্য্যঃ—

পিতরং সর্ব্বস্য জনয়িতৃত্বাৎ পিতৃত্বং

প্রশ্নোপনিষদের ভাষ্যে শঙ্কর বলিয়াছেন— যে স্থান সকলের আদি জন্মভূমি, তাহারই নাম পিতৃলোক। ঋগ্বেদ ও অথর্ব্ববেদও তাহাই বলিয়াছেন—

দ্যৌর্নঃ পিতা জনিতা নাভিরত্র
বন্ধুর্নঃ মাতা পৃথিবী মহীয়ম্।

দ্যৌ বা স্বর্গই আমাদের আদি পিতৃভূমি বা পিতৃলোক। উহাই আমাদের জন্মভূমি, ঐ স্থানেই আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের জন্ম হইয়াছে। আমাদের জ্ঞাতিবান্ধবগণ এখনও তথায় বাস করিতেছেন। অর্ব্বাচীনযুগের আমাদের এই বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষই মাতৃভূমি। সামবেদও বলিতেছেন—

পিতরং চ প্রযন্ স্বঃ।
৩৬ পৃ—আরণ্যসংহিতায়াং

তত্র সায়ণঃ—পিতরং স্বঃ দ্যুলোকং প্রবর্ত্ততে। অথর্ব্ববেদও বলিয়াছেন—"কৃণ্বে পন্থাং পিতৃবু যঃ স্বর্গঃ। আমরা পিতৃলোকে যাইবার একটি পথ প্রস্তুত করিব, যাহার নামান্তর স্বর্গ।

অতএব পিতৃলোক বলিয়া কোন স্বতন্ত্র স্থান নাই, স্বর্গই পিতৃলোক বা Fatherland এবং উহা ভৌম। পুণ্যাত্মারা মরিয়া স্বর্গে গমন করেন, ইহা কল্পনাসাগরের ফেনবুদ্বুদ মাত্র। মানুষ মরিয়া স্বর্গ, নরক বা পিতৃলোকের কোন স্থানে যায় না, তবে পুনর্জ্জন্ম হয়। সে অবস্থায় কেহ মরিয়া ঐ সকল ভৌম স্থানের কুত্রাপি জন্মগ্রহণ করিতে পাবে। যদি পরকালে স্বর্গপ্রাপ্তি প্রভৃতি হইত, তাহা হইলে স্বর্গ ও নরকের কর্ত্তা এবং পিতৃলোকের পতি যম তাহা জানিতেন। কিন্তু নচিকেতাকে যম স্পষ্টই বলিয়াছেন—

দেবৈরত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা
নহি সুবিজ্ঞেয় মণুরেষ ধর্ম্মঃ।

হে নচিকেতা! মৃত্যুর পর আত্মার কি গতি হয়, কোথায় যায়, দেবতারা এ বিষয়ে বহু অনুসন্ধান করিয়াও বিন্দুমাত্র তত্ত্ব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং পারলৌকিক স্বর্গনরক পিতৃলোক ও পারলৌকিক যমের কোন অস্তিত্ব নাই, এতৎসমুদায়ই ভৌম ও পার্থিব। অপিচ মল্লিনাথ যে হরজটা পর্ব্বতভ্রষ্ট গঙ্গাকে হর বা শিবের মস্তকস্থ জটা হইতে ভ্রষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, উহাও ভুলভ্রান্তির অদ্বিতীয় নিদর্শন।

"সত্যমেব জয়তে নানৃতম্।"

---

# ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আইন।

অধুনা বঙ্গদেশে যে আইন প্রচলিত, তাহার সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিব। আইন দুইভাগে বিভক্ত, রেগুলেসন্ ও অ্যাক্ট। বঙ্গদেশের আইন পূর্ব্বে মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্ণরজেনারল্ প্রণয়ন করিতেন, তখন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর্এর পদ ছিল না। লেপ্টেনণ্টে গবর্ণর্এর পদ সৃষ্টি হওয়ার পর সকৌন্সিল্ লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর বঙ্গদেশের আইন প্রণয়ন করেন, মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারল্এর সম্মতি লইতে হয়। ১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারল যে সকল আইন প্রণয়ন করিয়াছেন তাহার নাম রেগুলেসন্। ঐ সকল আইন প্রথমতঃ সুপ্রীম কোর্টের সম্মতি অনুযায়ী উক্ত কোর্টে রেজেষ্টারি করিতে হইত। অ্যাক্টগুলি, অর্থাৎ রেগুলেসন্ ভিন্ন অন্য আইনগুলি, আর রেজেষ্টারি করিতে হয় নাই। সম্রাট চতুর্থ উইলিয়ম ১৮৩৩ সালে মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারল্কে আইন প্রণয়নের অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করেন। ঐ ক্ষমতা পাওয়ার পর যে সকল আইন প্রচলন করা হইয়াছে সে গুলি অ্যাক্ট নামে খ্যাত। বর্ত্তমানে যে আইন প্রচলিত, তাহার মধ্যে ১৭৯৩ সালের এক আইন বা রেগুলেসন্ প্রথম (আইন)। উক্ত আইন বাঙ্গলা, বেহার ও উড়িষ্যার দশশালা বন্দোবস্ত বিষয়ক আইন। আমরা প্রথমে রেগুলেসন্গুলির ও পরে অ্যাক্টগুলির পর পর আলোচনা করিব।

| সাল | নম্বর | বিষয় |
|---|---|---|
| ১৭৯৩ | ১ | দশশালা বন্দোবস্ত বিষয়ক |

এই আইনের মর্ম্ম এই যে, ইতিপূর্ব্বে কখনও ভূমির রাজস্ব চিরকালের জন্য কায়েমীভাবে বন্দোবস্ত করা হয় নাই। অধুনা ঐরূপভাবে বন্দোবস্ত করা যাওয়াতে ভূস্বামীগণ আপন সম্পত্তির উন্নতি করিবে ও নীচস্থ প্রজাগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিবে এবং তহশীলদারগণকে তদ্রূপ ব্যবহার করিতে উপদেশ দিবে। ইচ্ছামত সম্পত্তি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিবে,আইনের উল্লঙ্ঘন না করিয়া জমা জমির প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবে এবং নির্দ্ধারিত সময়ে সদর জমা না দিলে বকেয়া খাজানা আদায় করণোপযোগী ভূমি বিক্রয় করা যাইবে। নীচস্থ প্রজার হিতের জন্য গবর্ণমেণ্ট আইন প্রণয়ন করিবেন। ভূমির কর ব্যতীত আবকারি বা কোনও অতিরিক্ত ট্যাক্স গবর্ণমেণ্ট বসাইলে ভূস্বামী তাহার অংশ পাইবে না। পুলিসের ভার গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং গ্রহণ করিলে উহার জন্য ভূস্বামীকে যে জমি বা জমির উৎপন্ন দেওয়া যাইত তাহা গবর্ণমেণ্ট আর দিবেন না। ভূস্বামী কোনও নীচস্থ হকিয়ৎ সৃজন করিলে তাহা দ্বারা গবর্ণমেণ্টের স্বার্থের কোনও হানি হইবে না। মহাল

ভাগ হইলে জমা ভাগ করিয়া দেওয়া যাইবে। ভূস্বামীগণ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীকে সংবাদ দিবেন। যে সকল জমিতে কোনও ব্যক্তির স্বত্ব নাই তাহার জন্য গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত কর ধার্য্য করিবেন।

| সাল | নম্বর | বিষয়। |
| --- | --- | --- |
| ১৭৯৩ | ২ | কালেক্টর ও বোর্ড অব্ রেভিনিউ কি প্রণালীতে কার্য্য করিবেন। |

এই আইনের ভূমিকায় দশসালা বন্দোবস্তের পূর্ব্বে ভূস্বামীর অবস্থা লেখা আছে। গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি না লইয়া ভূমি হস্তান্তর বা বন্ধক দিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। জমিদারগণকে ভূমির স্বত্ব ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হয় নাই। সরকারি কর্ম্মচারীরা আবাদী জমির দরুণ রায়ত বা অন্যান্য প্রজার দেয় খাজানার সমষ্টি হইতে তহশীলানা খরচ বাদ দিয়া অবশিষ্টের সচরাচর $\frac{১}{১১}$ ভাগ ভূস্বামীকে দিতেন। $\frac{১০}{১১}$ ভাগ সরকারি রাজস্ব স্বরূপ লওয়া হইত। সরকারি রাজস্ব না দিলে ভূস্বামীকে জমিদারি হইতে সরাইয়া ভূমি ইজারদারকে দেওয়া হইত বা গবর্ণমেণ্টের খাসে রাখা হইত, এবং ভূস্বামীকে ইজারাদার বা গবর্ণমেণ্ট হইতে উপরোক্ত $\frac{১}{১১}$ ভাগ বা অন্য কোনও অংশ দেওয়া হইত। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত লেখা আছে—বঙ্গদেশের বহুল এবং মূল্যবান শিল্পকর্ম্মের জন্য যে সকল উপাদান দরকার এবং অন্যান্য প্রধান রপ্তানি দ্রব্য সকল ভূমি হইতে উৎপন্ন। দেশের অধিকাংশ লোকই হিন্দু। তাহারা ধর্ম্মের আদেশে মাত্র ভূমির উৎপন্ন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইতর শ্রেণীর অহিন্দু লোকেরা অভ্যাসবশতঃ বা বাধ্য হইয়া তদ্রূপ ভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অনাবৃষ্টি বা বন্যাদ্বারা ফসল না জন্মাইলে বা নষ্ট হইলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে কৃষিজীবী এবং শিল্পী ব্যক্তিরাই অধিক মাত্রায় কষ্ট ভোগ করে। দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে ভিন্ন দেশ হইতে যথেষ্ট পরিমাণে শস্য পাওয়া যায় না এবং ভূস্বামী ও কৃষকেরা অনেক পুষ্করিণী ও বাঁধ প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত অর্থশালা না হওয়া পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস হইবে না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রধান চেষ্টা কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধন করা এবং সেই জন্য ভূমির স্বত্ব জমিদারকে দেওয়া হইয়াছে ও প্রত্যেক মহালের রাজস্ব চিরস্থায়ীরূপে ধার্য্য হইয়াছে। এই আইনে রাজস্ব কর্ম্মচারীদের হস্ত হইতে বিচারের ক্ষমতা উঠাইয়া লওয়া হইল, তাঁহাদিগকে বিচারাদালতের নিকট কুকর্ম্মের জন্য জবাবদিহির দায়ী করা হইল। যাহাতে সকল সম্পত্তি অপেক্ষা ভূমি বেশী মূল্যবান হয় ও কৃষিকার্য্যের উন্নতিসাধনে সকলে যত্নবান হয়। কৃষিকার্য্যের উন্নতির উপর লোকের শ্রীবৃদ্ধি ও গবর্ণমেণ্টের আয় নির্ভর করে।

এই আইনের মর্ম্ম এই—কালেক্টরদিগের কর্ত্তব্য নিরূপণ। অন্যান্য কর্ত্তব্যের ভিতর মাদক দ্রব্যের উপর ট্যাক্স আদায় লেখা আছে। কালেক্টর বোর্ডের তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিবেন। খাজাঞ্চি ও কালেক্টর উভয়ে টাকার জন্য দায়ী। খাজাঞ্চি জামিন দিবে ও কালেক্টরের সুপারিশে বোর্ড খাজাঞ্চি

বহাল করিবেন। সরকারি কোনও কর্ম্মচারীকে কালেক্টর নিজের কোনও বেসরকারি কাজ করিতে বলিবেন না। কালেক্টর যে ভূমি বিক্রয় করিবেন তাহা তাঁহার বা তাঁহার অ্যাসিষ্ট্যাণ্টের কোনও দেশীয় কর্ম্মচারী বা বেসরকারি ভৃত্য প্রকাশ্য বা গুপ্তভাবে ক্রয় করিতে পারিবে না। কালেক্টর বা তাঁহার অ্যাসিণ্ট্যাণ্ট প্রকাশ্য বা গুপ্তভাবে কোনও ব্যবসা করিতে পারিবেন না, ইউরোপে টাকা পাঠাইবার জন্য বঙ্গদেশে ব্রিটিশ অধিকারে কোনও মালপত্র ক্রয় করিতে পারিবেন না। কালেক্টর বা তাঁহার অ্যাসিণ্ট্যাণ্ট বা তাঁহাদের কোনও দেশীয় কর্ম্মচারী প্রকাশ্য বা গুপ্তভাবে কোনও মহালের ইজারা রাখিবেন না, বা কোনও মহালের রাজস্ব দিবেন না। ভূস্বামীর সহিত বন্দোবস্ত হইলে ভূমিই রাজস্ব আদায়ের যথেষ্ট জামিন. কিন্তু ইজারা বন্দোবস্ত হইলে ইজারাদারের নিকট মাল জামিন অর্থাৎ রীতিমত রাজস্ব দিবার জামিন লইতে হইবে।

| সাল | নম্বর | বিষয় |
|---|---|---|
| ১৭৯৩ | ৮ | দশশালা বন্দোবস্তের বিস্তারিত নিয়মাবলী। |

ভূস্বামীর সহিত, তাঁহার নাম জমিদার হউক, বা তালুকদার হউক, বা চৌধুরী হউক, বন্দোবস্ত হইবে। খারিজা তালুকদার গবর্ণমেণ্টে খাজানা দিবেন, জমিদারকে দিবেন না। খারিজা তালুকদারের খাজানা আদায়ের জন্য জমিদারকে তহশীলদার নিযুক্ত করা হইবে না। স্ত্রীলোক (সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল্ যাঁহাদিগকে সম্পত্তি রক্ষণের জন্য সমর্থ মনে করেন তাঁহারা ব্যতীত), নাবালক, হাবা, উন্মত্ত অথবা অন্য কোনও কারণে সম্পত্তি রক্ষণে অসমর্থ ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত হইবে না; কিন্তু ঐরূপ ব্যক্তির সহিত সম্পত্তিরক্ষণে সমর্থ ব্যক্তি একত্রে মিলিত থাকিলে, উভয়ে মিলিয়া বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে পারিবেন ও একজন ম্যানেজার নিযুক্ত করিবেন। সম্পত্তি রক্ষণে অসমর্থ ব্যক্তির সম্পত্তি গবর্ণমেণ্ট স্বীয় কর্ম্মচারী দ্বারা রক্ষণ করিবেন। বকেয়া খাজানা দিতে অসমর্থ ব্যক্তির সহিত বন্দোবস্ত হইবে না, এবং তাঁহার জমি কালেক্টরের ইচ্ছানুযায়ী ৩ বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া যাইবে বা খাসে রাখা যাইবে। কোনও ভূস্বামী প্রস্তাবিত জমায় বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে কালেক্টর নিজ মন্তব্য সহ আপত্তি বোর্ডে পাঠাইবেন। বোর্ড উপযুক্ত জমা নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। ভূস্বামী ঐ বোর্ডের নির্দ্ধারিত জমায় বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে তাঁহার লিখিত অস্বীকার লইয়া তাঁহার জমি ইজারা দেওয়া যাইবে বা খাসে রাখা যহবে। লাখেরাজ জমি বাদে অপর সমুদায় মায় চক্রান্ জমির উপর খাজানা ধার্য্য হইবে। কোনও ভূস্বামী বন্দোবস্ত গ্রহণ না করিলে ইতিপূর্ব্বে যে স্বর্ত্তে রাখিতেন সেই স্বর্ত্তে নিজ দখলীয় জমি উপযুক্ত জমায় রাখিতে পারিবেন, যদি তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখের (কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির তারিখের) পূর্ব্বে ও পরে ঐরূপ ভাবে রাখিতেন। যে সমুদয় হস্তিমমরারি বা মোকররি পাট্টা একই জমায় ১২ বৎসরের বেশী জমি ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদের জমা সরকার বা ভূস্বামী হইতে বৃদ্ধি হইবে না। যাহারা এত কাল একই জমায় ভোগ করে

নাই, তাহাদের খাজনা যদি ভূস্বামী বৃদ্ধি করিব না বলিয়া দলিল দিয়া থাকেন তবে তিনি বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না। কিন্তু ভূস্বামী বন্দোবস্ত গ্রহণ না করিলে গবর্ণমেণ্ট বা ইজারাদার জেলার সাধারণ নিরিথ অনুযায়ী তাহাদের জমা ধার্য্য করিতে পারিবেন। ভূস্বামীর খাজনা বৃদ্ধি হইলেও তিনি নিম্নলিখিত কারণ ব্যতীত অধীনস্থ তালুকদারের জমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন না—

(১) জেলার বিশেষ রীতি বা তালুকদারের স্বর্ত্ত মত বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইলে, (২) তালুকদার জমা কমি লওয়ার দরুণ বৃদ্ধি দিতে বাধ্য হইয়াছে ও জমি বৃদ্ধি খাজানা দিবার উপযুক্ত যদি কোনও ভূস্বামী তালুকদারের নিকট যে খাজানা নিতে পারেন তাহা অপেক্ষা বেশী খাজানা আদায় করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ হয়, তবে আদালত যত টাকা বেশী লইয়াছেন তাহার দ্বিগুণ জরিমানা এবং মোকর্দ্দমার খরচ ভূস্বামীর নিকট আদায় করিয়া তালুকদারকে দিবেন।

ভূস্বামী মোকররিদার বা তালুকদারের নিকট পত্তন করা ভিন্ন অবশিষ্ট জমি ইচ্ছামত পত্তন করিতে পারিবেন, কিন্তু সর্ত্ত সকল খোলসা করিয়া লেখা থাকিবে ও সর্ত্তের উল্লঙ্ঘন করিয়া বেশী খাজানা লইলে, যত টাকা বেশী লইবেন তাহার দ্বিগুণ জরিমানা সহ সেই টাকা ফেরৎ দিতে হইবে।

কোনও ব্যক্তি ভূস্বামীর নিকট জমি পত্তন লইলে বা তাঁহার পক্ষে তহশীল করিবার ভার পাইলে ভূস্বামীর স্বাক্ষরযুক্ত লিখিত হুকুম পত্র না লইয়া জমিতে কার্য্য করিতে পারিবেন না।

রায়তের সহিত একযোগে ভূস্বামী মাথট প্রভৃতি বাজে আদায় খাজনার সহিত মিলাইয়া একটি অঙ্ক করিয়া লইবেন। বড় বড় জমিদারিতে যে পরগণার বাজে আদায় বেশী, সেই খানে এই কার্য্য অগ্রে করিয়া পরে অন্য পরগণায় ক্রমশঃ করা হইবে। বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ১১৯৮ সালের মধ্যে এই কার্য্য শেষ করিতে হইবে এবং বেহার ও উড়িষ্যা দেশে ফস্‌লি বা উইলিয়াতি ১১৯৮ সালের মধ্যে। কোনও অছিলিয়তে কোনও নূতন বাজে আদায় রায়তের উপর ভূস্বামী ধার্য্য করিবেন না, করিলে ত্রিগুণ টাকা জরিমানা হইবে এবং ভবিষ্যতে এইরূপ কার্য্য দেখা গেলে যতদিন এই বাজে আদায় লওয়া হইয়াছে তত দিনের সমস্ত টাকা ধরিয়া জরিমানা আদায় করা হইবে। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টে খাজানা দিবেন ও তাঁহাদের অধীনস্থ তালুকদারগণ ভূমির বিবরণ, উৎপন্ন, আদায়, খরচ সম্বন্ধে কাগজ পত্র রাখিবার জন্য পাটোয়ারী রাখিবেন। পাটোয়ারী আবশ্যক হইলে আদালতে কাগজ দাখিল করিবে ও হলপ করিয়া বলিবে যে কাগজ সত্য। জমিদার, অধীনস্থ তালুকদার, ইজারাদার প্রজার দেয় খাজনা ফসলের কাটা ও বিক্রয় করার সময় মত কিস্তিবন্দি করিবেন; না করিলে ক্ষতিপূরণের দায়ী হইবেন। এই আইন ব্যতিক্রমে জমিদার বা অধীনস্থ তালুকদার নীচস্থ ইজারাদারের সহিত কোনও চুক্তি করিবেন না, বা অপর কোনও কার্য্য করিতে দিবেন না বা করিবেন না। জমিদার প্রভৃতি আদালতের এলাকা ভুক্ত কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ক্ষতিপূরণের দায়ী হইবেন। কোনও বন্দোবস্ত বিষয়ে এই আইনের কোনও

পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইলে কালেক্টর এত্‌লা দিবেন।

| সাল | নম্বর | বিষয় |
|---|---|---|
| ১৭৯৩ | ১১ | জমিদারির উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান আইনের প্রচলনের বাধা নিবারণ বিষক আইন। |

ভূমিকা—

দেশীয় শাসনকালের প্রথানুসারে বড় বড় জমিদারির কতকগুলি বিভাগ করা যায় না—জমিদার মরিলে সম্পূর্ণ জমিদারি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বা অপর উত্তরাধিকারী পাইয়া থাকে, এই আইনের বিধান—

যদি ভূস্বামী উইল না করিয়া বা লিখিত বাচনিক উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে বন্দোবস্ত না করিয়া মরেন, তবে হিন্দু ও মুসলমান আইন অনুসারে সমুদয় উত্তরাধিকারী অংশমত সম্পত্তি পাইবে।

| সাল | নম্বর | বিষয় |
|---|---|---|
| ১৭৯৩ | ১৯ | বাদসাহি ভিন্ন অপর লাখেরাজ জমির সর্ত্ত নিরূপণ ও অসিদ্ধ লাখেরাজের খাজানা ধার্য্য করা সম্বন্ধে। |

ভূমিকা—

এই দেশের প্রাচীন আইন অনুসারে রাজা প্রভৃতি বিঘা জমির উৎপন্নের কতক অংশ পাইয়া থাকেন, ঐ অংশ দেশীয় প্রথানুসারে টাকায় অথবা শস্যে লওয়া হইত। এই আইনের মর্ম্ম—

১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখের (কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তির তারিখের) পূর্ব্বের লাখেরাজ দান, যাহারই প্রদত্ত হউক ও লিখিত হউক বা নাই হউক, সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি গৃহীতা বাস্তবিক ঐ তারিখের পূর্ব্বে জমিতে দখল লইয়া থাকে এবং পরে ঐ জমির বাবদ সরকার হইতে কর ধার্য্য না হইয়া থাকে। অন্যত্র অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি ঐ তারিখের পূর্ব্বে গৃহীতা দখল লইয়া থাকে এবং পরে ঐ জমির বাবদ সরকার হইতে কর ধার্য্য হইয়া থাকে কিন্তু পক্ষের আপত্তি অনুযায়ী আদালত মনে করেন যে পরে কর ধার্য্য হওয়া অন্যায় হইয়াছে, তবে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের নিকট এত্‌লা দেওয়া যাইবে ও তাঁহার অনুমতি অনুযায়ী আদালত বিচার করিবেন। এইরূপ আপত্তির মোকর্দ্দমা কর ধার্য্য হওয়ায় ১২ বৎসরের মধ্যে না করিলে কিন্তু সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ ভিন্ন আদালতে গ্রহণ করিবেন না। জীবন সর্ত্তের লাখেরাজ লাখেরাজদারির উত্তরাধিকারী পাইবে না, কিন্তু উত্তরাধিকারীর দখলে থাকিলে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের অনুমতি লওয়া হইবে।

১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখের পরে ও ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বে লাখেরাজের দান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মঞ্জুর না হইলে অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। ১০ বিঘার অনতিরিক্ত জমি দেওয়ানি প্রাপ্তির পূর্ব্বে বা বাঙ্গালা ১১৭৮ সালের পূর্ব্বে লাখেরাজ স্বরূপ প্রদত্ত থাকিলে এবং দেবত্র বা ব্রহ্মত্র ভাবে ব্যবহৃত হইলে সিদ্ধ লাখেরাজ বলিয়া গণ্য হইবে। অসিদ্ধ লাখেরাজের খাজানা বাঙ্গলা ১১৭৮ সালের পূর্ব্বের দান

হইলে অন্যান্য জমির খাজানার অর্দ্ধেক হারে ধার্য্য হইবে। পরের দান হইলে অন্যান্য জমির তুল্য খাজানা হইবে। ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে পূর্ব্বের কোনও এক দান দ্বারা সৃষ্ট এক বা একাধিক গ্রামস্থ লাখেরাজ অসিদ্ধ গণ্য হইবে, উহার পরিমাণ যদি পরগণার প্রচলিত মাপের ১০০ বিঘার কম হয় তবে ঐ জমি একটি অধীনস্থ তালুক হইবে এবং উহার খাজানা মহালের বা উহার উপরিস্থ অপর অধীনস্থ তালুকের খাজানা যিনি সরবরাহ করেন তিনি পাইবেন। তাঁহাকে ঐ জমির দরুণ কোনও বৃদ্ধি খাজনা দিতে হইবে না— যদি ১০০ বিঘার বেশী হয়, তবে ঐ খাজানা গবর্ণমেণ্ট পাইবেন এবং ঐ জমি গবর্ণমেণ্টের অধীন তালুক হইবে। যদি ঐ দান বাঙ্গলা ১১৭৮ সালের পূর্ব্বে হইয়া থাকে ( বেহার ও উড়িষ্যায় ফসলি ও উইলিয়াতি ১১৭৯ সালের ) তবে পরগণার অপর সমতুল্য জমির উৎপন্নের অর্দ্ধেক হিসাবে ঐ জমির বাৎসরিক উৎপন্ন যত হয় তাহাই খাজানা হইবে। যদি কোনও জমি অনাবাদি হয় তবে ভূস্বামী তাহা আবাদ করিবেন এবং তাহার জন্য সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের অনুমতি লইয়া বোর্ড অব্ রেভিনিউ রসদিয় খাজানা ধার্য্য করিবেন। ঐ খাজানা চিরস্থায়ী হইবে এবং ঐ জমি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভূস্বামী ভোগ করিবেন। যদি ঐ দান ঐ সালের পরে হইয়া থাকে তবে পরগণার অপর জমির ন্যায় খাজানা হইবে। ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখের পর ১০০ বিঘার বেশী বা কম যে লাখেরাজ সৃষ্ট হইয়াছে বা হইবে তাহা সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের দান না হইলে অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য। সিদ্ধ লাখেরাজ দান বিক্রয় করা যাইবে, কিন্তু উহার নূতন দখলকার দখল পাইবার ৬ মাসের মধ্যে কালেক্টরের অফিসে নাম রেজেষ্টারি করিবেন। ১৭৯০ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখের পূর্ব্বের দান অনুযায়ী—ঐ দান গবর্ণমেণ্ট হইতে হউক বা অপর কাহারও নিকট পাওয়া হউক—

১০০ বিঘার কম বেশী বা কম জমি লাখেরাজ স্বরূপে দখলকার ব্যক্তি সর্ব্বসাধারনের প্রতি কালেক্টর সাহেবের জারি করা নোটিশের ১ বৎসর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কালেক্টরের অফিসে স্বয়ং বা এই কার্য্যের জন্য প্রদত্ত ও দুই জন বিশ্বাসী সাক্ষীর দস্তখতযুক্ত ওকালতনামা প্রাপ্ত উকিল দ্বারা রেজেষ্টারি করিবেন না করিলে লাখেরাজ অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে—

( ১ ) দানের নাম, যথা, বিষণপ্রিত্, ব্রহ্মত্র বা অন্য

( ২ ) দাতার নাম

( ৩ ) প্রথমে যে গৃহীতা ছিল

( ৪ ) বর্ত্তমান দখলকার—ও কিরূপে সে পাইল

( ৫ ) লিখিত হইলে দলিলের তারিখ নচেৎ দানের তারিখ

( ৬ ) যে গ্রামে জমি তাহার নাম

( ৭ ) জমির মাপ

( ৮ ) পরগণার নাম

( ৯ ) আদিম দানপত্র বা অন্য লেখার নকল

যাঁহারা লাখেরাজ দাবি করেন কিন্তু দখল করেন না তাঁহারা রেজেষ্টারি করিবেন না। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজেষ্টারি না করায়

সন্তোষজনক কারণ দেখাইলে. বোর্ড অব্ রেভিনিউএর রিপোর্টে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল্ মাদাতীতে কোনও দান রেজেষ্টারি করার হুকুম দিবেন।

| সাল | নম্বর | বিষয় |
|---|---|---|
| ১৭৯৩ | ৩৭ | বাদসাহি সনন্দ অনুযায়ী আল্তামঘা.জাইগির বা অন্য লাখেরাজ জমির স্বত্ব নিরূপণ ও অসিদ্ধ লাখেরাজের খাজানা ধার্য্য সম্বন্ধে। |

এই আইনের ভূমিকায় লেখা আছে যে দেশীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় কর্ম্মচারীর পরিবার প্রতিপালনের জন্য, ধর্ম্মকার্য্য, দান, সৈন্য ভরণপোষণের বা অন্য কার্য্যের জন্য লাখেরাজ দিতেন।

এই আইনের মর্ম্ম—১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখের (কোম্পানির দেওয়ানি প্রাপ্তির তারিখের) পূর্ব্বের আল্তামঘা, জাইগির, আয়মা, মাদামাস বা অন্য বাদসাহি লাখেরাজ দান সিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে, যদি গৃহীতা বাস্তবিক ঐ তারিখের পূর্ব্বে জমিতে দখল লইয়া থাকে এবং পরে ঐ জমির বাবদ সরকার হইতে কর ধার্য্য না হইয়া থাকে। অন্যত্র অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। যদি ঐ তারিখের পূর্ব্বে গৃহীতা দখল লইয়া থাকে এবং পরে ঐ জমির বাবদ সরকার হইতে কর ধার্য্য হইয়া থাকে, কিন্তু পক্ষের আপত্তি অনুযায়ী আদালত মনে করেন যে পরে কর ধার্য্য হওয়া অন্যায় হইয়াছে, তবে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের নিকট এতলা দেওয়া হইবে ও তাঁহার অনুমতি অনুযায়ী আদালত বিচার করিবেন। এইরূপ আপত্তির মোকর্দ্দমা কর ধার্য্য হওয়ার ১২ বৎসরের মধ্যে না করিলে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ ভিন্ন আদালত গ্রহণ করিবেন না। কিন্তু জীবন স্বত্বের লাখেরাজদারের উত্তরাধিকারী পাইবে না এবং লাখেরাজদার ঐ জমি বিক্রয় বা হস্তান্তর বা নিজের জীবনের অধিক মেয়াদে দায়াবদ্ধ করিবেন না—করিলে বেআইনি হইবে। ১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট তারিখের পরে বাদসাহি লাখেরাজ দান গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মঞ্জুর না হইলে অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে। কোনও জীবনস্বত্বের লাখেরাজ গবর্ণমেণ্টে পর্য্যাপ্ত হইলে তাহার বাজেয়াপ্ত করা সম্বন্ধে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের অনুমতি লওয়া হইবে। কোনও বাদসাহি লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত বা পর্য্যাপ্ত হইলে জমির কর ধার্য্য করিয়া জমিদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হইবে। জমিদার বন্দোবস্ত অস্বীকার করিলে জমি গবর্ণমেন্টের খাসে রাখা যাইবে বা ইজারা বন্দোবস্ত করা যাইবে। আল্তামঘা, আয়মা এবং মাদামাস উত্তরাধিকারীসূত্রে ভোগ হইবে এবং দান, বিক্রয় প্রভৃতি দ্বারা হস্তান্তর করা যাইবে। হস্তান্তর হইলে, হস্তান্তরের ৬ মাস মধ্যে নূতন দখলকার কালেক্টরের অফিসে নাম রেজেষ্টারি করিবেন। জাইগির জীবনস্বত্ব এবং অন্য বিধান না থাকিলে জাইগিরদারের জীবনাবসানে সমাপ্ত হইবে। বাদসাহি লাখেরাজদার—লাখেরাজদান গবর্ণমেণ্ট হইতে হউক, বা অপর কাহারও নিকট পাওয়া হউক—সর্ব্বসাধারণের প্রতি কালেক্টর সাহেবের জারি করা নোটিশের ১ বৎসর মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি কালেক্টরের অফিসে

স্বয়ং বা ঐই কার্য্যের জন্য প্রদত্ত ও দুই জন বিশ্বাসী সাক্ষীর দস্তখতযুক্ত ওকালতনামা-প্রাপ্ত উকিল দ্বারা রেজেষ্টারি করিবেন—না করিলে লাখেরাজ অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে—

(১) দানের নাম, যথা, আল্‌তাম, জাইগির বা অন্য

(২) দাতার নাম

(৩) আদিম গৃহীতা

(৪) বর্ত্তমান দখলকার—ও কিরূপে সে পাইল

(৫) দানের তারিখ

(৬) মহাল, গ্রাম বা জমির নাম

(৭) মহাল, গ্রাম বা জমির জমিদারের নাম

(৮) মহাল, গ্রাম বা জমির পরিমাণ

(৯) পরগণা

(১০) আদিম দানপত্রের নকল

যাঁহারা লাখেরাজ দাবি করেন, কিন্তু দখল, করেন না, তাঁহারা রেজেষ্টারি করিবেন না। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজেষ্টারি না করার সন্তোষজনক কারণ দেখাইলে, বোর্ড অব্ রেভিনিউএর রিপোর্টে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল্ ম্যাদাতীতে কোনও দান রেজেষ্টারি করার হুকুম দিবেন।

| সাল | নম্বর | বিষয় |
|---|---|---|
| ১৭৯৩ | ৩৮ | কোম্পানির সিবিলিয়ান্ কর্ম্মচারীগণের টাকা কর্জ্জ দেওয়ার নিষেধ বিষয়। |

ভূমিকা—

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট সংস্থাপন হওয়ার প্রারম্ভে বিচার বা রাজস্ব আদায় কর্ম্মে নিযুক্ত কোম্পানির কর্ম্মচারীগণকে ভূস্বামী বা ইজার-দার বা রাজস্ব আদায় ও দানকার্য্যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে টাকা কর্জ্জ দেওয়া নিষেধ করা হয়। এই আইনের মর্ম্ম—জেলা কোর্টের জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও তাঁহাদের সহকারী, অথবা অন্য সিবিলিয়ান কর্ম্মচারী এবং রাজস্ব আদায়ের কার্য্যে নিযুক্ত কালেক্টরেরা এবং তাঁহাদের সহকারী প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে কোনও ভূস্বামী, ইজারদার, অধীনস্থ তালুকদার, দর-ইজারাদার, রায়ত বা তাহাদের জামিনদারকে টাকা কর্জ্জ দিবেন না; যদি দেন তবে ঐ টাকা আদালতে নালিশে আদায় হইবে না।

# ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।*

—★—

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

আচার্য্য। বৎসগণ, তোমরা সর্ব্বসংস্কার-সম্পন্ন পিতা মাতার সন্তান, দৈবী সম্পদে তোমাদের জন্ম হইয়াছে। তোমরা সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ সাধনে সমর্থ "আকরে পদ্মরাগানাং জন্ম কাচ মণেঃ কুতঃ"। আমার বাক্যে ভরসা রাখিও। কল্যাণ হইবে। বুভুক্ষু ইন্দ্রিয়গণ অশান্ত হইয়া বহির্মুখে ছুটিয়াছে। তোমরা নিষ্কাম কর্ম্মের ভার ইহাদের হস্তে ন্যস্ত কর, ইহারা ক্রমেই বশে আসিবে—

মাতাচ পার্ব্বতী দেবী
পিতা দেবো মহেশ্বর
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ
স্বদেশো ভুবনত্রয়ং।

পার্ব্বতী পরমেশ্বরই আমাদের মাতা পিতা; ভগবদ্ভক্তগণ আমাদের বান্ধব; ত্রিভুবন আমাদের স্বদেশ। এই ত্রিভুবনের কল্যাণব্রতে ইন্দ্রিয়গণকে ব্রতী কর। ইহারই কৌশলের নাম কর্ম্মযোগ।

ভগবদুপাসনার রসপান করাইয়া তুমি প্রাণ ও মনের পিপাসা মিটাইতে থাক।

মনে রাখিও "যোগরতো বা ভোগ-
রতো বা সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।
যস্মিন্ ব্রহ্মণি রমতে চিত্তং
নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব॥"

সেই অনন্ত রসস্বরূপে মন প্রাণ একবার আসক্ত হইলে নিত্য নূতন আনন্দের উৎস হৃদয়ে উৎসারিত হইতে থাকিবে। ইহাই ভক্তিযোগ।

তত্ত্বাভ্যাস প্রণালী অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিকে জ্ঞানোজ্জ্বলা কর। বুদ্ধি ক্রমে সেই অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে পারিবে, যাহা লাভ করিলে আর কিছু লব্ধব্য থাকে না তাহাকেই পাইবে।

"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং-ততঃ। তং বিদ্ধি দুঃখ সংযোগবিয়োগং যোগ সজ্ঞিতম্।

ইহাই জ্ঞানযোগ। এইরূপে সর্ব্ব দুঃখের নিবৃত্তি করিয়া পরমানন্দে স্থিতিলাভ করিলে যেরূপে এই সাধনায় তোমরা সিদ্ধিলাভ করিবে আমি সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করিতেছি।

ব্রহ্মপ্রাপ্তির অনুকূল ব্রতের অনুষ্ঠান করাকে ব্রহ্মচর্য্যব্রত বলে—ব্রতসংযত নির্ম্মল-চিত্তে শাস্ত্রালোচনা করিলে তত্ত্বার্থের সহজেই স্ফুরণ হইবে। এইরূপে ব্রতাধ্যয়ন সম্পত্তি-লাভ করিয়া তোমরা ব্রহ্মবর্চ্চস সম্পন্ন হইবে। এ বিষয়ে ঋষিগণের আশ্বাসবাক্য তোমাদের উপযোগী করিয়া বিবৃত করিতেছি।

---

* এই প্রবন্ধ সাহিত্য পরিষদের বহরমপুর শাখার এক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল। উঃ সঃ

"ন তপস্তপ ইত্যাহু-
র্ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমং
উর্দ্ধরেতা ভবেদযস্তু
স দেবো ন চ মানুষঃ॥

সকল তপস্যাই প্রকৃত তপস্যা শব্দের বাচ্য নহে—ব্রহ্মচর্য্যই প্রকৃষ্টতম তপস্যা। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ। ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানে বীর্য্যলাভ হয়। "মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দুধারণাৎ।" কৃপণ যেমন ব্যয়কুণ্ঠ হইয়া পরম যত্নে ও আদরে ধনরত্নসমূহ নিত্য সংগ্রহ করিয়া রাখেন, ব্রহ্মচারীও সেইরূপ তিল তিল করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তের সাধনায় উপচিত শক্তি-সমূহ সংগৃহীত করিবেন। "এই যে সংসারধাম, নহে নিরাপদ স্থান, যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমিষে হরণ করে।" ব্রাহ্মণসন্তানগণ, তোমাদের বিশেষ হুঁসিয়ার হইতে হইবে; বেদের রক্ষার জন্য তোমরা সৃষ্ট হইয়াছ। বেদের রক্ষা হইলে সমাজ রক্ষা পাইবে। মস্তিষ্কের বিকার হইলে কিন্তু সমাজদেহ জীর্ণ শীর্ণ হইয়া অধঃ-পাতে যাইবে। ব্রাহ্মণ নির্ভীক অথচ নির-ভিমান হইবেন। 'বড় যদি হ'তে চাও ছোট হও তবে।"

"সম্মানাদ্ ব্রাহ্মণোনিত্য
মুদ্বিজেত বিষাদিব।
অমৃতস্যেব চাকাঙ্ক্ষে
অবমানস্য সর্ব্বদা॥"

ব্রাহ্মণ সম্মান জিনিষটাকে বিষের জ্বালার ন্যায় অনুভব করিবেন। আর অবমাননাকে অমৃতধারার ন্যায় আকাঙ্ক্ষা করিবেন। তাত, তোমরা সর্ব্বদা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ঋষিদিগের পরম আদরের এই মহাসত্যটি অনুভবে ও অনুষ্ঠানে উপলব্ধি করিতে প্রয়াস পাইবে।

"ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চি জগত্যাং জগৎ" এই জগন্মণ্ডলে যে কিছু বস্তু আছে তৎসমস্তই পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অন্তরে বাহিরে ওতপ্রোতভাবে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আমরা এই চৈতন্যসমুদ্রে ভাসমান আছি। বিদ্বেষ করিবে কাকে? বিদ্বেষ করিলে যে আত্মঘাতী হইতে হয়।

ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম, ভিতরের উপাদেয় সামগ্রী বাহিরে নিয়া পরমতত্বলাভ করিতে না দিয়া জীবতনীয় সর্ব্বনাশ করা। মধু মাংসাদি উত্তেজক খাদ্য ও অবৈধ আচরণ ইন্দ্রিয়ের এই বৃত্তির প্রভূত সাহায্য করে। একেই ত সহজচঞ্চলা চিত্তরঙ্গিনী উত্তাল তরঙ্গ তুলিয়া প্রধাবিত হইতেছে, তাহাতে আবার প্রবল হাওয়া বহিলে নৌকাডুবি অবশ্যম্ভাবী।

বৎসগণ, তোমরা বিদ্যার্থী হইয়াই মৎ-সন্নিধানে আগমন করিয়াছ; এই আশ্রমের প্রধান সাধনাই অধ্যয়ন। শাস্ত্র বলেন, যে বিপ্র অধ্যয়নশীল নহেন তিনি কাষ্ঠময় হস্তী বা চর্ম্মময় মৃগের ন্যায় নামে মাত্র বিপ্র।" বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভ করিবার প্রয়াস করা অনতিক্রমনীয় কর্ত্তব্য। শাস্ত্র শতমুখে মূর্খ ব্রাহ্মণকে নিন্দা করিতে-ছেন। কথায় বলে "বোকা বামন মেটে শাপ যে না মারে তার পাপ।" "যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র কালক্ষেপ করেন তিনি শীঘ্রই সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। শাস্ত্রজ্ঞানের উপরই ব্রাহ্মণের জ্যেষ্ঠত্ব নির্ভর করে।" ইহা ঋষিবাক্য।

বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহই তোমার এই সাধনার প্রধান অন্তরায়। "বলবানিন্দ্রিয় গ্রামো বিদ্বাংস-মপিকর্ষতি।"

দৈনন্দিন যেরূপ অনুষ্ঠান করিলে ইন্দ্রিয় জয় করিতে পারিবে সে বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। শুধু কথা বলিয়া ক্ষান্ত থাকিব না, যেরূপে তোমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিবে তাহার কৌশলও হাতে ধরিয়া শিখাইয়া দিব। তোমরা উপনয়নের সময়ের মা দিবাস্বাপ্সীঃ (দিবানিদ্রা যাইবে না) প্রভৃতি প্রতিজ্ঞাবাক্যের স্মরণ কর। তোমরা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে অর্থাৎ প্রায় চারিদণ্ড রাত্রি থাকিতে সুপ্তোত্থিত হইয়া ঠাকুর দেবতার নাম গ্রহণ করিবে, বেদপাঠ করিবে এবং অতীত ও অনাগত জীবনের বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া অপরাপর প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে প্রাতঃস্নানাদি করিবে। মনু বলেন "ব্রহ্মচারী প্রতিদিন স্নান করিয়া শুদ্ধভাবে দেবঋষি ও পিতৃতর্পণ করিবেন, দেবতাদিগের পূজা করিবেন, এবং সায়ং প্রাতে সমিধ্ দ্বারা হোম করিবেন। ব্রহ্মচারী মধু ও মাংস ভোজন করিবেন না; গন্ধদ্রব্য সেবন, মাল্যাদি ধারণ, গুড় প্রভৃতির রস গ্রহণ এবং স্ত্রীসম্ভোগ করিবেন না। যে সকল বস্তু স্বাভাবিক মধুর কিন্তু কারণবশে অম্ল হয়,—দধি প্রভৃতি, সেই সমুদায় শুক্ত দ্রব্য ত্যাগ করিবেন এবং প্রাণীহিংসা করিবেন না।

> "নিত্যং স্নাত্বা শুচিঃ
> কুর্য্যাদ্দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্।
> দেবতাভ্যর্চ্চনঞ্চৈব
> সমিদাধানমেব চ॥ ২॥ ১৭৬ মনুসং
> বর্জ্জয়েন্মধু মাংসঞ্চ
> গন্ধং মাল্যং রসান্‌স্ত্রিয়ঃ।
> শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি
> প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনম্॥ ২। ১৭৭ ঐ

"তৈলদ্বারা সমস্তক সর্ব্বাঙ্গ অভ্যঞ্জন, কজ্জলাদির দ্বারা চক্ষু রঞ্জন, পাদুকা বা ছত্র ধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ ও নৃত্য গীত বাদন, অক্ষাদি ক্রীড়া, লোকের সহিত কলহ, দেশবার্ত্তাদির অন্বেষণ, মিথ্যা কথন, কুৎসিতাভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ প্রভৃতি এবং অপরের অনিষ্টাচরণ, ব্রহ্মচারী এ সকল হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন।

সর্ব্বত্র একাকী শয়ন করিবেন এবং অস্বাভাবিক উপায়ে কদাচ রেতঃপাত করিবেন না। কামবশতঃ রেতঃপাত করিলে আত্মব্রত একেবারে নষ্ট হইয়া যায়।

এমন কি যদি অকামতঃ ব্রহ্মচারীর স্বপ্নদোষেও রেতঃস্খলন হয়, তাহা হইলে তিনি স্নান করিয়া সূর্য্যদেবের অর্চ্চনা করিবেন। এবং "পুনর্ম্মাম্ এতু ইন্দ্রিয়ম্" অর্থাৎ আমার বীর্য্য পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করুক; ইত্যাদি বেদ মন্ত্র বারত্রয় জপ করিবেন।

> অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষো-
> রুপানচ্ছত্রধারণম্।
> কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ
> নর্ত্তনং গীতবাদনম্॥ ঐ। ১৭৮। ঐ
> দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ
> পরিবাদং তথানৃতম্
> স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভ-
> মুপঘাতং পরস্য চ॥ ঐ ১৭৯
> একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র
> ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ
> কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতো
> হিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥ ঐ ১৮০
> স্বপ্নে সিক্ত্বা ব্রহ্মচারী
> দ্বিজঃ শুক্রমকামতঃ।

প্রাত্বার্কমর্চয়িত্বা ত্রিঃ
পুনর্মামিত্যচং জপেৎ॥ ঐ ১৮১

* * * ব্রহ্মচারী প্রতিদিন বেদাধ্যয়নে ও গুরুর হিতানুষ্ঠানে যত্নবান্ হইবেন। প্রতিদিন শরীর, বাক্য, বুদ্ধি ও মনঃসংযম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন।

* * * * *

কুর্য্যাদধ্যয়নে যত্ন
মাচার্য্যস্ত হিতেষু চ॥ ১৯১
শরীরঞ্চৈববাচঞ্চ
বুদ্ধীন্দ্রিয় মনাংসিচ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলিস্তিষ্ঠে
ৰীক্ষমাণো গুরোর্মুখম্॥ ১৯২

* * * * *

"যথায় গুরুর পরীবাদ অর্থাৎ বাস্তব দোষোক্তি অথবা নিন্দা অর্থাৎ মিথ্যা দোষোক্তি হয়, তথায় হস্তাদি দ্বারা কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন অথবা অন্যত্র গমন করা শিষ্যের কর্ত্তব্য।

* * গুরোর্যত্র পরীবাদো
নিন্দাবাপি প্রবর্ত্ততে।
কর্ণৌ তত্র পিধাতব্যৌ
গন্তব্যং বা ততোহন্যতঃ॥ ২০০

এইরূপ সাধনায় চিত্ত ক্রমে নির্ম্মল হইবে এবং অধীতব্য শাস্ত্রের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান বিজ্ঞানের সূক্ষ্মতত্ত্বসমূহ হৃদয়মুকুরে প্রতিফলিত হইবে।"

শিষ্যগণ এই ভাবে যথাসাধ্য ব্রতনিয়ম পালন করিয়া তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় যথা-নির্দ্দিষ্ট সময়ে তন্ময় হইয়া গুরুদেবের উপদেশা-মৃত পান করিতেন। সব সময়ে সকল কথা সকলে বুঝিত না বটে, কিন্তু গুরুবাক্য পালনে সকলেরই প্রাণে অদম্য প্রতিজ্ঞা জাগিত। তবে না বুঝিয়া শুধু গুরুবাক্য বলিয়াই তত্ত্বকে মানিয়া লওয়া আর্য্যজাতির রীতি ছিল না। যাহার ফল, অনুষ্ঠান করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে হয় তাহা গুরুবাক্যে নির্ব্বিরোধে করিয়া যাইত। আর যাহা যুক্তি তর্কের বিষয় তাহা লইয়া যুক্তি তর্ক করিত।

যুক্তিযুক্তমুপাদেয়ং
বচনং-বালকাদপি।
অন্যাতৃণমিবাগ্রাহ্য
মপ্যুক্তং পদ্মজন্মনা॥

আর যে "ধীগুণের" অর্জ্জন করাই বিদ্যার্থীর প্রধান সাধন তাহাই যুক্তিতর্কমূলক। শুশ্রূষাদিকে ধীগুণ বলে। আগ্রহ সহকারে গুরূক্ত শাস্ত্রবাক্য শ্রবণপূর্ব্বক গুরুর সহিত যুক্তি তর্কে প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া নিজে যুক্তি তর্কের সাহায্যে শাস্ত্রার্থের মনন করিতে করিতে শিষ্য, শাস্ত্র চিন্তায় তন্ময় হইয়া যাইতেন। এই শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন গুণের অর্জ্জন করাই ধীগুণ লাভ করা। গুরু শিষ্যে বহু বাদ প্রতিবাদ চলিত। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—

'বাদঃ প্রবদতামহং'

অর্থাৎ জল্প বা বিতণ্ডা নাই। কিন্তু গুরুর সহিত কুতর্ক করা বা জ্যাঠামির নিয়ম ছিল না। তবে কুতর্ককারীকে কিরূপে হটাইয়া দিতে হইবে তাহার কৌশল শিক্ষা দেওয়া হইত।

সুশিক্ষা ও তপোবনের আবহাওয়ার গুণে দেখা যাইত বিদ্যার্থী অল্প দিনেই পঞ্চ শুভ-লক্ষণান্বিত হইয়াছেন।

> কাকচেষ্টা—বকধ্যানং
> শুনোনিদ্রা তথৈবচ।
> লঘ্বাশী মিতভাষী চ
> বিদ্যার্থী পঞ্চলক্ষণঃ॥

ইহাই বিদ্যার্থীর পঞ্চলক্ষণ। এবম্বিধ উপায়ে ব্রহ্মচারিগণ ব্রত ও অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গুরুদক্ষিণাদির দ্বারা আচার্য্যের তৃপ্তি সাধনপূর্ব্বক স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেন। ব্রহ্মচারী দুই শ্রেণীর ছিলেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ গুরুকুলেই থাকিয়া যাইতেন এবং অধ্যয়ন অধ্যাপনার দ্বারা নিজের ও সমাজের কল্যাণ সাধন করিতেন। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারিগণ সমাজের কল্যাণ সাধন কামনায় গৃহস্থাশ্রম অবলম্বনপূর্ব্বক প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি মার্গের অনুসরণ করিয়া জীবিতোদ্দেশ্যের সার্থক করিতেন। ইহাদিগের আসক্তির বীজ সমূলে নির্ম্মূল হইয়া ভোগের নেশা সম্পূর্ণরূপে ছুটিয়া যায় নাই বলিয়া ঋষিগণ ইহাদিগের চিরকাল ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিতেন না। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্যার অধিকার কদাচিৎ এক আধ জনের হইত। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারিগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন। যাহাদের ব্রতানুষ্ঠান যথাযথরূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে তাহাদিগকে ব্রতস্নাতক বলিত। যাহাদিগের অধ্যয়নের উৎকর্ষ সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদিগকে বিদ্যাস্নাতক বলিত। আর যে সমস্ত সৌভাগ্যবান ব্যক্তিগণের এতদুভয়ই সম্যক্‌রূপে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে বিদ্যাব্রত-স্নাতক বলিত। এইরূপে অস্খলিত ব্রহ্মচর্য্য সম্পন্ন স্নাতকগণ, বেদ বেদাঙ্গসমূহ, অন্ততঃ স্বীয় স্বীয় বেদশাখা, যথারীতি অধ্যয়ন করিয়া দারপরিগ্রহ করিতেন।

ভারতের নদ, নদী ও শৈলমালার ন্যায় শিক্ষাদীক্ষারও একটু অসাধারণত্ব ছিল। এদেশে ধর্ম্ম বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র পোষাকী জিনিষ ছিল না। শরীররক্ষাও ধর্ম্ম, অর্থনীতির আলোচনাও ধর্ম্ম; আবার বেদ পাঠ এবং ধ্যাননিষ্ঠতাও ধর্ম্ম। যাহা থাকিলে মানুষ খাঁটি মানুষ হয় এবং যাহা না থাকিলে মানুষ মানুষ থাকে না সেই অসাধারণত্বই মানবের ধর্ম্ম—অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় উহা মানবে নিত্যসম্বদ্ধ। যাহা বিশ্বমানবের ধর্ম্ম তাহাই আর্য্যজাতির ধর্ম্ম। তবে যাহা এই ধর্ম্মের সাধন তাহাও গৌণভাবে ধর্ম্ম বলিয়াই গণ্য। বর্ণধর্ম্ম, আশ্রমধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম এই ধর্ম্ম সাধনেরই কৌশল। "যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি" সমস্ত কার্য্যই সেই ভূমার প্রীতির উদ্দেশ্যে করিতে হইবে। সেই মহান, সেই অনন্ত, সেই বিভুকে ভুলিয়া যাহাই করা যাইবে তাহাই পাপ—"মোঘং পার্থ স জীবতি।" এক কথায় অন্তরমুখীনতাই এ জাতির জীবনের মূল সূত্র ছিল। গ্রীসদেশীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, "আপনাকে জান" (Know thyself) আর্য্যঋষিগণও বলেন, প্রথমে অভ্যাস করিতে হইবে "আত্মতত্ত্বায়নমঃ।" বিদ্যাতত্ত্বের সাহায্যে আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি করিতে হইবে। এইরূপে তুমি শিবতত্ত্বের কল্যাণময় কল্পতরুমূলে বিশ্রামসুখ লাভ করিতে পাইবে।" এই সংযমমূলক ধর্ম্মকে ঋষিরা দশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—

ধৃতিঃক্ষমা দমোস্তেয়ং
শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো
দশকং ধর্ম্মলক্ষণম্॥ *

এই অধ্যাত্মনিষ্ঠতা লৌকিকজ্ঞানের অন্তরায়স্বরূপ ছিল না। সংসার করিবার সময় যাহাতে পাকা সংসারীর ন্যায় কার্য্য করিতে পারা যায় এ শিক্ষায় তাঁহার বাধা দিত না। অধিকন্তু সবদিক বজায় রাখিয়া পদ্মপত্রমিবাম্ভসা হইয়া কার্য্য করা চলিত—

বর্ত্তমান যুগে একটা কথা সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়—ঋষিরা ধ্যান ধরিয়া থাকিয়া সমাজের পিণ্ডভক্ষণ করিতেন, আর দেশ পুড়িয়া ছারখার হইলেও একবার দৃষ্টি করিতেন না। এই কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে—"মুখমস্তীতিবক্তব্যং দশহস্তা হরীতকী।" তবে সমীচীন গুরুস্থানীয় সুধীগণ বলেন, ভারতের রাশীকৃত অতুলনীয় শাস্ত্র গ্রন্থসমূহের লোপ করিতে পারিলেও এ কথা বলা চলিত না। এই যে যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতবর্ষ জ্ঞানে বিজ্ঞানে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আজও জীবিত আছে, ইহা কি ঋষিদিগের শিক্ষা দীক্ষার বলে নহে?

অষ্টাদশপুরাণেষু
ব্যাসেন ভাষিতদ্বয়ং।
পুণ্যঞ্চ পরোপকারঃ
পাপঞ্চ পরপীড়নম্॥

এই কথা বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ঋষিদিগের বিরুদ্ধে আরও দুই একটি চার্জ্জ আছে। প্রাচীন সমাজে Collectivism বা Organization এর সুশৃঙ্খল সাধনা ছিল না। এবং Liberal Education নামে কোনও জিনিষ ছিল না। এতাবতা ঋষিরা বড়ই theoretical ছিলেন। মোটেই practical ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার করিব। আমরা স্বেচ্ছাক্রমে ইংরেজী শব্দসমূহ ব্যবহার করিলাম। Collectivism বা সমবেতশক্তির মহিমা অপরিজ্ঞাত থাকিলে "আমি সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব (দ্বন্দ্ব সামাসিকস্যচ") গীতায় ভগবান এ কথা বলিলেন কিরূপে? ভগবান যেন বলিতেছেন, "একার্থ নিষ্পাদন জন্য নিরপেক্ষ হইয়াও যে পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী হয় সেই সম্ভূয় সমুত্থানে, সেই সমবেত শক্তির অন্তরালে আমি আছি।" এই যে স্বাধীনতার ও অধীনতার একত্র মিলন—ইহাই ভগবদ্‌বাক্যের রহস্য বলিয়া মনে হয়। চণ্ডীতেও দেখিতে পাই দেবশক্তিসমূহের অদ্ভুত মিলন কৌশলে অসুরমর্দ্দিনী মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। Organization না থাকিলে ব্রাহ্মণাদি চতুরঙ্গ নির্ব্বিরোধে সমাজের জীবনীশক্তির উৎকর্ষ সম্পাদন করিতে পারিতেন না। ঋষিগণ যে মনে মনে পাহাড়ে চড়িয়া আকাশে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইতেন না বা

* ধৃতি (সন্তোষ), ক্ষমা (শক্তিসত্বে অপকারীর প্রত্যপকার না করা), দম (বিষয়সংসর্গেও মনের অবিকার), অস্তেয় (অন্যায়পূর্ব্বক পরধন গ্রহণ না করা), শৌচ (যথাশাস্ত্র মৃজ্জলাদিদ্বারা দেহ শুদ্ধি), ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাবর্ত্তন করা), ধী (প্রতিপক্ষ সংশয়াদি নিরাকরণপূর্ব্বক শাস্ত্রাদির যথার্থ জ্ঞানলাভ), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান), সত্য এবং অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

অনুশীলনের অনুপযোগী উৎকট আদেশ বা উপদেশ করেন নাই তাহা বক্ষ্যমাণ আলোচনা হইতে কথঞ্চিৎ দেখান যাইতে পারে।

ব্রহ্মচারিগণ ভিক্ষার্থ বহির্গত হইতেন। প্রলোভনে পূর্ণ সমৃদ্ধ জনপদের বিলাসরাশি তরুণবয়স্ক বিদ্যার্থিগণের ইন্দ্রিয় সন্নিধানে নিত্য উপস্থিত হইত। চিত্তজয়, ইন্দ্রিয়সংযম কতদূর হইল, প্রতিদিন তাহার পরীক্ষা হইত। সমাজের নিকষোপলে দৈনন্দিনের সাধনায় খাঁটি সুবর্ণ ফলিতেছে কি না তাহার মীমাংসা হইত। গুরু নিজে ও শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরার সাহায্যে ইহার পরীক্ষা করিতেন। কোনও শিষ্য তাম্বুল ভক্ষণ করিতেন বা কতিপয় শিষ্য মিলিয়া মধুচক্র পাড়িয়া মধু ভক্ষণ করিয়া ফেলিতেন, কখনও বা কেহ বিকৃত ভাবে কুলযুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন। ব্রতভঙ্গে অবকীর্ণী ব্রত বা অন্যবিধ প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা হইত। ক্বচিৎ কখনও কিশোর বয়স্ক দুরন্ত বালকের প্রতি "রজ্জ্বা বেণু দণ্ডেন বা" হোমিওপ্যাথিক ডোজে রজ্জু বা বংশদণ্ড দ্বারা প্রহারেরও ব্যবস্থা হইত। বর্ত্তমান শিক্ষায় চরিত্র জয়ের কোনও কৌশলই শিক্ষা দেওয়া হয় না, মুখের কথা বলা হয়—"Let not the sun go down upon your wrath." চরিত্র জয় না হইলে বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা সমাজের অপকারই হয়। মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ।

ঋষিরা ক্রোধের মূল অনুসন্ধান করিয়া বলিতেন, "কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে"। আরও মিষ্টি করিয়া বলিতেন—"অপকারিণি চেৎ ক্রোধঃ ক্রোধে ক্রোধঃ কথং ন তে। ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষাণাং চতুর্ণাং পরিপন্থিনি।"

অর্থাৎ অপকারীর প্রতি যদি তোমার ক্রোধ হয় তবে ক্রোধের উপরে ক্রোধ হয় না কেন? ক্রোধ পরম অপকারী—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বর্গ সাধনেরই ইহা প্রতিকূল। আবার যেরূপ আহারে ও আচারে অনুষ্ঠানে, দেহ ও মন পরিশুদ্ধ হইয়া কল্যাণপথের অনুকূল হইতে পারে তদ্রূপ খাদ্যাদিরও পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণসমূহ নির্ব্বিরোধে বাস করিতেন। গুরু বিভিন্ন বর্ণের পরস্পর পরস্পরের সহিত কি সম্পর্ক তাহা প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিতেন। রাজা মহারাজা বৈশ্য শূদ্র আপদে বিপদে শান্তিলাভের আশায় তপোবনে উপস্থিত হইতেন, আবার গুরুও শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে যাগযজ্ঞ বিবাহ পার্ব্বণে বা রাজকার্য্যের মন্ত্রিত্বের জন্য জনপদে নানাবর্ণের গৃহস্থের বাড়ীতে উপনীত হইতেন। এই প্রকারে ভূয়োদর্শনে বিভিন্ন বর্ণের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্পর্কের সংস্কার হইত।

আত্মভোগসুখের ইচ্ছার নাম কাম, ভগবৎ প্রীতির ইচ্ছার নাম প্রেম। এই বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রেমমূলক ছিল। ব্রাহ্মণ অপর বর্ণসমূহের জন্য এবং অপর বর্ণসমূহ পরস্পরের জন্য এবং বেদ ও ব্রাহ্মণের পরিরক্ষণ ও সুবিধা সংবিধানের জন্য ব্যস্ত হইতেন। প্রতি পরিবারে এবং সমাজের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে এই ভাবই পরিলক্ষিত হইত। প্রেম পরকে ভাল বাসিয়া, সেবা করিতেই ব্যস্ত। প্রেম পরের জন্য মরিতে পারে, কিন্তু নিজের জন্য পরকে মরিতে

দেখিতে পারে না। (Hamlet ও Horatio) হ্যামলেট ও হরেশিওর প্রেমেও কবি এই চিত্রই আঁকিয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই তখন এই চিত্র প্রকটভাবে বিরাজমান ছিল। বকরাক্ষস বধপ্রসঙ্গে একচক্রায় সেই ব্রাহ্মণ পরিবার ও কুন্তীদেবীর কথা আমরা একবার স্মরণ করি। কাশীরাম দাস স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণের ও সমাজের যে ছবি আঁকিয়াছেন এবং পঞ্চতন্ত্রে "ঔদারিকা ব্রাহ্মণাঃ" "কিং বয়ং ব্রাহ্মণসমানামন্নিমন্ত্রণং করোসি" প্রভৃতি অধঃপতিত সময়ের সমাজ চিত্র।

ব্রহ্মচারিগণ আসন ব্যায়াম ও প্রাণায়ামাদির দ্বারা শারীরিক বলবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের সংবিধান করিতেন। নায়মাত্মা বলহীনেনলভ্যঃ 'শরীরমাত্তং খলুধর্ম্মসাধনং' আশ্রমবাসিগণ সকলেই এই তত্ত্বের অনুষ্ঠান করিতেন।

ব্রহ্মচারীরা গোপালন করিতেন। ঋষিকুমার উপমন্যুর কথা এই প্রসঙ্গে সকলেরই মনে উদিত হইবে। গব্যঘৃত, গব্যদুগ্ধের অভাবে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। আমাদের সর্ব্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে পশুকুলও নির্ম্মূল ও অকর্ম্মণ্য হইতেছে। ভারতবর্ষের সুরভি এখন British-born হইয়া বিদেশে মনেকাধিক দুগ্ধ দান করিতেছেন—আর যে দেশে গাভি সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া পূজিত ছিল সে দেশের গোসমূহ আজ কি না পাদুকানির্ম্মাণরূপ হিতসাধন করিতেছেন। গোপালনের আরও অশেষ উপকারিতা আছে।

এখন ঋষিগণ শিক্ষাদীক্ষা বিষয়ে কিরূপ উদারভাবাপন্ন ছিলেন সেই প্রসঙ্গে ভগবান্ মনুর কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিব।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং
বিদ্যামাদদীতা বরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং
স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥
বিষাদপ্য মৃতং গ্রাহ্যং
বালাদপি সুভাষিতং।
অমিত্রাদপি সদ্‌বৃত্তম-
মেধ্যাদপি কাঞ্চনং॥
স্ত্রিয়োরত্নান্যথো বিদ্যা
ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতং
বিবিধানি চ শিল্পানি
সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ।
অব্রাহ্মনাদধ্যয়ন
মাপৎকালে বিধীয়তে॥

* শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতরলোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে, অতি অন্ত্যজ চাণ্ডালাদির নিকট হইতেও পরমধর্ম্ম লাভ করিবে এবং স্ত্রীরত্ন কলঙ্কিত কুলজাতা হইলেও গ্রহণ করিবে।

বিষ হইতেও অমৃতের উদ্ধার করিবে, বালকের নিকট হইতেও মাঙ্গলিক বচন গ্রহণ করিবে, শত্রুরও যদি সদনুষ্ঠান থাকে, তাহার অনুকরণ করিবে এবং অপবিত্র স্থান হইতেও সুবর্ণাদি মূল্যবান্ দ্রব্য গ্রহণ করিবে।

স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতকথা এবং বিবিধ শিল্পকার্য্য সকলের নিকট হইতেই সকলে লাভ ব শিক্ষা করিতে পারে।

ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী আপৎকালে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর অপর বর্ণাদির নিকট অধ্যয়ন করিতে পারেন।

ব্রহ্মচারিগণ ভাবিজীবনে যে নাটকের অভিনয় করিতেন তপোবনে তাহারই পূর্ব্বাভিনয় বা Rehearsal হইত, তপোবনে ভাবী সমাজোদ্যানের চারাগাছ সমূহের সংরক্ষণ ও পরিপোষণের ক্ষেত্র ছিল।

শুনিতে যাহা উপন্যাসের কথার ন্যায় অলীক বোধ হয়, একদিন তাহা ধ্রুব সত্য ছিল, আর তাই ছিল বলিয়াই ভারতের এত মহিমা। "তেহি নো দিবসাগতাঃ।" সেদিন আমাদের নাই সত্য, কিন্তু বিশ্বাসীর হৃদয়ে তাহার লাবণ্যময়ী ছায়া আশার সঞ্চার করে; আবার সেদিন আসিতেও পারে। সময়ে সময়ে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও সত্যের কখনও ধ্বংস হয় না। যাহা ছিল তাহাই আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আইসে। আর না আসিলেও আমাদের চলে না।

এই প্রাচীন আশ্রমের ছায়ায় নূতনযুগে এদেশে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রাচীন ভারতে নবজীবন সঞ্চারিত হইবে; প্রাচীন মহিমা আবার ফিরিয়া আসিবে। সুখের বিষয় স্থানে স্থানে এই উদ্যোগ চলিতেছে।

প্রাচীন গুরু শিষ্যের ন্যায় নবযুগের গুরু শিষ্যগণ আবার পূর্ণ উৎসাহে নবীনভাবে বলিয়া উঠুন—

"সহনাববতু। সহনৌভুনক্তু। সহবীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥"*

নমঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

# উপনিষদের প্রতিপাদ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কালত্রয়েঽপি তিষ্ঠতীতিসৎ। চিৎ জ্ঞান স্বরূপঃ। আনন্দঃ সুখস্বরূপঃ।

(তত্ত্বোপনিষৎ।)

অনুবাদ। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালে যিনি বর্ত্তমান আছেন তিনি সৎ, জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তিনি চিৎ, এবং সুখস্বরূপ

* যিনি উপনিষদ বিদ্যাদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই পরমেশ্বর আমাদিগকে (গুরু ও শিষ্যকে) বিদ্যাস্বরূপ প্রকাশ করিয়া রক্ষা করুন এবং বিদ্যা ফল প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগকে পালন করুন। আমরা যেন বিদ্যাকৃত সামর্থ্য সম্পাদন করিতে পারি এবং তেজস্বী আমরা যাহা অধ্যয়ন করিতেছি, তাহা বীর্য্যশালী হউক। আমরা (শিষ্য ও আচার্য্য) যেন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিমিত্ত কোন দোষ বশতঃ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ সম্পন্ন না হই।

দেখিতে পারে না। (Hamlet ও Horatio) হ্যামলেট ও হরেসিওর প্রেমেও কবি এই চিত্রই আঁকিয়াছেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই তখন এই চিত্র প্রকটভাবে বিরাজমান ছিল। বকরাক্ষস বধপ্রসঙ্গে একচক্রার সেই ব্রাহ্মণ পরিবার ও কুন্তীদেবীর কথা আমরা একবার স্মরণ করি। কাশীরাম দাস স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণের ও সমাজের যে ছবি আঁকিয়াছেন এবং পঞ্চতন্ত্রে "ঔদারিকা ব্রাহ্মণাঃ" "কিং বয়ং ব্রাহ্মণসমানামন্নিমন্ত্রণং করোসি" প্রভৃতি অধঃ-পতিত সময়ের সমাজ চিত্র।

ব্রহ্মচারিগণ আসন ব্যায়াম ও প্রাণায়ামাদির দ্বারা শারীরিক বলবৃদ্ধি ও স্বাস্থ্যের সংবিধান করিতেন। নায়মাত্মা বলহীনেনলভ্যঃ 'শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনং' আশ্রমবাসিগণ সকলেই এই তত্ত্বের অনুষ্ঠান করিতেন।

ব্রহ্মচারীরা গোপালন করিতেন। ঋষি-কুমার উপমন্যুর কথা এই প্রসঙ্গে সকলেরই মনে উদিত হইবে। গব্যঘৃত, গব্যদুগ্ধের অভাবে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। আমাদের সর্ব্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে পশুকুলও নির্ম্মূল ও অকর্ম্মণ্য হইতেছে। ভারতবর্ষের সুরভি এখন British-born হইয়া বিদেশে মনেকাধিক দুগ্ধ দান করিতেছেন—আর যে দেশে গাভি সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া পূজিত ছিল সে দেশের গো-সমূহ আজ কি না পাদুকানির্ম্মাণরূপ হিতসাধন করিতেছেন। গোপালনের আরও অশেষ উপকারিতা আছে।

এখন ঋষিগণ শিক্ষাদীক্ষা বিষয়ে কিরূপ উদারভাবাপন্ন ছিলেন সেই প্রসঙ্গে ভগবান্ মনুর কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করিব।

শ্রদ্দধানঃ শুভাং
বিদ্যামাদদীতা বরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং
স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥
বিষাদপ্য মৃতং গ্রাহ্যং
বালাদপি সুভাষিতং।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তম-
মেধ্যাদপি কাঞ্চনং॥
স্ত্রিয়োরত্নান্যথো বিদ্যা
ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতং
বিবিধানি চ শিল্পানি
সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ।
অব্রাহ্মনাদধ্যয়ন
মাপৎকালে বিধীয়তে॥

* শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতরলোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে, অতি অন্ত্যজ চাণ্ডালাদির নিকট হইতেও পরমধর্ম্ম লাভ করিবে এবং স্ত্রীরত্ন কলঙ্কিত কুলজাতা হইলেও গ্রহণ করিবে।

বিষ হইতেও অমৃতের উদ্ধার করিবে, বালকের নিকট হইতেও মাঙ্গলিক বচন গ্রহণ করিবে, শত্রুরও যদি সদনুষ্ঠান থাকে, তাহার অনুকরণ করিবে এবং অপবিত্র স্থান হইতেও সুবর্ণাদি মূল্যবান্ দ্রব্য গ্রহণ করিবে।

স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, হিতকথা এবং বিবিধ শিল্পকার্য্য সকলের নিকট হইতেই সকলে লাভ ব শিক্ষা করিতে পারে।

ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মচারী আপৎকালে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর অপর বর্ণাদির নিকট অধ্যয়ন করিতে পারেন।

ব্রহ্মচারিগণ ভাবিজীবনে যে নাটকের অভিনয় করিতেন তপোবনে তাহারই পূর্ব্বাভিনয় বা Rehearsal হইত, তপোবনে ভাবী সমাজোদ্যানের চারাগাছ সমূহের সংরক্ষণ ও পরিপোষণের ক্ষেত্র ছিল।

শুনিতে যাহা উপন্যাসের কথার ন্যায় অলীক বোধ হয়, একদিন তাহা ধ্রুব সত্য ছিল, আর তাই ছিল বলিয়াই ভারতের এত মহিমা। "তেহি নো দিবসাগতাঃ।" সেদিন আমাদের নাই সত্য, কিন্তু বিশ্বাসীর হৃদয়ে তাহার লাবণ্যময়ী ছায়া আশার সঞ্চার করে; আবার সেদিন আসিতেও পারে। সময়ে সময়ে প্রচ্ছন্ন থাকিলেও সত্যের কখনও ধ্বংস হয় না। যাহা ছিল তাহাই আবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আইসে। আর না আসিলেও আমাদের চলে না।

এই প্রাচীন আশ্রমের ছায়ায় নূতনযুগে এদেশে আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রাচীন ভারতে নবজীবন সঞ্চারিত হইবে; প্রাচীন মহিমা আবার ফিরিয়া আসিবে। সুখের বিষয় স্থানে স্থানে এই উদ্যোগ চলিতেছে।

প্রাচীন গুরু শিষ্যের ন্যায় নবযুগের গুরু শিষ্যগণ আবার পূর্ণ উৎসাহে নবীনভাবে বলিয়া উঠুন—

"সহনাববতু। সহনৌভুনক্তু। সহবীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ॥"*

নমঃ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

# উপনিষদের প্রতিপাদ্য।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

কালত্রয়েঽপি তিষ্ঠতীতিসৎ। চিৎ জ্ঞান স্বরূপঃ। আনন্দঃ সুখস্বরূপঃ।

( তত্ত্বোপনিষৎ। )

অনুবাদ। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন কালে যিনি বর্ত্তমান আছেন তিনি সৎ, জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তিনি চিৎ, এবং সুখস্বরূপ

* যিনি উপনিষদ বিদ্যাদ্বারা প্রকাশিত হইয়াছেন, সেই পরমেশ্বর আমাদিগকে ( গুরু ও শিষ্যকে ) বিদ্যাস্বরূপ প্রকাশ করিয়া রক্ষা করুন এবং বিদ্যা ফল প্রকাশপূর্ব্বক আমাদিগকে পালন করুন। আমরা যেন বিদ্যাকৃত সামর্থ্য সম্পাদন করিতে পারি এবং তেজস্বী আমরা যাহা অধ্যয়ন করিতেছি, তাহা বীর্য্যশালী হউক। আমরা ( শিষ্য ও আচার্য্য ) যেন অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিমিত্ত কোন দোষ বশতঃ পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ সম্পন্ন না হই।

বলিয়া তিনি আনন্দ। এই কারণে তাঁহাকে সচ্চিদানন্দ কহে। এই প্রস্তাবাংশের প্রথমে আত্মার যে সংক্ষেপ লক্ষণ উদ্ধৃত হইয়াছিল, এইগুলি তাহার সংক্ষেপ বিবৃতিরূপে বর্ণনা করা হইল। আত্মা অন্যান্য উপনিষদেও এই-রূপই লক্ষণান্বিত হইয়াছে ;—

সত্যংজ্ঞানমনন্তমানন্দং ব্রহ্ম। সত্যমবিনাশি নানাদেশ কাল বস্তু নিমিত্তেষু বিনশ্যৎসু যত্র বিনশ্যত্যবিনাশি তৎসত্যমিত্যুচ্যতে। জ্ঞানমিত্যুৎপত্তিবিনাশরহিতং চৈতন্যং জ্ঞানমিত্যভিধীয়তে। অনন্তং নাম মৃদ্বিকারেষু মৃদিব সুবর্ণবিকারেষু সুবর্ণমিব তন্তুকার্য্যেষু তন্তুরিবাব্যক্তাদিসৃষ্টিপ্রপঞ্চেষু পূর্ব্বং ব্যাপকং চৈতন্যমনন্তমিত্যুচ্যতে। আনন্দং নাম সুখচৈতন্যস্বরূপোঽপরিমিতানন্দসমুদ্রোঽবিশিষ্টসুখস্বরূপশ্চানন্দইত্যুচ্যতে। এতদ্বস্তু চতুষ্টয়ং যস্য লক্ষণং দেশকালনিমিত্তেষ্বব্যভিচারি স তৎপদার্থ পরমাত্মা পরং ব্রহ্মেত্যুচ্যতে।

অনুবাদ। আত্মা সত্য, জ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দস্বরূপ। যাহা অবিনাশী তাহাই সত্য। নাম, দেশ, কাল, বস্তু ও নিমিত্তের বিনাশ হইলেও যিনি বিনষ্ট হন না তিনি অবিনাশী। উৎপত্তি ও বিনাশরহিত চৈতন্যকে জ্ঞানস্বরূপ বলে। মৃত্তিকার বিকারভূত পদার্থ সকলে যেমন মৃত্তিকা, সুবর্ণের বিকারভূত পদার্থ সকলে যেমন সুবর্ণ, তন্তুর বিকারভূত কার্য্য সকলে যেমন তন্তু ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান আছে, তেমনি অব্যক্তাদি সমস্ত সৃষ্টিপ্রপঞ্চে যে চৈতন্য ব্যাপকভাবে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাকে অনন্ত বলে। যে চৈতন্য অপরিমিত আনন্দসমুদ্র ও অবিশিষ্ট সুখস্বরূপ তাঁহাকে আনন্দ বলে। এই সত্যাদি বস্তু চতুষ্টয় স্বরূপ, এবং দেশ, কাল ও নিমিত্তদ্বারা অব্যভিচারি অর্থাৎ কোন দেশে, কোন কালে ও কোন্ কারণে যাঁহার স্বরূপের ব্যতিক্রম ঘটে না, তাদৃশ চৈতন্য তৎপদের প্রতিপাদ্য। এইরূপ চৈতন্যকে পরমাত্মা ও পরমব্রহ্ম কহে।

পুণ্যপাপকর্ম্মানুসারী ভূত্বা প্রাপ্তশরীর সন্ধির্যোমপ্রাপ্তশরীরসংযোগমিব কুর্ব্বাণো যদা দৃশ্যতে তদোপহিতত্বাজ্জীব ইত্যুচ্যতে।

( সর্ব্বসারোপনিষৎ। )

অনুবাদ। আত্মা দেহের সহিত সংযুক্ত না হইয়াও পুণ্যপাপানুসারী হইয়া শরীরের সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত এবং শরীর হইতে বিমুক্ত হন। অর্থাৎ কোন উপাধিবিশিষ্ট হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে গমন করেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন আত্মাই জীব বলিয়া কথিত হন।

ব্রহ্মের প্রতিবিম্বকে জীব বলে। আত্মাই অবিদ্যা-উপাধিদ্বারা সংস্কারযুক্ত হইয়া আপনাকে ঈশ্বর হইতে পৃথক্ জ্ঞান করিয়া থাকে, এবং মায়া-উপাধিরহিত হইলে আপনিই যে ঈশ্বর, তাহা বুঝিতে পারে। জীবের যতদিন এই ভেদবুদ্ধি থাকে ততদিন জন্মমরণরূপ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না, এবং "তত্ত্বমসি" বাক্যের প্রকৃত অর্থও বুঝিতে পারে না। তৎপদে ঈশ্বর ও ত্বং পদে জীব বুঝায়, অসি এই ক্রিয়া পদদ্বারা ঐ উভয়ের একার্থই প্রতিপাদন করা হয়। অতএব "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদত্ব হইয়া থাকে। বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস এবং সদ্‌গুরুর উপদেশ দ্বারা যাহাদিগের সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহারা অনায়াসেই নিম্নলিখিতরূপ পর্য্যালোচনা দ্বারা "আমি যে আত্মা ভিন্ন কিছুই নহি," তাহা বুঝিতে পারে।

আমি দেহ নহি, কারণ দেহ দৃশ্যমান হইতেছে। আমি ইন্দ্রিয় নহি, কারণ ইন্দ্রিয় ভৌতিক পদার্থ। আমি প্রাণ নহি, কারণ প্রাণ অনেক। আমি মন নহি, কারণ মন চঞ্চল। আমি বুদ্ধি নহি, কারণ বুদ্ধি বিকারী। আমি তমঃ প্রভৃতি গুণ নহি, কারণ গুণ সমুদায় জড়ের ধর্ম্ম। আমি দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কিছুই নহি, কারণ সেগুলি ঘটাদির ন্যায় বিনাশশীল। বুদ্ধির বিষয়সমুদায়ও আমি নহি, কারণ সুষুপ্তিপ্রভৃতিতে সাক্ষীরূপে আমার সত্ত্বা প্রতীতি হইতেছে।

আমরা কেহই ত একমাত্র পরমাত্মা হইতে ভিন্ন নহি, তবে তাহা জানিতে পারি না কেন? এ কথা আমাদের মনে কখন কখন উদয় না হয়, এরূপ নহে। এই সন্দেহের মীমাংসা বিষয়ে ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আরুণি ও শ্বেতকেতুর সংবাদ উত্তম দৃষ্টান্তস্থল। শ্বেতকেতু তাঁহার পিতা আরুণিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতঃ! আমরা স্বয়ং সেই সদ্বস্তুস্বরূপ, তবে আমরা তাহা বুঝিতে পারি না কেন? আরুণি কহিলেন, বৎস! যে কারণ তোমরা সৎসম্পন্ন হইয়াও তাহা বুঝিতে পারিতেছ না তাহা দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিতেছি শ্রবণ কর। যেমন মধুমক্ষিকা সকল নানা বৃক্ষ হইতে রস সংগ্রহ করিয়া ও সেই সকল একত্র করিয়া মধু উৎপাদন করে। সেই রসগুলি বুঝিতে পারে না যে কিরূপে তাহারা একত্র হইয়া মধুরূপে উৎপন্ন হইল। সেইরূপ এই প্রজা সকল সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা কিরূপে দেহসম্পন্ন হয়, কিরূপেই বা সুষুপ্তি, প্রলয় ও মরণ হয় তাহা বুঝিতে পারে না। প্রজাগণ সচেতন হইলেও জড়তাবশতঃ মধুরাদি রসের ন্যায় তাহাদের বিবেকশক্তি থাকে না, সুতরাং তাহারা যে সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং সতেই লয় পাইবে তাহা বুঝিতে পারে না।

শ্বেতকেতু কহিলেন, যেমন স্বীয় গৃহে সুপ্ত ব্যক্তি উত্থিত হইয়া যখন অন্য গ্রামে গমন করে তখন সে বুঝিতে পারে যে আমি স্বগৃহে সুপ্ত ছিলাম। তাহার পূর্ব্বস্মৃতি নষ্ট হয় না। সেইরূপ মনুষ্যেরা যে সৎ পদার্থ হইতে আসিয়াছে, সৎ পদার্থেই লয় পাইবে, তাহা বুঝিতে পারে না কেন?

আরুণি কহিলেন, বৎস! যেরূপে মনুষ্যেরা আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে না তাহা বলিতেছি। গঙ্গাদি নদী সকল পূর্ব্বদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া গমন করিতে করিতে সমুদ্রে পতিত হয়। আবার সিন্ধু প্রভৃতি নদ পশ্চিমদিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া গমন করিতে করিতে পশ্চিমসমুদ্রে প্রবেশ করে। মেঘকর্ত্তৃক সমুদ্র হইতে সেই সকল জল আকৃষ্ট হইয়া থাকে, আবার বৃষ্টিরূপে সকল নদীতে যায় এবং সাগরে পতিত হইয়া সকলে মিলিত হয়। তখন সেই নদীগণ "আমি গঙ্গা, আমি যমুনা, আমি সিন্ধু" এইরূপ জানিতে পারে না। সেইরূপ প্রজাগণ সৎপদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, আবার সৎস্বরূপ পরমাত্মাতে লয় পাইবে তাহা বুঝিতে পারে না।

ইহা শুনিয়া শ্বেতকেতু কহিলেন, পিতঃ! ভালরূপে দৃষ্টান্ত দ্বারা না বুঝাইলে আমি বুঝিতে পারিতেছি না। তখন আরুণি কহিলেন, যদি কেহ অনেক শাখাদিযুক্ত কোন মহান বৃক্ষের মূলে পরশু প্রভৃতি দ্বারা আঘাত করে, তাহা হইলেও আঘাত মাত্র সেই বৃক্ষ শুষ্ক হয় না, জীবিত থাকিয়াই রসস্রাব করে।

এইরূপ যদি কেহ বৃক্ষের মধ্যে না অগ্রে আঘাত করে. তাহা হইলে সেই বৃক্ষ শুষ্ক হয় না, জীবিত থাকিয়াই রসস্রাব করে। এইরূপ আহত বৃক্ষ জীবিত থাকিয়া মূলদ্বারা ভৌমরস সকল গ্রহণ করিয়া মোদমান থাকে। জীব সেই বৃক্ষের সর্ব্বাবয়বে ব্যাপ্ত হইয়া আছে বলিয়াই বৃক্ষটি মরে না। যদি সেই বৃক্ষের কোন রোগগ্রস্ত শাখাকে জীব পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই শাখাটি শুকাইয়া যায়। এইরূপ দ্বিতীয়া তৃতীয়া যে শাখাই জীবকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়, তাহাই শুষ্ক হইয়া যায়। যখন জীব সকল বৃক্ষকেই পরিত্যাগ করে তখন সকল বৃক্ষই শুষ্ক হয়। মনুষ্যাদি জঙ্গম জীবেরও যখন কোন এক অঙ্গের বৈক্লব্য হয়, তখন বুঝিতে হইবে জীব সেই অঙ্গকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এবং সমস্ত অঙ্গকে জীব পরিত্যাগ করিলে সেই শরীর নষ্ট হয়। অতএব জানা যাইতেছে যে শরীরেরই মৃত্যু হয়, জীবের কখন মৃত্যু হয় না। সদ্যোজাত শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তি দেখিয়া মনে করা যায়, সেই শিশু পূর্ব্বজন্মে স্তন্যপান করিয়াছিল, সেই প্রবৃত্তিটি নষ্ট হয় নাই। সুতরাং দেহাদির মৃত্যুতে জীবের মৃত্যু নাই। যেহেতু উহা সৎ এবং সেই সৎ পদার্থই আত্মা।

শ্বেতকেতু বলিলেন, আরও দৃষ্টান্ত প্রদর্শন দ্বারা বিষয়টি ভালরূপে বুঝাইয়া দিন। আরুণি বলিলেন, বৎস! আমি তোমাকে যে উপদেশ দিলাম তাহা যদি প্রত্যক্ষ করিতে চাও, তাহা হইলে এই মহান্ বটবৃক্ষ হইতে একটি ফল আনয়ন কর। তখন শ্বেতকেতু সেই বৃক্ষ হইতে বট ফল আনয়ন করিলে আরুণি বলিলেন, তুমি এই ফলটি ভাঙ্গ। শ্বেতকেতু ফলটি ভাঙ্গিলে আরুণি কহিলেন, তুমি ঐ ফলের মধ্যে কি দেখিতেছ। আরুণি বলিলেন, ঐ ফলের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কতকগুলি বীজ দেখিতেছি। আরুণি বলিলেন, ঐ ভগ্ন ফলের মধ্যে যে ক্ষুদ্র বীজ দেখিতেছ, তাহাদের মধ্যে একটি বীজ ভাঙ্গ। শ্বেতকেতু পিতার আজ্ঞানুসারে সেই বীজ সকলের মধ্যে একটি বীজ ভাঙ্গিয়া পিতাকে কহিলেন, পিতঃ! আমি একটি বীজ ভাঙ্গিয়াছি। আরুণি কহিলেন, ঐ ভগ্ন বীজগুলি নিরীক্ষণ কর। শ্বেতকেতু বলিলেন, আমি বীজ সকল নিরীক্ষণ করিতেছি। আরুণি বলিলেন, তুমি উহার মধ্যে কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু বলিলেন, আমি ঐ ভগ্ন বীজ গুলির মধ্যে কিছুই দেখিতেছি না। তখন আরুণি পুত্রকে কহিলেন, বৎস। তুমি এই বটবীজ ভগ্ন করিয়াছ, কিন্তু ইহার মধ্যে যে সূক্ষ্ম পদার্থ আছে, তাহা তুমি দেখিতেছ না। কিন্তু উহার মধ্যে এমন কোন পদার্থ আছে, যাহাতে পল্লব, প্রশাখা, শাখা, পুষ্প ও ফল সমন্বিত মহান ন্যগ্রোধ বৃক্ষ আছে। ঐ সূক্ষ্ম অদৃশ্য বীজের কার্য্যস্বরূপ যে সূক্ষ্ম পদার্থ তুমি দেখিতে পাইতেছ না, তাহা হইতেই যেমন এই বটবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে; সেইরূপ সূক্ষ্মতম সৎ স্বরূপ পরমব্রহ্ম হইতে নামরূপাদিবিশিষ্ট এই স্থূল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। যেমন বটবৃক্ষের কারণস্বরূপ যে এই বীজ, তাহার মধ্যস্থ সূক্ষ্ম পদার্থ তুমি দেখিতে পাইতেছ না, সেইরূপ জগতের কারণস্বরূপ সৎ পদার্থকে কেহ জানিতে পারে না। বৎস! তুমি আমার উপদেশে শ্রদ্ধা কর। শ্রদ্ধা না থাকিলে মনোযোগ হয় না, এবং মনোযোগ না থাকিলে অর্থবোধ হয় না।

# ফিরে যাও হে মরণ !*

( ১ )

ফিরে যাও হে মরণ,<br>
　　আসিয়াছ অতীব সত্বরে।<br>
এই ত জাগিনু আমি আলোক-সঙ্গীতে,<br>
হৃদয়ে শিশির-বিন্দু র'য়েছে ঝরিতে ;<br>
　　　এস তুমি বেলা দ্বিপ্রহরে।

( ২ )

ফিরে যাও হে মরণ,<br>
　　দিয়েছিল ক্ষুদ্র অবসর।<br>
কুজ্ঝটি কাটিয়া গেছে সুন্দর ভুবনে,<br>
বেড়াইব আপনার গৃহ ভাবি' মনে,<br>
　　　এস তুমি প্রদোষের পর।

( ৩ )

ফিরে যাও হে মরণ<br>
　　এখনো যে আলোক খেলায় ;<br>
শান্তি নেছে ধরণীরে টানি বক্ষতলে,<br>
বিষাদ-মাধুরি জাগে সাগরের জলে,<br>
　　　এস তুমি, এস গো নিশায়।

( ৪ )

এস তুমি, এস হে মরণ,<br>
　　রহিব না—রহিব না আর।<br>
গম্ভীরে পেচক ডাকে, থেমেছে পাপিয়া,<br>
জ্যানের বিলাপ উঠে শূন্য বিদারিয়া,<br>
　　　নিয়ে যাও মোরে এইবার।

---

* য়্যালফ্রেড অষ্টিনের Go away Death শীর্ষক কবিতার অনুকরণ।

# বাইশপ্রকার পরাজয়।

—★—

গ্রাম্য দাদাঠাকুর বা বামন ঠাকুরের সহিত কথা কহিবার জন্য মহামুনি গোতমের ন্যায়-দর্শন পড়িবার আবশ্যকতা না থাকিলেও আর্য্য বুধমণ্ডলীর সভাতে বাক্য ব্যবহার করিতে গেলে যে, উহার পরিজ্ঞানটা অন্যথাসিদ্ধ নহে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। হয় ত এই কথাটা প্রতীচ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত নব্য-সম্প্রদায়ের নিকট বাজে কথা বলিয়া পরিগণিত হইবে। তথাপি কি করি, এই ভাবটা কিছুতে আমাদের হৃদয় হইতে বিদূরিত হইতেছে না। আশা করি এইজন্য তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। পক্ষান্তরে যে কোন ব্যক্তি আমাদের উপর গোতমের প্রতি অন্ধ ভক্তি বা গোঁড়ামির অভিযোগ কেন আনয়ন করুন না, আমরা কুশাগবুদ্ধি, অমোঘ শক্তির আবিষ্কর্ত্তা মহর্ষি গোতমকে সর্বোচ্চ দার্শনিক বলিতে ক্ষান্ত হইব না। যদিও তাঁহার স্বকীয় গ্রন্থে পরাবিদ্যা সম্বন্ধে বাদরায়ন সূত্রের ন্যায় বিশিষ্ট ও বিস্তারিত আলোচনা হয় নাই, তথাপি যে তত্ত্বসমূহের আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, সেগুলি সুদৃঢ় যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ন্যায়দর্শনে এমন সূত্র বিরল, যাহার ভাব-গাম্ভীর্য্য, বিষয়গুরুত্ব, বিন্যাসপরিপাট্য ও প্রত্যেক পদের সার্থকতা নাই। গোতমের বিশেষত্ব এই যে, কোথাও তিনি যুক্তির সীমা লঙ্ঘন করিয়া বা বেদের দোহাই দিয়া সত্যানুরাগ ও দার্শনিকভাবের সঙ্কোচ করেন নাই। ফলতঃ গোতমের ন্যায়দর্শন না পড়িয়া আর্য্য দার্শনিক সমাজে উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইতে পারা যায় না। তবে ইহা সত্য যে, এই দর্শন খনিতে যে সকল তত্ত্ব সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ঐগুলির মর্ম্ম পরিগ্রহ করা সহজ ব্যাপার নহে। স্থূলবুদ্ধির ত কথাই নাই, সূক্ষ্মবুদ্ধিকেও তজ্জন্য সবিশেষ পরিশ্রম করিতে হয়। এই স্থলে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, অন্ততঃ ন্যায়সিদ্ধান্তমুক্তাবলী আদ্যোপান্ত ভাল করিয়া না পড়িলে গোতম সূত্রের অন্তর্গূঢ় আশয়ের পরিজ্ঞান হইবার নহে। এই দর্শনখানিতে কথায় অর্থাৎ নিয়মবদ্ধ হইয়া পরস্পর বাক্যালাপে যে বাদী বা প্রতিবাদীর পরাজয় হয়, তাহা নিগ্রহ-স্থান আখ্যায় অভিহিত করা হইয়াছে এবং ইহার সাধারণ লক্ষণ, বিভাগ ও প্রত্যেক বিভাগের স্বতন্ত্র লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নিগ্রহস্থানের সাধারণ লক্ষণ—

"বিপ্রতিপত্তির প্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানং।"

১ অ ২ আ ৬০ সূত্র

নিরূপনীয় বিষয়ের বিপরীত পরিজ্ঞান অথবা তৎসম্বন্ধে প্রস্তাবিত বিষয়ের অপরি-জ্ঞানকে নিগ্রহস্থান বলা হইয়া থাকে।

ভাষ্য—

'বিপরীতা কুৎসিতা বা প্রতিপত্তির্বিপ্রতিপত্তিঃ। বিপ্রতিপাদ্যমানঃ পরাজয়ং প্রাপ্নোতি নিগ্রহস্থানং খলু পরাজয় প্রাপ্তিঃ। অপ্রতিপত্তিস্ত্ব আরম্ভবিষয়ে ন প্রারম্ভঃ।

পরেণ স্থাপিতং বা ন প্রতিষেধতি প্রতিষেধং বা নোদ্ধরতি।

'বিপ্রতিপত্তি' শব্দের অর্থ, নিরূপ্য বিষয়ে বিপরীত বা কুৎসিৎ সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া। যিনি এইরূপ বিপ্রতিপত্তি দোষ হইতে আপনাকে বিমুক্ত করিতে পারেন না, তাঁহাকে নিশ্চয়ই পরাভূত হইতে হয়। এই ত গেল বিপ্রতিপত্তির কথা।

অপ্রতিপত্তি কাহাকে বলে? যাহার আরম্ভ করা উচিত তাহার অনারম্ভকে অপ্রতিপত্তি বলা যায়। অথবা বিপক্ষের সংস্থাপিত বিষয়কে দোষগ্রস্ত বলিয়া প্রমাণিত না করা ও তৎপ্রদর্শিত দোষের উদ্ধার না করা অপ্রতিপত্তি শব্দের অভিধেয়।

নিগ্রহস্থানের বিভাগ

"প্রতিজ্ঞাহানিঃ, প্রতিজ্ঞান্তরং, প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ, প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসো, হেত্বন্তর, মর্থান্তরং, নিরর্থক, মাবিজ্ঞাতার্থ, মপার্থক, মপ্রাপ্তকালং, ন্যূন, মধিকং, পুনরুক্ত, মননুভাষণ, মজ্ঞান, মপ্রতিভা, বিক্ষেপো, মতানুজ্ঞা, পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণং, নিরনুযোজ্যানুযোগো হপসিদ্ধান্তো হেত্বাভাসাশ্চ নিগ্রহস্থানানি।"

৫অ ২ আ ১সূ

১ প্রতিজ্ঞাহানি, ২ প্রতিজ্ঞান্তর, ৩ প্রতিজ্ঞা বিরোধ, ৪ প্রতিজ্ঞা সন্ন্যাস, ৫ হেত্বন্তর, ৬ অর্থান্তর, ৭ নিরর্থক, ৮ অবিজ্ঞাতার্থ, ৯ অপার্থক, ১০ অপ্রাপ্তকাল, ১১ ন্যূন, ১২ অধিক, ১৩ পুনরুক্ত, ১৪ অনুভাষণ, ১৫অজ্ঞান, ১৬ অপ্রতিভা, ১৭ বিক্ষেপ, ১৮ মতানুজ্ঞা, ১৯ পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ, ২০ নিরনুযোজ্যানুযোগ, ২১ অপসিদ্ধান্ত, ও ২২ হেত্বাভাস, এইরূপে দ্বাবিংশতি প্রকার নিগ্রহস্থান।

প্রতিজ্ঞাহানির লক্ষণ—

"প্রতিদৃষ্টান্ত ধর্ম্মাভ্যনুজ্ঞা স্ব দৃষ্টান্তে প্রতিজ্ঞা হানিঃ" ঐ ঐ ২ সূ।

বাদী বা প্রতিবাদী যদি বিপক্ষের দৃষ্টান্তে যে প্রতিকূল ধর্ম্ম দেখান হইয়াছে তাহা নিজের দৃষ্টান্তে মানিয়া লয়, তবে উহাকে প্রতিজ্ঞাহানি বলা হইয়া থাকে। ইহার নিদর্শন এই যে, কেহ প্রতিজ্ঞা করিল "শব্দো হনিত্যঃ ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ ঘটবৎ", কিন্তু অপর ব্যক্তি আক্রমণ করিল যে, ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ বিষয়ত্বটা সামান্য প্রভৃতি নিত্য বস্তুতেও দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তোমার ঐ হেতুটা ব্যভিচারী। এইরূপ আক্রমণে দিক্-শূন্য হইয়া প্রতিজ্ঞাকারী স্বীকার করিয়া ফেলিল যে যদি ঐন্দ্রিয়ক সামান্য নিত্য হয়, ঘটও সেইরূপ নিত্য হউক। তাৎপর্য্য এই যে, দর্শনশাস্ত্রে অলব্ধপ্রবেশ লোকেরা এক বিষয় সিদ্ধ করিতে যাইয়া প্রতিপক্ষের যুক্তি-তর্কে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলে অজ্ঞাতসারে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ছাড়িয়া অপর প্রতিজ্ঞায় উপনীত হইয়া পড়ে। আর ইহাকে প্রতিজ্ঞাহানি বলা যায়।

প্রতিজ্ঞান্তরের লক্ষণ—

"প্রতিজ্ঞার্থ প্রতিষেধে ধর্ম্ম বিকল্পাত্তদর্থ নির্দ্দেশঃ প্রতিজ্ঞান্তরং"। ঐ ঐ ৩ সূ—

যে বিষয়ের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, বিপক্ষের লোক যদি দোষ দেখাইয়া তাহার প্রতিষেধ করে অর্থাৎ প্রতিকূল দৃষ্টান্ত দ্বারা হেতুর ব্যভিচার দোষ দেখায়, তবে দৃষ্টান্তে প্রতি দৃষ্টান্তের বৈষম্য উল্লেখ করিয়া সাধ্যসিদ্ধির জন্য যে বিশিষ্ট নির্দ্দেশ, তাহাকে প্রতিজ্ঞান্তর বলা যায়। নিদর্শন "শব্দো-

হনিত্যঃ ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ" প্রতিজ্ঞাত বিষয়। "ঐন্দ্রিয়কং সামান্যং নিত্যং" প্রতিষেধ। "ঐন্দ্রিয়কং সামান্যং সর্ব্বগতং ঐন্দ্রিয়কস্তু ঘটোহ সর্ব্বগতঃ" ধর্ম্ম বিকল্প। "যথা ঘটোহ সর্ব্বগত এবং শব্দোপ্য সর্ব্বগতো ঘটবদনিত্যঃ" নির্দ্দেশ।

এইস্থলে প্রতিজ্ঞান্তর এইজন্য হইল যে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাটা ছিল কেবল শব্দ অনিত্য এইরূপ। আর পরের প্রতিজ্ঞাটা হইল শব্দ অসর্ব্বগত এবং অনিত্য এইরূপ। প্রতিজ্ঞা-হানি ও প্রতিজ্ঞান্তরের পরস্পর পার্থক্যটা এইরূপ যে, প্রথমটায় পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাকে বিসর্জ্জন দিয়া অপর প্রতিজ্ঞা অঙ্গীকার করিয়া লওয়া, আর দ্বিতীয়টাতে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞাকে বজায় রাখিয়া আর একটা অভিনব প্রতিজ্ঞা করিয়া বসা।

প্রতিজ্ঞাবিরোধের লক্ষণ—

"প্রতিজ্ঞা হেত্বোর্ব্বিরোধঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ"। ঐ ঐ ৪ সূ—

প্রতিজ্ঞা (সাধ্যনির্দ্দেশ) ও হেতুর যে পরস্পর বিরোধ তাহাকে প্রতিজ্ঞাবিরোধ বলা যায়। নিদর্শন "দ্রব্যং গুণব্যতিরিক্তং" প্রতিজ্ঞা। "রূপাদিতোহর্থান্তরস্যানুপলব্ধেঃ" হেতু। এইস্থলে যদি দ্রব্যকে গুণব্যতিরিক্ত বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে রূপাদি হইতে অন্য বস্তুর যে উপলব্ধি হয় না, এই হেতুটা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে যদি রূপাদি হইতে অন্য বস্তুর উপলব্ধি হয় না, ইহাকে সত্য মানা যায়, তবে দ্রব্যগুণ হইতে অতিরিক্ত, এই প্রতিজ্ঞাটা বিরোধগ্রস্ত হইয়া উঠে। অধিকন্তু এইস্থলে বৃত্তিকার বলিতেছেন যে, "অত্রতু প্রতিজ্ঞাহেতুপদে কথাকালীন বাক্যপরে তথাচ কথায়াং স্ববচনার্থ বিরোধঃ প্রতিজ্ঞাবিরোধঃ" অর্থাৎ এইস্থলে প্রতিজ্ঞা ও হেতুপদ উভয়ে মিলিয়া কথাকালীন বাক্যকে বুঝাইতেছে, সুতরাং কথাতে যে স্বীকার-বাক্যার্থের বিরোধ তাহাকেই প্রতিজ্ঞাবিরোধ বলা উচিত।

প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসের লক্ষণ।

"পক্ষ প্রতিষেধে প্রতিজ্ঞাতার্থাপনয়নং প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাসঃ"। ঐ ঐ ৫ সূ।

নিজের অভিহিত বিষয়কে অপর ব্যক্তি নিষিদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন করিলে পর যে প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের অপলাপ তাহাকে প্রতিজ্ঞাসন্ন্যাস বলা হইয়া থাকে।

নিদর্শন 'শব্দোহনিত্যঃ ঐন্দ্রিয়কত্বাৎ" প্রতিজ্ঞাত বিষয়। "সামান্য ঐন্দ্রিয়কং নচানিত্যং এবং শব্দোপ্যৈন্দ্রিয়কো নচানিত্যঃ" প্রতিষেধ। "এবং প্রতিষিদ্ধে পক্ষে যদি ব্রূয়াৎ কঃ পুনরাহ অনিত্যঃ শব্দ ইতি" প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের অপলাপ।

হেত্বন্তরের লক্ষণ।

"অবিশেষোক্তে হেতৌ প্রতিষিদ্ধে বিশেষমিচ্ছতো হেত্বন্তরং ঐ ঐ ৬ সূ।

পূর্ব্বোক্ত হেতুটা অপর ব্যক্তি দ্বারা দোষগ্রস্ত প্রতিপন্ন হইলে পর দোষ দূর করিবার ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া ঐ হেতুতে যে অপর কোন বিশেষণের সন্নিবেশ, অথবা ঐ হেতুটাকে পরিবর্ত্তন করিয়া লওয়া, তাহাকে হেত্বন্তর বলা যায়।

এই স্থলে হেতু পদটার নিরুক্তি সম্বন্ধে বৃত্তিকার লিখিয়াছেন যে, "অত্র চ হেত্বাবিত্যনেন হেত্ববয়বাংশো ন বিবক্ষিতঃ অপিতু সাধকাংশঃ স চ হেত্ববয়বস্ত উদাহরণাদিস্থোবা" অর্থাৎ এই স্থলে হেতুপদের দ্বারা, কেবল হেতুর

অবয়বাংশ বিবক্ষিত নহে, কিন্তু সাধকের অংশ ; আর উহা হেতু ও উদাহরণাদির অবয়ব সাধারণ হইতে পারে। নিদর্শন, "শব্দোঽনিত্যঃ বাহেন্দ্রিয় প্রত্যক্ষত্বাৎ" এক ব্যক্তির এইরূপ প্রতিজ্ঞাতে অপর ব্যক্তি বাহেন্দ্রিয় প্রত্যক্ষত্ব হেতুটার ব্যভিচার সামান্যে দেখাইলেন, কিন্তু প্রথম ব্যক্তি দোষক্ষালনের জন্য ঐ হেতুটাতে "সামান্যবত্ত্বেসতি" একটা বিশেষণ লাগাইয়া দিলেন। এবং বিশেষণ লাগাইয়া তিনি বুক ফুলাইয়া বলিতে লাগিলেন "যৎসামান্যবত্ত্বেসতি বাহেন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ তদনিত্যং"

অর্থান্তরের লক্ষণ—

"প্রকৃতাদর্থাদ প্রতিসম্বন্ধার্থমর্থান্তরং"

ঐ ঐ ৭

প্রস্তাবিত বিষয়কে উপেক্ষা করিয়া উহার সহিত অসম্বন্ধ বিষয়ের উত্থাপনকে অর্থান্তর বলা হইয়া থাকে। নিদর্শন, "শব্দোঽনিত্যঃ কৃতকত্বাৎ" এইরূপ বলিয়া "শব্দো গুণঃ সচাকাশস্য" এইরূপ বলা।

নিরর্থকের লক্ষণ—

"বর্ণক্রম নির্দ্দেশবন্নিরর্থকং। ঐ ঐ ৮

ক চ ট ত প ইত্যাদি বর্ণক্রম নির্দ্দেশের ন্যায় যে অর্থশূন্য শব্দ নির্দ্দেশ তাহাকে নিরর্থক বলা হইয়া থাকে। নিদর্শন, ক চ ট ত পা নিত্যাঃ জ ব গ ড দশত্বাৎ ঝ ভ ঞ ঘ ট ষ ষ বৎ।"

অপ্রতিজ্ঞাতার্থের লক্ষণ—

"পরিষৎ প্রতিবাদিভ্যাং ত্রিরভিহিতমপ্য বিজ্ঞাতমবিজ্ঞাতার্থং।" ঐ ঐ ৯ সূ

মধ্যস্থ ও প্রতিবাদী তিনবার উচ্চারণ করিলেও যে বাক্যের অর্থ অবোধ্যই থাকিয়া যায়, উহার প্রয়োগকে অবিজ্ঞাতার্থ বলে।

বৃত্তিকার ইহার এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন, "অবহিতা বিকল ব্যুৎপন্ন পরিষৎ প্রতিবাদি বোধানুকুলোপস্থিতা জনক বাচক বাক্য প্রয়োগোঽবিজ্ঞার্থং"। এই লক্ষণে বাক্যের বাচক বিশেষণ দ্বারা নিরর্থক ও অপার্থকে অতিব্যাপ্তি নিবারণ হইল। এই স্থলে অবোধ্য বাক্য প্রয়োগে বক্তার এই অভিপ্রায় সূচিত হইতেছে যে, অপর ব্যক্তিরা যদি তাহার বাক্যার্থ পরিজ্ঞানে অসমর্থ হয়, তবে তাহার পক্ষে নিশ্চয় বিজয় লাভ হইবে, কিন্তু ইহা ভ্রান্তি মাত্র। এই প্রসঙ্গে ইহা বলিলেও অসঙ্গত হইবে না যে, যাহারা কঠিন বা অসুবোধ্য বাক্য প্রয়োগ করিয়া পাণ্ডিত্যের নাম কিনিতে চাহেন তাঁহারা অবিজ্ঞাতার্থের লক্ষণটা কণ্ঠনিহিত করিয়া রাখুন।

অপার্থের লক্ষণ —

'পৌর্ব্বাপর্য্যাযোগাদ প্রতিসম্বন্ধার্থমপার্থকং"

ঐ ঐ ১০

যাহাতে কার্য্যকারণভাবের অভাবে শব্দার্থগুলি পরস্পর অসম্বদ্ধ থাকিয়া যায়, তাহাকে অপার্থক বলা হইয়া থাকে। নিদর্শন "দশ দাড়িমানি ষড় পূপাঃ কুণ্ডমজাজিনং পলল পিণ্ড" ইত্যাদি।

অপ্রাপ্তকালের লক্ষণ—

"অবয়ব বিপর্য্যাসবচনমপ্রাপ্তকালং"

ঐ ঐ ১০

প্রতিজ্ঞাদি অবয়বের ব্যতিক্রম করিয়া যে বাক্যবিন্যাস করা হয় তাহাকে অপ্রাপ্তকাল বলা হইয়া থাকে। এই স্থলে বৃত্তিকার এইরূপ বলিয়াছেন, "অবয়বস্য কথৈকদেশস্য বিপর্য্যাসো বৈপরীত্যং তথাচ সমন্বয়বদ্ধবিষয়ীভূতকথাক্রম বিপরীত ক্রমেণাভিধানং পর্য্যবসন্নং"

অর্থাৎ অবয়ব পদের অর্থ কথার অংশ, আর বিপর্য্যাস পদের অর্থ বৈপরীত্য, সুতরাং কথার যেরূপ ক্রমনিয়ম বদ্ধ হইয়াছে তাহার বিপরীত ক্রমে উহার ব্যবহার করা ফলিতার্থ।

ন্যূনের লক্ষণ—

"হীনমন্যতমেনাপ্যবয়বেন ন্যূনং"

ঐ ঐ ১২

স্বকীয় শাস্ত্রে যে প্রতিজ্ঞাদি অবয়ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ঐগুলির মধ্যে কোন একটাকে বাদ দিয়া কথার উল্লেখ করাকে ন্যূন বলা যায়।

অধিকের লক্ষণ—

"হেত্বুদাহরণাধিকমধিকং" ঐ ঐ ১৩।

অধিক হেতু ও উদাহরণের উল্লেখ অধিক নামে অভিহিত হয়। নিদর্শন, পর্ব্বতো বহ্নিমান ধূমাৎ আলোকাৎ মহানসবৎ চত্বরবৎ।

পুনরুক্তের লক্ষণ—

"শব্দার্থয়োঃ পুনর্ব্বচনং পুনরুক্তমন্যত্রানুবাদাৎ"। ঐ ঐ ১৪

অনুবাদ ব্যতিরেকে একই শব্দের বা অর্থের একাধিকবার উক্তিকে পুনরুক্ত বলে। নিদর্শন, "ঘটো ঘটঃ" শব্দের পুনরুক্তি। "ঘটঃ কলসঃ" অর্থের পুনরুক্তি।

অনুবাদ যে পুনরুক্ত হইতে ভিন্ন বস্তু, ইহার কারণ, অনুবাদেত্বপুনরুক্তং শব্দাভ্যাসাদর্থ বিশেষোপপত্তেঃ ঐ ঐ ৪৫ সূ।

অনুবাদ পুনরুক্ত নহে, কেননা অনুবাদে শব্দের একাধিকবার উচ্চারণে বিশিষ্ট অর্থের বোধ হয়, কিন্তু পুনরুক্তে এইরূপ হয় না।

বিশেষভাবে পুনরুক্তের স্বরূপবর্ণন—

"অর্থাদাপন্নস্য স্বশব্দেন পুনর্ব্বচনং"।

ঐ ঐ ১৬।

যে বিষয়টা অর্থাপত্তি দ্বারা লভ্য হয়, তাহার যে তদর্থবোধক শব্দ দ্বারা উল্লেখ, উহাকে পুনরুক্ত বলা যায়, কিন্তু পর্য্যায়ক্রমে একটা শব্দ বা অর্থের পুনরুল্লেখ হইলেই উহাকে পুনরুক্ত বলা যায় না।

নিদর্শন, "অনিত্যমুৎপত্তি ধর্ম্মকত্বাৎ" কহিয়া "অনুৎপত্তি ধর্ম্মকং নিত্যং কহা। এইস্থলে অনুৎপন্ন বস্তু যে নিত্য এই বিষয়টার তদর্থবোধক শব্দ দ্বারা উল্লেখ না করিলেও অর্থাপত্তি দ্বারা বুঝা যাইতে পারে।

অননুভাষণের লক্ষণ—

'বিজ্ঞাতস্য পরিষদা ত্রিরভিহিতস্যাপ্যনুচ্চারণ মননুভাষণং। ঐ ঐ ১৭

যে বিষয়টাকে মধ্যস্থ বুঝাইয়া দিয়াছে এবং বাদী তিনবার বলিয়াছে, তথাপি প্রতিবাদী উহা আনুপূর্ব্বিক বলিতে পারিতেছে না, এইরূপ স্থলে ঐ বলিতে-না-পারাটাকে অননুভাষণ কহা যায়। বৃত্তিকারের নির্দ্দেশ, "অজ্ঞান সাঙ্কর্য্য নিরাসায়াজ্ঞানমনাবিষকুর্ব্বতেতি" "বিক্ষেপ সাঙ্কর্য্য নিরাসায় কথা মবিচ্ছিন্দতেতি চ বিশেষণীয়-" অর্থাৎ অজ্ঞান ও বিক্ষেপরূপ নিগ্রহস্থানে অননুভাষণের একাকার নিবারণার্থ 'অজ্ঞানমনবিষকুর্ব্বতা" ও কথামবিচ্ছিন্দতা এই বিশেষণ দুইটা ত্রিরভিহিতস্য ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বসাইয়া দিতে হইবে।

অজ্ঞানের লক্ষণ—

"অবিজ্ঞাতঞ্চাজ্ঞানং" ঐ ঐ ১৮

যে বিষয়টা মধ্যস্থ বুঝাইয়া দিয়াছে এবং বাদী তিনবার বলিয়াছে, তথাপি প্রতিবাদী উহা বুঝিতে পারিতেছে না, এইরূপ স্থলে ঐ বুঝিতে-না-পারাকে অজ্ঞান বলা হইয়া থাকে।

বৃত্তিকারের উক্তি, "ইদঞ্চ কিং বদসি বুধ্যতএব নেত্যাত্মাবিষকারেণ জ্ঞাতুং শক্যত ইতি"।

অপ্রতিভার লক্ষণ—

"উত্তরস্যাপ্রতিপত্তিরপ্রতিভা" ঐ ঐ ১৯।

এক ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির অন্যান্য কথা বুঝিয়াও উত্তর করিবার সময়ে তাহার উত্তরটা বুঝিতে না পারে, তবে উহাকে অপ্রতিভা বলা যায়।

বৃত্তিকারের উক্তি, "নচাত্রাননুভাষণস্যাবশ্যকত্বাত্তদেব দূষণমস্তিতিবাক্যং পরোক্তাননুবাদেহিতৎ। যত্র পরোক্ত মনূদ্যাপিনোত্তরং প্রতিপদ্যতে তত্রা সাঙ্কর্য্যাৎ" অর্থাৎ অপ্রতিভাস্থলে ০ অননুভাষণই কেন দোষ হউক না, আর বিপক্ষের জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর বুঝিতে না পারিলেই আনুপূর্ব্বিক অনুভাষণের অভাব হয় বলিয়া উহা এইস্থলেও অবশ্যম্ভাবী, এইরূপ আপত্তি উঠিতে পারে না। কারণ বিপক্ষের প্রতিপাদিত বিষয়টা যে স্থলে অনূদিত না হয় সেই স্থলেই অননুভাষণ দোষ আসিতে পারে, কিন্তু যে স্থলে বিপক্ষের প্রতিপাদিত বিষয়ের অনুভাষণ করিয়াও উত্তরটা বোধগম্য হয় না, সেইস্থলে এই দোষের সহিত ঐ দোষের একাকার হইবার সম্ভাবনা নাই।

বিক্ষেপের লক্ষণ—

কার্য্যব্যাসঙ্গাৎ কথাবিচ্ছেদো বিক্ষেপঃ ঐ ঐ ২০।

কোন কার্য্যের ভাণ করিয়া যে কথা বন্ধ করা, তাহাকে বিক্ষেপ বলে। এইস্থলে ইহা বিবেচ্য যে, প্রকৃত আবশ্যক কার্য্যের জন্য যদি কেহ কথা বন্ধ করিয়া উঠিয়া যায়, তবে ঐ কথা বন্ধ-করাকে বিক্ষেপ বলিতে পারা যায় না।

"স্বপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষদোষপ্রসঙ্গো মতানুজ্ঞা" ঐ ঐ ২১ সূ।

যে ব্যক্তি অপর পক্ষের প্রদত্ত দোষকে নিবারণ না করিয়া স্বপক্ষে স্বীকার করিয়া লয় এবং অপর পক্ষেও দোষ দিতে থাকে, এইরূপ স্থলে সেই ব্যক্তির স্বপক্ষে অপর পক্ষের দোষ স্বীকার করিয়া লওয়াকে মতানুজ্ঞা বলা যায়।

ভাষ্য—

যঃ পরেণ প্রতিপাদিতং দোষং স্বপক্ষে অভ্যুপগম্যানুদ্ধৃত্য বদতি ভবৎপক্ষে সমানোদোষ ইতি স্বপক্ষে দোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষে দোষং পসঞ্জয়ন পরমতমনুজানাতীতি মতানুজ্ঞানাম নিগ্রহস্থান মাপদ্যতে"। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরের প্রদত্ত দোষকে নিবারণ না করিয়া স্বপক্ষে অঙ্গীকার করে এবং ইহা বলে যে, তোমার পক্ষেও আমার পক্ষের ন্যায় তুল্য দোষ। এইরূপ স্থলে সেই ব্যক্তি স্বপক্ষে অপর পক্ষ প্রদত্ত দোষ স্বীকার পূর্ব্বক অপর পক্ষে দোষ দেওয়াতে ঐ পক্ষেরই অনুমোদন করিয়া লয়। এই জন্য মতানুজ্ঞাটা নিগ্রহস্থানে পরিণত হইয়া পড়ে।

পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণং—

"নিগ্রহস্থানপ্রাপ্তস্যানিগ্রহঃ
পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণং।

ঐ ঐ ২২।

যে পরাজয়প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাকে, তুমি পরাজয়প্রাপ্ত হইলে, এইরূপে নিগ্রহ না করাকে পর্য্যনুযোজ্যোপেক্ষণ বলে।

এইস্থলে 'তুমি পরাজয়প্রাপ্ত হইলে' এই কথাটা মধ্যস্থকেই বলা উচিত।

নিরনুযোজ্যানুযোগের লক্ষণ—

"অনিগ্রহস্থানে নিগ্রহস্থানাভিযোগো নিরনুযোজ্যানুযোগঃ"। ঐ ঐ ২৩।

যাহার পরাজয় হয় নাই তাহাকে যদি তোমার পরাজয় হইয়াছে, এরূপে অভিযুক্ত করা যায়, তবে উহা নিরনুযোজ্যানুযোগ নামে অভিহিত হয়। ঐ ঐ ২৩।

"সিদ্ধান্তমভ্যুপেত্যানিয়মাৎ কথাপ্রসঙ্গো হপসিদ্ধান্তঃ"। ঐ ঐ ২৪।

নিজ মতে সিদ্ধান্ত স্বীকার করিয়াও যে অনিয়মপূর্ব্বক অর্থাৎ ঐ সিদ্ধান্তের অননুযায়ী কথার উল্লেখ তাহাকে অপসিদ্ধান্ত বলা যায়।

নিদর্শন, কোন ব্যক্তি 'আমি সাঙ্খ্য মতে কথা আরম্ভ করিব' প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আবির্ভাবের আবির্ভাব স্বীকার করিয়া বসিলেন, এবং অপর ব্যক্তি উহাতে অনবস্থাদোষ দেখাইল। কিন্তু এই দোষ নিবারণের জন্য তিনি সাঙ্খ্য মতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আবির্ভাবটাকেই উৎপত্তি ও প্রাগভাববিশিষ্ট মানিয়া বসিলেন।

হেত্বাভাস—

"হেত্বাভাসাশ্চ যথোক্তাঃ"। ঐ ঐ ২৫ সূ।

হেত্বাভাসসমূহ যেরূপে পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেইরূপেই ঐগুলি নিগ্রহস্থানে অন্তর্নিবিষ্ট হয়।

পাঠক, দার্শনিকাগ্রণী মহর্ষি গোতম যে, কথায় ২২ প্রকার পরাজয় ও ঐ গুলির প্রত্যেকে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা গেল। ইহা হইতে ইহাও বুঝিতে বাকি রহিল না যে, মহামুনি গোতমের সময়ে আর্য্যজাতি বিদ্যা ও সভ্যতার অনাময় আলোকে প্রতিভাত হইয়াছিল। আর ঐ উভয়ের অভাব থাকিলে কখন বাক্য ব্যবহার সম্বন্ধে এইরূপ যুক্তিপূর্ণ সুশৃঙ্খল উৎকৃষ্ট নিয়ম ন্যায়দর্শনে দেখিতে পাইতাম না। পক্ষান্তরে, অসভ্য বা অৰ্দ্ধসভ্য সমাজের ত কোন কথাই নাই, বর্ত্তমান অন্যান্য সুসভ্য সমাজেও ইহার সমানাভিহার দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইহা অতীব সত্য যে, দার্শনিক সমাজে কথা কহিয়া বিজয় লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়, অনেকেই মনে করেন যে, কথার তর্ক লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন কি? যে কোন প্রকারে হউক মনের ভাবটা ব্যক্ত করিতে পারিলেই হইল। অবশ্যই তাঁহারা এরূপ মনে করিতে পারেন, কেননা এই বিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা আছে। পরন্তু মনের ভাবটা কথা দ্বারা ব্যক্ত করিয়া অপরকে বুঝাইয়া দেওয়া সকল স্থলে সহজ হইতে পারে কি না, ইহা বিবেচ্য। তবে যাহাদের মনোভাবটা সাধারণ কায়িক কৃত্যের গণ্ডীর ভিতরেই থাকিয়া যায়, কখন উহার সীমা অতিক্রম করিতে পারে না, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাই বলিয়া যে তাহাদিগকে আদর্শ করিয়া চলিতে হইবে, এই বা কোন কথা? ফলতঃ মনের ভাবটা প্রত্যেক ব্যক্তির একই প্রণালীতে বিকাশ প্রাপ্ত হয় না, শিক্ষা ও সঙ্গ ভেদে ইহার তারতম্য ঘটিয়া থাকে। দিনু বশাকের পিশামহাশয়ের মনোভাবটা স্বনামধন্য ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসগরের মনোভাব হইতে যে একটা স্বতন্ত্র জিনিষ, ইহা কে না স্বীকার করে? আর ইহাও মিথ্যা নহে যে, যাঁহার মনোভাব যত অধিক ক্রমবিকাশের দিকে অগ্রসর হইয়াছে, তাঁহাকে উহা প্রকাশ করিতে তত অধিক প্রয়াস পাইতে হয়। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহর্ষের

মনোভাবটা যদি কেবল রসকাদম্বিনী প্রণেতার রসাল মনোভাবের ন্যায়ই হইত, তবে তাঁহাকে খণ্ডনখণ্ডখাদ্য লিখিবার প্রয়াসে লিপ্ত হইতে হইত না; কিন্তু তিনি কোন রসসৌদামিনী বা মাধুর্য্যতটিনীই লিখিয়া যাইতেন এবং আমরাও মাথা ঘামাইয়া উহার পড়ার দায় হইতে অব্যাহতি পাইতাম। অতএব বুঝিতে পারা গেল যে, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকের পক্ষেই মনোভাব ব্যক্ত করা সহজ কথা। কিন্তু যাহাঁরা বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া পুঁথি দেখিতে দেখিতে পলিতকেশ হইয়া পড়িয়াছেন বা দর্শন শাস্ত্রের জটিল বিষয় লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ঐ ব্যাপারটা কঠিনতার দায় হইতে কোন প্রকারে পরিত্রাণ পায় না। এই স্থলে ইহা বলিলেও অন্যায় হইবে না যে, যে জাতিতে দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করেন নাই, অথবা নামমাত্র করিয়াছেন, সেই জাতি কোন প্রকারে বহিঃসভ্যতালাভ করিতে পারিলেও জ্ঞানের দিবালোকে আলোকিত বা অন্তরসভ্যতায় সমলঙ্কৃত হইতে পারে না। গোতম, কপিল, কণাদ, জৈমিনি, ব্যাস প্রভৃতি এবং শঙ্কর, কুমারিল, মণ্ডন, উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি দার্শনিক জন্মগ্রহণ না করিলে আর্য্যজাতির মধ্যে কখন এইরূপ ভাবে অন্তরসভ্যতা ও জ্ঞানলোক বিকীর্ণ হইত না। হয়ত বৌদ্ধযুক্তির কষাঘাতে এতদিনে বৈদিকধর্ম্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইত। সুতরাং যখন জাতীয় অভ্যুদয়ে দার্শনিকের অভ্যুত্থান ও তদীয় জ্ঞানসংপ্রসারণ নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী, তখন তাঁহাদের ভাব ও উহা ব্যক্ত করিবার উপকরণস্বরূপ ভাষাকে কোন জাতীয় হিতাভিলাষী বিজ্ঞব্যক্তি অবজ্ঞা করিতে পারেন না। আর ইহাই বা কে অস্বীকার করিতে পারে যে, দার্শনিক বিষয়ের অনুশীলন না করিলে মানব মন কিছুতে প্রশস্ত ও উদার হইতে পারেনা। এমন কি, যে ধর্ম্ম দার্শনিক ভাবের সহিত সম্পর্ক রাখে না তাহা মানবমনকে অপ্রশস্ততা ও অনুদারতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে অক্ষম। দুঃখের বিষয় এই যে, পরমহিতকারী ঐ দর্শনশাস্ত্রের অধিকারী সকলে হইতে পারে না, এইজন্য পৃথিবীতে দার্শনিকের সংখ্যা কম। সুতরাং অনধিকারীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া বস্তুতত্ত্বের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হওয়াই দার্শনিকের পক্ষে উচিত।

---

# আর্য্যনীতি-বিজ্ঞান।

( পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর )

অতঃপর আমরা ব্যক্তিগত সদ্‌গুণের কথা শেষ করিয়া মানবগণের পরস্পরের সম্বন্ধজাত গুণ ও দোষসমূহের বিষয় আলোচনা করিব। এইগুলিকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। গুরুজনের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে গুণ ও দোষ।

২। তুল্য ব্যক্তির প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে গুণ ও দোষ।

৩। কনিষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে গুণ ও দোষ।

সদ্‌গুণসমূহকে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করিলে আমরা যে প্রকার ব্যক্তির সঙ্গে যে প্রকার সদ্‌গুণ আচরণীয় তাহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহা অভ্যাস করিতে পারিব। এবং যে প্রকার ব্যক্তির সম্বন্ধে যে দোষসমূহ বর্জ্জনীয় তাহাও সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়া তাহার পরিহারে কৃতকার্য্য হইব। সুপবিত্র প্রীতিই সকল সদ্‌গুণের মূল, এবং তাহার ফল আনন্দ। সেইরূপ ব্যক্তিগত দ্বেষ ও ঘৃণা হইতেই সকল দোষের উদ্ভব, এবং তাহার ফল দুঃখ।

গুরুজনের প্রতি ব্যবহার।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রাগ ও দ্বেষ হইতে গুণ ও দোষ—পুণ্য ও পাপের উৎপত্তি হয়। অনুরাগ বা ভালবাসা আমাদিগকে পরার্থে স্বার্থত্যাগ করিতে, নিজ ইষ্টকে সাধারণের ইষ্টাধীন করিতে, প্রবৃত্ত করে। সুতরাং নিঃস্বার্থ ভালবাসাই সদ্‌গুণসমূহের মূল; কারণ, তদ্দ্বারাই একত্ব উপলব্ধি হয়। পক্ষান্তরে, দ্বেষ বা ঘৃণা আমাদিগকে পরস্ব গ্রহণ করিতে নিজের সুখের জন্য পরের অনিষ্টাচরণপূর্ব্বক অভীষ্ট সামগ্রী সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত করে। সুতরাং দ্বেষ ও ঘৃণাই সর্ব্বপ্রকার দোষের বা পাপের মূল; কারণ, তদ্দ্বারাই ভেদজ্ঞান উদ্রিক্ত ও পরিপুষ্ট হয়। যাহাকে ভালবাসি তাহার জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়া আমরা আনন্দ লাভ করি। এইরূপে আমরা বুঝিতে পারি যে আত্মার প্রকৃত সুখ, যথার্থ আনন্দ, কেবল ত্যাগ দ্বারাই লব্ধ হয়। জীবাত্মার আনন্দ ত্যাগে অর্থাৎ দানে। দেহের আনন্দ গ্রহণে। প্রকৃত প্রেম, আত্মা হইতে উৎপন্ন এবং আনন্দেরই রূপান্তর। তাই প্রেম কর্ত্তব্যপালন ও স্বার্থত্যাগকে সুখ ও আহ্লাদের বিষয়ে পরিণত করে। প্রথম প্রথম প্রবৃত্তি বা হৃদয়াবেগসকল বিধিনিষেধের বাধ্য থাকে না; বস্তুতঃ তখন বিধি নিষেধের জ্ঞানই থাকে না। পরে যখন বিধিনিষেধের জ্ঞান হয়, তখন প্রবৃত্তি সমূহ অল্পে অল্পে সেই জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইতে থাকে। প্রবৃত্তিসমূহ

জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হইলেই মানব নীতিবান হইয়া উঠে। বিধিনিষেধ সমূহের নির্দ্দেশ ও তাহাদের কারণ প্রদর্শন ব্যবহারিক নীতিশাস্ত্রের (Practical Ethics) কার্য্য। অনুক্ষণ আনন্দান্বেষণে-নিরত প্রবৃত্তিসমূহকে ক্ষণিক, নিকৃষ্ট, 'পরিণামে বিষময়' দেহানন্দ হইতে বিরত করিয়া শাশ্বত আত্মানন্দের অনুবর্ত্তী করা নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এক কথায়, বিবেকের প্রতিষ্ঠা করিয়া সুখেচ্ছাকে তদনুবর্ত্তী করা—চিৎ ও আনন্দের মধ্যে সখ্য স্থাপন করা নীতিবিজ্ঞানের কার্য্য। মানবজাতি পরস্পরের সহিত যে অগণনীয় সম্বন্ধবন্ধনে আবদ্ধ, কিরূপে সেই সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধ চিরানন্দময় হইতে পারে তাহাই আমাদের এক্ষণে আলোচ্য। প্রথমে গুরুজনগণের সম্বন্ধে রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি প্রবৃত্তিকে, কিরূপে বুদ্ধিনিয়ন্ত্রিত সুপথে, পরিচালিত করা কর্ত্তব্য তাহার অনুশীলন করা যাইতেছে। ঈশ্বর, রাজা, পিতা মাতা, শিক্ষাদাতা ও বয়োবৃদ্ধগণ স্বভাবতই আমাদের শ্রেষ্ঠ ও পূজ্য।

ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা, ভক্তি, পূজা ও আত্মসমর্পণরূপে প্রকটিত হয়। ঈশ্বর জীবাত্মা অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া এবং তাঁহার অনন্ত দয়ায় মুগ্ধ হইয়া মানব তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং ঈশ্বরের প্রতি জীবের শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত তাহার দীনতা, কৃতজ্ঞতা ও আত্মসমর্পণেচ্ছা মিশ্রিত থাকে। তাঁহার তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি হওয়াতেই মানবের দীনতা বা আত্মলঘুত্ব জ্ঞানের আবির্ভাব হয়। কিন্তু এ দীনতায় ঈর্ষা থাকে না, কারণ, যিনি অনন্তগুণে বড় তাঁহার সম্বন্ধে ঈর্ষা হয় না, বরং তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতে—তাঁহার ঐশ্বর্য্যের ভাগী হইতে—তাহার পদে আত্মসমর্পণ করিতে অভিলাষ হয়। ভগবানের সর্ব্বজ্ঞত্বে, সর্ব্বশক্তিমত্তায় ও সর্ব্বাশ্রয়ত্বে ঐকান্তিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা থাকাতেই জীব তাঁহার দ্বারা পরিচালিত হইতে ও তাঁহার পদে আত্মসমর্পণে ব্যগ্র হয়। তাঁহার অপার করুণার কথা চিন্তা করিয়া মানুষ কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত হয় এবং তাঁহার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হয়। হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থ সকলে অনেকানেক ভক্ত মহাপুরুষের কাহিনী বিবৃত আছে। তাঁহাদের চরিত্রে ঐ সকল গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছিল। দেখ, ভীষ্ম কিরূপে বিষ্ণু-অবতার শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি ও পূজা করিয়াছিলেন। শরশয্যায় শয়নাবস্থায় তিনি শ্রীকৃষ্ণের যে স্তব করিয়াছিলেন, তাহা অধ্যয়ন ও ধ্যান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।

রাজসূয়যজ্ঞ সময়ে ভীষ্মদেব প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে অর্ঘ্যদান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। নারদ বলিয়াছেন, "বিশ্বের আদি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের পূজা যাহাদের মনঃপূত নহে, তাহারা মিষ্টবাক্য ও সদ্ব্যবহারের উপযুক্ত নহে। যে সকল ব্যক্তি কমলপত্রাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে ইচ্ছা করে না, তাহারা জীবিত হইয়াও মৃত।" মৃত্যুসময়ে ভীষ্ম কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণের চিন্তাপূর্ব্বক তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন। সুদীর্ঘ ধর্ম্মোপদেশ সমাপনান্তে তিনি বাসুদেবের সহস্রনাম কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং দেহত্যাগের পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি গ্রহণই তাঁহার শেষ বাক্য।

দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর পুত্র প্রহ্লাদ

ভগবদ্ভক্তের চিরপ্রসিদ্ধ আদর্শ। আচার্য্যের সহস্র উপদেশ ও নির্ব্বন্ধাতিশয় সত্ত্বেও তিনি নিরন্তর হরির উপাসনা ও হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে নানামতে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, শেষে তাঁহার প্রাণ-সংহার পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার হরিভক্তি বিচলিত হয় নাই। তাঁহার হরিভক্তিবলে মদমত্ত হস্তিগণও তাঁহাকে পদদলন করিতে নিযুক্ত হইয়া তাঁহার পদলেহন করিয়াছিল। যে গুরুভার পাষাণের চাপে তাঁহার চূর্ণ হইবার কথা, তাহাও তাঁহার বক্ষে তুলার ন্যায় লঘু হইয়াছিল। যে তরবারির তীক্ষ্ণধারে তাঁহার মস্তক ছিন্ন হইবার কথা, তাহাও তাঁহার গলদেশে লাগিয়া হীনধার হইয়াছিল। যে বিষে তাঁহার ধমনীতে মৃত্যু সঞ্চারিত হইবার কথা, তাহাও সুবিমল জলের ন্যায় তাঁহার দেহ সুশীতল করিয়াছিল। অবশেষে ভগবান নরসিংহ মূর্ত্তিতে স্ফটিকস্তম্ভ ভেদ করিয়া অবতীর্ণ হইলেন এবং স্বীয় সেবককে চিরদিনের জন্য বিপন্মুক্ত করিলেন। এইরূপে অলোকসামান্য ভক্তিবলে সকল নির্য্যাতন ও সকল দুর্দ্দৈব জয় করিয়া প্রহ্লাদ ভগবৎসমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন--

"নাথ যোনিসহস্রেষু যেষু ব্রজাম্যহং।
তেষু তেষ্বচ্যুতাভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা হরৌ॥"
(বিষ্ণুপুরাণ ১। ২০। ১৮)

ধ্রুব বিমাতার দুর্ব্ব্যবহারে সন্তপ্ত হইয়া পিতৃসদন পরিত্যাগপূর্ব্বক বনে গমন করিয়া এরূপ প্রগাঢ় ভক্তি ও অদম্য অধ্যবসায় সহকারে বিষ্ণুর আরাধনা ও তপস্যা করিয়াছিলেন যে, শ্রীহরি প্রীত হইয়া তাহাকে দর্শন দিলেন এবং ত্রিলোকীর সীমান্তে ধ্রুব নক্ষত্রে তাঁহার সিংহাসন স্থাপনপূর্ব্বক ধ্রুবলোকের আধিপত্য তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিলেন।

যাঁহাকে আমি একান্ত ভক্তি করি, স্বভাবতই তাঁহার পদানুসরণ করিতে আমার বাসনা হয়। আবার যদি সেই আদর্শ পুরুষ স্বয়ং ঈশ্বর হন, তাহা হইলে সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে যে আমার ঐকান্তিক আগ্রহ হইবে, ইহা বলা বাহুল্য। জ্ঞান ও সহানুভূতিই আনুগত্য জন্মাইয়া থাকে, কারণ জ্ঞানের দ্বারা সৎপন্থা প্রদর্শিত হয়, এবং সহানুভূতি সর্ব্বাপেক্ষা সুগম পথের ব্যবস্থা করে। ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও অনন্ত দয়ালু; সুতরাং সর্ব্বতোভাবে ঈশ্বরানুগামিতা যে তত্ত্বজ্ঞানিগণের নিরতিশয় শ্রেয়ঃ ও প্রিয় হইবে, ইহা ত স্বতঃসিদ্ধ কথা। যখন জীবনের সকল ঘটনা সেই দয়াময়ের ইচ্ছাধীন বলিয়া জ্ঞান হইবে তখন তদুদিত সুখ দুঃখ সমভাবে সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করিবার সামর্থ্য হইবে। পুত্র যেরূপ জ্ঞানী ও স্নেহময় পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, জীবাত্মাও তেমনি স্বীয় সর্ব্বজ্ঞ ও করুণাময় পরমপিতার আজ্ঞাধীন হইবে। তাই আমরা পূর্ণমনুষ্যত্বের চিরাদর্শস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রে ঈশ্বরেচ্ছানুগমনশীলতার চূড়ান্ত উদাহরণ দেখিতে পাই। তাঁহার রাজসিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইবার পর যে সমস্ত বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তদবসরে তিনি পুনঃ পুনঃ সকলকে এই বলিয়া সান্ত্বনা করিয়াছিলেন যে, জগতে যাহা কিছু ঘটে সমস্তই মঙ্গলের নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে নিজে তিনি সেই প্রবল ঝটিকাবর্ত্তের

মধ্যে অচল অটলের ন্যায় অবিচলিত ও প্রশান্ত ছিলেন।

পক্ষান্তরে, যাহারা পরমপুরুষে শ্রদ্ধাবান্ নহে, আমরা পদে পদে তাহাদের পরাভব দেখিতে পাই। রাবণের ন্যায় পরাক্রান্ত ও বিশ্ববিজয়ী ভূপতিগণও ঈশ্বরের দ্রোহিতা করিতে গিয়া সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিলেন। মগধরাজ জরাসন্ধ, শ্রীকৃষ্ণের বাক্য অবজ্ঞা করিয়া বন্দী রাজগণকে মুক্ত করেন নাই; সে জন্য তাঁহাকে ভীমের হস্তে নিহত হইতে হইয়াছিল। শিশুপাল কৃষ্ণনিন্দা করিয়া তাঁহার চক্রাঘাতে হত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ অবহেলা করিয়া দুর্য্যোধন সবান্ধবে বিনষ্ট হইয়াছিল। এরূপ আরও বহুসংখ্যক উদাহরণ পুরাণ ও ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। যে কেহ ঈশ্বরের দ্বেষ বা অবজ্ঞা করিবে তাহাকে নিশ্চয়ই অকালমৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে।

রাজভক্তিও শাস্ত্রে ভূয়োভূয়ঃ অনুশাসিত হইয়াছে। এবং বহুল উদাহরণ দ্বারা তাহার প্রয়োজন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থের সিংহাসনে আরূঢ় হইলে তাঁহার চারি ভ্রাতা দিগ্বিজয়ে গমনপূর্ব্বক জয়লব্ধ ধন আনিয়া তাঁহার পদে অর্পণ করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা রাজার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন, নিজ স্বার্থ সাধনের জন্য নহে। যখন যুধিষ্ঠির দ্যূত-ক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া অরণ্য আশ্রয় করেন, তখন প্রজাগণ ধৃতরাষ্ট্রের আধিপত্য পরিহার-পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমনে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক রাজা ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে আদেশ করিয়াছিলেন; এবং বলিয়াছিলেন যে এইরূপে কর্ত্তব্যপালন দ্বারাই প্রজাগণ রাজ্যের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনে সমর্থ হয়।

# গ্রন্থ-সমালোচনা।

—★—

**কুন্দ।**— শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত। মূল্য আট আনা মাত্র।

এই নাতিক্ষুদ্র পুস্তকখানি কতকগুলি গীতি-কবিতার সংগ্রহ এই সকল কবিতার অনেকগুলিই ইতিপূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন নির্ব্বাচন-কুশল মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে এই সকল কবিতা অগ্রাহ্য বা উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু ধরিয়াই বা লইতে হইবে কেন? পুস্তক পড়িয়া দেখিলাম, অনেক কবিতাই সরস ও কবিত্ব গুণোপেত। তবে, গ্রন্থকার নবীন এবং ইহাই তাঁহার প্রথমোদ্যম বলিয়াই বোধ করি তাঁহার স্বভাবসুন্দর প্রসন্ন ভাবগুলি সকল স্থলে সম্যক্ আত্মবিকাশ করিতে পারে নাই, কোথাও বা এলাইয়া পড়িয়াছে। তথাপি, মোটের উপর আমরা অনায়াসেই বলিতে পারি যে, কালিদাস বাবুর কবির হৃদয়, কবির দৃষ্টি, আছে। অনুশীলন রাখিলে, জ্ঞানার্জ্জনে স্পৃহা থাকিলে, সর্ব্বত্র উদার সহানুভূতি রাখিতে পারিলে, ইনি যে কালে যশস্বী হইতে পারিবেন, এমন প্রত্যাশা করা যায়। ইনি উৎসাহ পাইবার যোগ্য। নমুনাস্বরূপ দুইটি ক্ষুদ্র কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। দীর্ঘ কবিতা উদ্ধৃত করিবার স্থান আমাদের নাই।

### গোষ্পদের জয়।

পূর্ব্ব গগনে উদিছে ইন্দু ধীরে পূর্ণিমা সাঁঝে,
বিষম দ্বন্দ্ব বাধিল সিন্ধু তড়াগ নদীর মাঝে।
লক্ষে ঝম্পে প্রসারিয়া বাহু সিন্ধু গরজি কয়,
"মম— বিশাল বক্ষে পূর্ণ চাঁদেমা ধরি নিব নিশ্চয়।"
নির্ম্মলা নদী গরবে নাচিয়া কয় কলকল স্বনে,
"সুন্দরী আমি পূর্ণচন্দ্রে আমি ধরি নিব প্রাণে।"
কুমুদ ফুটায়ে মরাল ছুটায়ে তড়াগ হাসিয়ে কয়,
"কেন এ দ্বন্দ্ব' পূর্ণ চন্দ্র মোর বই কারো নয়।"
উদিল ইন্দু। লজ্জিত সবে ভাঙ্গা চাঁদ লয়ে বুকে,
গোষ্পদ-হৃদে পূর্ণ চন্দ্র বিস্ময়ে সবে দেখে।

### বিশ্বশিশু।

আছিল এ বিশ্বশিশু নীরব নির্ভয়,
নত নেত্র আপনাতে হইয়া বিভোর,
অধিকার করি সুখে চির শান্তিময়
স্নেহময়ী সৃষ্টিদেবী জননীর ক্রোড়।
সহসা চমকি উঠি নেহারিল দূরে,
আসিতেছে ধীর পদে জনক প্রলয়।
"এস বিশ্ব" ডাকিল সে পিতা স্নেহময়।
তাড়াতাড়ি বিশ্ব উঠি মা'র কোল ছেড়ে
হাসিমুখে ছুটোছুটি চলিয়াছে তাই,
একবার পড়ে, পুনঃ উঠে, পুনঃ পড়ে—
ধায় পিতৃপানে অন্যে নেত্রক্ষেপ নাই।
সস্নেহ করুণ দৃষ্টি পিতা তারে ডাকে,
বাহুদ্বয় প্রসারিয়া লইবারে বুকে।

শ্রীমান্ কালিদাস রায় নিজের নাম সার্থক করিতে পারিবেন কি না, তাহা ভবিষ্যতে দ্রষ্টব্য।

---

# উপাসনা।

★—

## কর্ম্ম-ব্রহ্ম-বিচার।

( ৯ )

——★——

### যোগ ও সগুণোপাসনাতত্ত্ব।

( ষষ্ঠাংশ। )

(১৩) তন্ত্রশাস্ত্র দ্বারা দেবার্চ্চনা প্রচার।

৭৬। এইরূপে পুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের দ্বারা এই বঙ্গদেশে শিব, শক্তি ও রাধাকৃষ্ণের নানাবিধ বৈদিক ও তান্ত্রিক অর্চ্চনা প্রচারিত হইয়াছে। প্রত্যেক ভদ্রলোকের বাসভবনের উৎকৃষ্ট স্থানে রাধাকৃষ্ণের মন্দির, দুর্গোৎসবের জন্য চণ্ডিমণ্ডপ এবং তন্ত্রশাস্ত্রবিহিত মঙ্গলবাদ্য, নৃত্য, গীত ও আমোদ প্রমোদের নিমিত্ত প্রশস্ত প্রাঙ্গন এবং কোন কোন ভবনে উক্ত প্রাঙ্গনমধ্যে নাট্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেবতার পূজার নিমিত্তে ভবনের একাঞ্চলে পুষ্পোদ্যান এবং ভাগ্যবানদিগের দেবালয়ের একাংশে অতিথীশালা রচিত হইয়াছে। শিব, শক্তি, শালগ্রাম, সীতারাম ও কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দিষ্ট নানাপ্রকার ক্রিয়া এবং শাস্ত্রবিহিত নানাপ্রকার যজ্ঞ সময়ে সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। ব্রত, দান, উপবাস, ব্রাহ্মণ ও অতিথীভোজন দ্বারা ভবন আনন্দময় হয়। তন্ত্রমতে মন্ত্রদীক্ষা, তন্ত্রাদি শাস্ত্র শ্রবণ এবং তন্ত্রোক্ত আত্মতত্ত্ব কথার আলোচনা, এই সমস্ত অনুষ্ঠান এই বঙ্গদেশের শিষ্টাচার। কিছু দিন পূর্ব্বে সকল ভদ্র গৃহেই দেবীভাগবত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ এবং যন্ত্রমন্ত্রসহিত আবশ্যকীয় তন্ত্র সকল এবং নবরাত্রের ব্রত, দুর্গানবমির ব্রত, পুরশ্চরণানুষ্ঠান প্রভৃতির পদ্ধতিসকল যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত ও পালিত হইত। অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য, গুরু পুরোহিত ও গ্রহবিপ্রগণ, সর্ব্বদা ভদ্রভবনে উপস্থিত থাকিয়া যজমানগণের সাহায্য করিতেন। ভাগ্যবান গৃহপতি সকল, যথাধিকার, দীর্ঘকালব্যাপী বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যাবন্দনা, যজ্ঞ, দেবার্চ্চনা, দান ও উপবাসাদি করিতেন।

৭৭। যদিও কালচক্রের পরিবর্ত্তনে চতুর্দ্দিকে বিষয়সেবা ও চিত্তবিক্ষেপ বৃদ্ধি পাইয়া ক্রিয়া সকল অনেক পরিমাণে হ্রাসাবস্থ হইয়াছে, কিন্তু এখনও যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে আবদ্ধ থাকিয়া তাহা রক্ষা করিতেছেন তাঁহারা

আমাদের শত শত ধন্যবাদের পাত্র। বঙ্গদেশের মহিলাগণকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ যে তাঁহারা এই প্রবল কলিযুগে নিত্যসন্ধ্যাবন্দনা, পূজা, ব্রত, দান, দেবসেবা, উপবাস, তীর্থসেবা ইত্যাদি অনুষ্ঠান করিয়া পরমারাধ্য সদাশিবের এবং কুলগুরু ও পুরোহিতের মান রাখিয়াছেন এবং আমাদের বাসভবনকে মঙ্গলকর্ম্ম এবং শুদ্ধাচার দ্বারা পবিত্র করিয়া রাখিয়াছেন।*

৭৮। পুনরুক্তি বাহুল্য যে, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রে বিশেষতঃ এই বঙ্গভূমে যত দেব দেবীর পূজা হইয়া থাকে তাঁহাদিগের সকলকেই উপাসকেরা ঈশ্বর ও ঈশ্বরী বলিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি করেন। ঐ বিশ্বাস ও ভক্তি যথা যে পরিমাণে অধিক, তথা তৎপরিমাণে স্বার্থাভাব। এবং সেই পরিমাণে যজমানের ক্রিয়াযোগ সফল হয়। ঈশ্বরের অসংখ্য মূর্ত্তি ও বিভিন্ন অধিকারের শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট দেশধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ও রুচিধর্ম্ম অনুযায়ী অসংখ্য প্রকারের উপাসনা এই ভারতকর্ম্মক্ষেত্রে তীর্থস্থানে, দেবালয়ে, ঘরে ঘরে প্রচলিত রহিয়াছে। অতএব সর্ব্বত্রে কর্ম্মযোগ প্রণালী-শুদ্ধরূপে মূর্ত্তিমান। আগমশাস্ত্রকে অগণ্য ধন্যবাদ যে, তাঁহার প্রসাদে বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, যোগবাশিষ্ঠ, মহাভারত, ভগবদ্গীতা ও অন্যান্য শতাধিক গীতাসম্মত ক্রিয়াযোগরূপ গুহ্যতম পরমধর্ম্ম, সর্ব্বত্রে প্রতিষ্ঠিত আকার লাভপূর্ব্বক, ভারতকর্ম্মভূমে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ব্বর্গ ফলপ্রসূ, অক্ষয়কল্পপাদপরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে। বিষ্ণুমন্দিরে ব্রাহ্মণেরা "বিষ্ণবে-পরমাত্মনে" প্রভৃতি বেদাগমবিহিত মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন; পৌর ও জানপদবর্গ দীনবন্ধু, দীননাথ, গোবিন্দ, নারায়ণ প্রভৃতি নামোচ্চারণপূর্ব্বক শালগ্রামশিলা ও রাধা-কৃষ্ণের মনোহর মূর্ত্তিকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে-ছেন; বৈষ্ণবদিগের ভজনক্ষেত্র হইতে প্রাণ-সখা শ্রীহরির সঙ্কীর্ত্তন গগনস্পর্শ করিতেছে; শিবালয় সমূহ হইতে শম্ভু শঙ্কর হর বিশ্বেশ্বর ভৈরবরবের রাগবিস্তার হইতেছে, শাক্তদিগের যজ্ঞমণ্ডপ হইতে মা মা শব্দ উত্থিত হইয়া কর্ণ বধির করিতেছে, গঙ্গাতীরে কোটি কোটি আবাল বৃদ্ধ বনিতা, মা গঙ্গা ও মাতঃশৈল-সুতাদি মন্ত্রোচ্চারণ করতঃ ভারতের দিগ্বিতান পরিপূর্ণ করিতেছেন। এইরূপে কর্ম্মযোগ, উপাসকবৃন্দকে, বিধিকৈঙ্কর্য্য হইতে উদ্ধার করিয়া, মানসসরোবরজাত ভক্তিসরোজিনী দ্বারা ঈশ্বরোপাসনায় ব্রতী করিয়া রাখিয়াছেন।

---

* মহাত্মা রামমোহন রায় কহিয়াছেন (চারি প্রশ্নের উত্তরে) "শিবোক্ত শাস্ত্রের অমান্য যাঁহারা করেন, সকল শাস্ত্রের এককালে উচ্ছন্ন তাঁহারা করিতে পারগ হয়েন, এবং তন্ত্রোক্ত মন্ত্র গ্রহণ ও অনুষ্ঠান তাঁহাদের বৃথা হইয়া পরমার্থ তাঁহাদের সর্ব্বথা বিফল হয়।" তিনি গোস্বামীজির সহিত বিচার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে "যদি (বেদবাহ্যানি শাস্ত্রাণি সম্যগুক্ত মযানঘে) এই বচনকে প্রমাণ করিয়া এমত বল যে মহেশ্বর কৃত তাবত শাস্ত্র অপ্রমাণ হয় তবে তান্ত্রিক দীক্ষা যাহা শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সকলে দেশে আশ্রয় করিয়া উপাসনা করিতেছেন তাহা মিথ্যা হইয়া সম্যক্প্রকারে ঐ উপাসনাকে নিরর্থক স্বীকার করিতে হয়, অথচ শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে কলিতে তন্ত্রোক্ত মতে দেবতার উপাসনা করিবেক। আগমোক্ত বিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎসুধীঃ। যেহেতু ব্রহ্মজিজ্ঞাসা রহিত ব্যক্তিদিগের ঐরূপ তন্ত্রোক্ত উপাসনার দ্বারা কলিতে চিত্তশুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার সম্ভাবনা।"

"স্বল্পমপ্যস্যধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।"
অল্পমাত্র এই ক্রিয়াযোগের সাধনে।
ত্রাণ করে ভবভয় জনম মরণে॥

(১৪) কর্ম্মযোগের উত্তরোত্তর পরিপাকাবস্থা।

৭৯। এই কর্ম্মযোগেরও উত্তরোত্তর পরিপাকাবস্থা আছে। নিরন্তর সন্ধ্যাবন্দনায় ও দেবার্চ্চনায় ঈশ্বরভাবনা নিশ্চল হইলে, কোন কোন অধিকারী দীর্ঘসময়ব্যাপী জপানুষ্ঠানে, কেহবা ধ্যানসমাধি প্রভৃতি যোগসাধনে, কেহ পরোক্ষ ব্রহ্মোপাসনায়, কেহবা অপরোক্ষ রূপে আত্মতত্ত্ববিচারে সক্ষম হয়েন। তন্ত্রশাস্ত্রে কর্ম্মযোগের যে প্রণালী স্থাপন করিয়াছেন এ সমস্ত উচ্চাঙ্গসাধনও তাহার সহিত শৃঙ্খল-বদ্ধ। যোগোস্বরোদয়, যোগার্ণব, দত্তাত্রেয় সংহিতা প্রভৃতি শাস্ত্রে যোগসাধনের বিস্তীর্ণ পদ্ধতি ও উপদেশ এবং মহানির্ব্বাণ জ্ঞানসঙ্কলিনী, কুলার্ণব প্রভৃতি গ্রন্থে ব্রহ্মোপাসনা ও আত্মজ্ঞানের সম্পূর্ণ উপদেশ দৃষ্ট হয়। বহুবিধপ্রকারের যোগাভ্যাস উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কোনটি দেহস্থ ষটচক্র অবলম্বিত, কোনটি দেহস্থনাড়ী-বিশেষ অবলম্বিত, কোনটি দেহের নানা অঙ্গে ব্রহ্মাণ্ডের লোকসংস্থান এবং ভারতীয় তীর্থসমূহ দ্বারা কল্পিত। আবার উহার মধ্যে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত উভয়প্রকার পরোক্ষ ব্রহ্মভাবনার ভেদ আছে। কোন কোন যোগ নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ও সামর্থ্যবাঞ্ছিত সকাম ও সবিকল্প; এবং কোন যোগ বা হরিহর ও দেবিচরণ শরণরূপ অথবা অমূর্ত্ত সগুণব্রহ্মসাধনরূপ সবিকল্প বা নির্ব্বিকল্প অনুষ্ঠান। ফলে এই বর্ত্তমান সময়ে এ সকল অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না। আমাদের মনোরূপ রাজা, সমগ্রচিত্তবৃত্তি, পঞ্চপ্রাণ ও দশেন্দ্রিয়রূপ পারিষদ ও পরিবারবর্গের সহিত প্রবল কলিপ্রেরিত প্রলোভনব্যাধের অভেদ্য বিষয়জালে বদ্ধ হইয়া আছেন। শাস্ত্রচর্চ্চা নাই, মতিগতি নাই, অবসর নাই, শিষ্যের সন্তাপহারক সক্ষম ও সুদৃঢ় গুরু নাই। গুরুব্যতীত যোগানুষ্ঠান অসম্ভব।

৮০। উৎসৃষ্ট রহিতে দেশে
কণ্টকাদি বিবর্জিতে।
অভ্যস্তে সদা যোগ
সমংস্যাৎ সুখদুঃখয়োঃ॥
গুরোরনুগ্রহাৎ শাস্ত্র-
পাঠাদাচারতস্তথা।
বেদান্তার্থ রহস্যার্থ
সম্যজ্ঞানাদুপাসনাৎ॥
গুরু পাদোদকং
শিষ্টসেবিনা সত্যবাদনা।
কণ্ঠ্যাস্যাদি দৃষ্টিপাত
হস্তগতি বিবর্ত্তনাৎ॥
প্রসাদাৎ সদ্গুরোঃ সম্যক্
প্রাপ্নোতি পরমং পদং।
ন গুরোরধিকং তত্ত্বং
যতস্মাৎ পরমং পদং॥
নিমেষাদ্ধেন তস্যৈব
আজ্ঞাপালনতোভবেৎ।
মহানন্দ শতপ্রাপ্তি
স্তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
নানা বিকল্প বিভ্রান্তি
নাশঞ্চ কুরুতেতুষঃ।
সদ্গুরু সর্ত্তুবিজ্ঞেয়ো
ন তুবৈর প্রকল্পকঃ॥
অতএব মহেশানি
সদ্গুরুঃ শিবআদিতঃ।

সত্যবাদী চ সংশীলো
গুরুভক্ত দৃঢ়ব্রতঃ॥
স্বধাচাররতাত্মানো
দানাদিশীল সংযুতঃ।
কাপট্যলোভ বিন্যাসী
মহাবংশ সমুদ্ভবঃ॥
ঈদৃশঃ সদ্গুরুস্তস্য
সংগতোযত্নবান্ ভবেৎ।
তদেব মনসঃ শান্তিং
প্রাপ্নোতি পরমং পদং॥

( ইতি প্রাণতোষিণ্যাংধৃত যোগস্বরোদয় বচনানি। প্রাঃ তোঃ ৪৯১ পৃ )

যোগাভ্যাসে শিষ্যকে দীক্ষিত করিবার নিমিত্তে যেরূপ লক্ষণাক্রান্ত গুরু ও শিষ্য আবশ্যক তাহা এই সমস্ত বচন হইতে জানা যাইতেছে। শিষ্য, গুরুর নিকট হইতে শিষ্টাচারানুসারে শাস্ত্র পাঠ করিবেন। বেদান্তার্থ, রহস্যার্থ জ্ঞাত হইয়া জ্ঞানসাধন ও উপাসনা করিবেন। গুরুপাদোদক সেবা করিবেন। সত্যবাদী হইবেন। গুরু-আজ্ঞা পালন করিবেন। এতাদৃশ শিষ্য পরমপদলাভে সক্ষম হয়েন। গুরু, শিষ্যের নানা সন্দেহ ও ভ্রম নাশ করিবেন। সত্যবাদী সংশীল গুরুভক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইবেন। কাপট্য ও লোভ রহিত এবং মহাবংশসমুদ্ভব হইবেন। অর্থাৎ সংকুলজাত, শাস্ত্রজ্ঞ, গৃহস্থ ব্রাহ্মণ হইবেন। যত্নপূর্ব্বক ঈদৃশ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেক। তাঁহার প্রসাদে যোগাভ্যাসাদি করিলে মনের শান্তি ও পরমপদ লাভ হইবে।

৮১। যোগাভ্যাস সম্পূর্ণরূপে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণসংযম, প্রত্যাহার, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি অনুষ্ঠানসাপেক্ষ। তাহাতে স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মদেহ উভয়েরই সংযম প্রয়োজন। উপরি উক্ত প্রকার লক্ষণসম্পন্ন গুরু ও শিষ্য উভয় সংযোগ ব্যতীত তাহা ক্রিয়াতে পরিণত হইতে পারে না। এই ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে তাদৃশ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান থাকিতে পারে। কিন্তু এই বঙ্গ ও মিথিলা সমাজে তাহা দৃষ্ট ও শ্রুত হয় না। সম্প্রতি যাঁহারা কাশি প্রভৃতি স্থান হইতে সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত দর্শন পড়িয়া আসিতেছেন, তাঁহারা মহামহা দার্শনিক পণ্ডিত হইলেও অনুষ্ঠেয় যোগের গুরু নহেন। কিছু দিন হইতে যোগাভ্যাসের পক্ষসমর্থনকারী দুই চারিজন শিষ্য ও গুরু ইতস্ততঃ দৃষ্ট ও শ্রুত হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদের যোগবিদ্যা দেশীবিলাতীবিমিশ্র বিজ্ঞান বিশেষ। এবং গুরু ও শিষ্য কেহই শাস্ত্রীয় লক্ষণ ও কুলাচারসম্মত নহেন।

৮২। এমত স্থলে, ক্রিয়াযোগের পরিপাকাবস্থা, পূর্ব্বকালে অধিকারীবিশেষে যেরূপ যোগানুষ্ঠান উৎপন্ন করিত তাহা এখন সম্ভব নহে। সুতরাং অশাস্ত্র যোগসাধনে ব্যগ্র হওয়া কাহারও উচিত নহে। ফলতঃ কুলগুরুদ্বারা দীক্ষা নাই, তদনুযায়ী নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান নাই, কর্ম্মযোগের অথবা বিধিবিহিত ক্রিয়ার সাধন নাই, কুলদেবতার সেবা নাই, মধ্য হইতে অবৈধ যোগসাধনরূপ অশাস্ত্র ব্রত গ্রহণ—এরূপ মতি চপলতা মাত্র এবং অনর্থক। অতএব ঐসকল অনুষ্ঠানে অগ্রে দৃঢ়তররূপে ব্রতী হওয়া এবং কুলগুরুর উপদেশানুসারে জপ অনুষ্ঠান করা বিহিত।

( ১৫ ) ব্রহ্মযোগ।

৮৩। উক্তপ্রকার অনুষ্ঠানসম্পন্ন এবং তদতিরিক্ত শমদম বিবেক বৈরাগ্যাদি সাধন-

বিশিষ্ট অধিকারীর প্রতি তন্ত্রশাস্ত্রে নির্গুণ ও পরোক্ষজ্ঞানাবলম্বনে পরব্রহ্মের মন্ত্রসমবায়ী ও দ্রব্যময় কর্ত্তৃতন্ত্রসাধন উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহাতেও ঐরূপ গুরুর প্রয়োজন। কেননা তাদৃশ উপাসনা অনুষ্ঠানসাপেক্ষ এবং যোগসাধনস্বরূপ। এতদ্ভিন্ন তন্ত্রশাস্ত্রে সাধননিরপেক্ষ আত্মতত্ত্ব বিচারেরও উপদেশ বিস্তর। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ তাহা উপরিউক্ত সাধন-প্রকরণের মধ্যে মধ্যে কথিত হইয়াছে। তাহাও পরম যোগরূপ ক্রিয়া; কেননা তাহা জীবাত্মা এবং পরমাত্মার ঐক্যকরণরূপ মহাযোগরূপ অনুষ্ঠানরূপে প্রদর্শিত এবং তৎকারণে সাধন-প্রকরণের মধ্যে মধ্যে অভিহিত হইয়াছে।

৮৪। এই সাধনীয় ব্রহ্ম-উপাসনারূপ যোগ এবং জীবব্রহ্মে ঐক্যরূপ যোগ সম্বন্ধে নিম্নে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগে কয়েকটি তন্ত্রবচন প্রদর্শন করিতেছি।

ব্রহ্মোপাসনা

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে। প্রাণতোষিণ্যাং ৫০৯পৃ—৫১১ পৃ।

বহুজন্মার্জ্জিতৈঃ পুণ্যৈঃ
সদ্গুরুর্যদি লভ্যতে।
তদাতদ্বক্ত্রতো লব্ধা জন্ম-
সাফল্যমাপ্নুয়াৎ॥
যস্তকর্ণপথোপ্রাপ্তে
প্রাপ্তমন্ত্র মহামণিঃ।
ধন্য মাতা পিতা তস্য
পবিত্রং তৎকুলং শিবে॥
পরব্রহ্মোপাসকানাং
কিমন্যৈঃ সাধনান্তরৈঃ।
মন্ত্রগ্রহণমাত্রেণ
দেহী ব্রহ্মময়োভবেৎ॥

মন্ত্রার্থং মন্ত্রচৈতন্যং
যো ন জানাতি সাধকঃ।
শতলক্ষ প্রজপ্তোঽপি
তস্যমন্ত্র ন সিদ্ধ্যতি॥
মন্ত্রচৈতন্য মেতদ্ধি
তদধিষ্ঠাতৃ দেবতা।
তজ্জ্ঞানং পরমেশানি
ভক্তানাং সিদ্ধিদায়কং॥
তস্যাধিষ্ঠাতৃ দেবেশি
সর্ব্বব্যাপি সনাতনং।
অবিতর্ক্যং নিরাকারং
বাচাতীতং নিরঞ্জনং॥
ব্রাহ্মেমুহূর্ত্তে উত্থায়
প্রণম্য ব্রহ্মদং গুরুং।
ধ্যাত্বাচ পরমং ব্রহ্ম
যথাশক্তিঃ মনুং স্মরেৎ॥
প্রাতর্ম্মধ্যাহ্ন সায়াহ্নে
যথাদেশে যথাসনে।
পূর্ব্ববৎ পরমংব্রহ্ম-
ধ্যাত্বা সাধকসত্তমঃ॥
অষ্টোত্তর শতংদেবি
গায়ত্রি জপমাচরেৎ।
জপং সমর্প্য বিধিবৎ
পূর্ব্ববৎ প্রণমেৎ সুধীঃ॥
ঋষিসদাশিবোঽস্য
ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতং।
দেবতা পরমং ব্রহ্ম
সর্ব্বান্তর্যামি নির্গুণং॥
অঙ্গন্যাস করন্যাসৌ
কথয়ামি শৃণু প্রিয়ে।
তারং সচ্চিদেকমিতি
ব্রহ্মেতি সকলং ততঃ॥

অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীমধ্যা
নামিকাসু মহেশ্বরি।
কনিষ্ঠয়োঃ করতল-
পৃষ্ঠয়োঃ সুরবন্দিতে॥
নমঃ স্বাহা বষট বৌষট
ফড়ন্তৈশ্চ যথাক্রমং।
ন্যাসেন্ন্যাসোক্তবিধিনা
সাধকঃ সুসমাহিতঃ॥
প্রাণায়ামং ততঃ
কুর্য্যান্মূলেন প্রণবেন বা।
মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ
দক্ষহস্তস্য পার্শ্বতি।
বামনাসাপুটং ধৃত্বা
দক্ষনাসাপুটেন চ।
পূরয়েৎ পবনং মন্ত্রী
মূলমন্ত্র মিদং জপন॥
অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষনাসাং
ধৃত্বাকুম্ভকযোগতঃ।
জপেদ্দ্বাত্রিংশতাবৃত্ত্যা
ততো দক্ষিণনাসয়া॥
শনৈঃশনৈস্ত্যজেদ্বায়ুং
জপনষোড়শধামনুং।
বামনাসাপুটেহপ্যেবং
পূরকুম্ভকরেচকং।
পুনর্দ্দক্ষিণতঃ কুর্য্যাৎ
পূর্ব্ববৎ সুরবন্দিতে॥
উপস্থিতানি দ্রব্যাণি
গন্ধপুষ্পাদিকানিচ।
বস্ত্রালঙ্কারণাদীনি
ভক্ষ্যপেয়ানি যানিচ॥
মন্ত্রেণানেন সংশোধ্য-
ধাত্মা ব্রহ্মসনাতনং।
নিমিল্য নেত্রেমতি-
মানর্পয়েৎ পরমাত্মনে॥
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবি
*ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং।*
ব্রহ্মৈবতেন গন্তব্যং
ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা॥
ততো নেত্রসমুন্মীল্য
জপ্ত্বামূলং স্বশক্তিতঃ।
তজ্জপং ব্রহ্মসাৎকৃত্বা
স্তোত্রঞ্চ কবচং পঠেৎ॥

স্তোত্র। নমস্তে সতেসর্ব্বলোকাশ্রয়ায়।
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়॥
নমোহদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়।
নমো ব্রহ্মণেব্যাপিনে নির্গুণায়॥
ইত্যাদি পঞ্চরত্নমিদং স্তোত্রং॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্রোক্ত এই পদ্ধতি সগুণ-নির্গুণমিশ্রিত। ইহা নির্গুণ পরব্রহ্মের উদ্দেশে কিন্তু সগুণোপায়াবলম্বনে বিন্যস্ত। পদ্ধতিটি অনুধ্যান করিলে বুঝা যাইবে যে সদ্গুরু অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী গুরুর নিকট এই ব্রহ্মমন্ত্রময় উপাসনায় দীক্ষিত হওয়া প্রয়োজন এবং তাদৃশগুরু আগমশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত হইবেন। শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের তান্ত্রিক দীক্ষার যেরূপ পদ্ধতি আছে ইহাতে প্রধানতঃ সে সমুদয়ই আছে। অতএব এই উপাসনা, দীক্ষিত শিষ্যের ব্রহ্মমন্ত্রঅবলম্বিত ত্রিসন্ধ্যা-পদ্ধতি। ইহাতে গায়ত্রি আছে, মূলমন্ত্র আছে, গায়ত্রিজপ আছে, ইহার ঋষি সদাশিব, অনুষ্টুপ ছন্দ, সর্ব্বান্তর্যামি নির্গুণ পরব্রহ্ম দেবতা। ইহাতে অন্যান্য সন্ধ্যাবন্দনার ন্যায় অঙ্গন্যাস, করাঙ্গন্যাস, স্বাহা বষট বৌষটাদি অনুষ্ঠান আছে। শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের

সন্ধ্যা-উপাসনার ন্যায় প্রাণায়াম আছে। তদ্ভিন্ন নৈবেদ্য গন্ধপুষ্প, বস্ত্রালঙ্কারাদি উৎসর্গ করারও বিধি আছে। পশ্চাৎ স্তোত্র ও কবজপাঠ আছে।

৮৫। এই ব্রহ্মদীক্ষা নেপাল হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত কোন স্থানে কোন গুরু, কোন উপযুক্ত গৃহস্থ শিষ্যকে, কখনও প্রদান করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় নাই। শাক্ত ও বৈষ্ণবের ন্যায় তাদৃশ কোন সম্প্রদায়ও নাই, ব্যবসায়ী গুরুও নাই এবং গুরু ব্যতীত মন্ত্র গ্রহণও সম্ভবে না। আর যদিই বা কেহ গ্রহণ করিতেন তো তাঁহাকে শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের দেবতাকেও পূজা করিতে হইত, যেমন তাঁহারা পরস্পর করিয়া থাকেন। কিন্তু গুরু-দীক্ষাযোগ্য এই তান্ত্রিক ব্রহ্মোপাসনাপদ্ধতি মৃতবৎসাস্বরূপ তন্ত্রশাস্ত্র মধ্যে পড়িয়া আছে। গুরু ব্যতীত মন্ত্রার্থ ও মন্ত্রচৈতন্যের সহ তাহা জীবিত হইতে পারে না। যে সে ব্যক্তি যথারুচি দুই একটি বচন তাহা হইতে গ্রহণ করিয়া মন্ত্রের ফললাভ করিতে পারেন না। কেননা এ উপাসনা সাধননিরপেক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলন বা আত্মতত্ত্বের বিচার নহে। কিন্তু ইহা কর্ত্তৃতন্ত্র ও মন্ত্রসমবায়ী সাধনবিশেষ এবং যাহা কিছু সাধন ব্যাপার তাহাতেই গুরুর প্রয়োজন। সাধন মাত্রই ক্রমবিহিত-ক্রিয়া। গুরু ব্যতীত শিখায় কে? ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মতত্ত্ব শিক্ষাতেও গুরু চাই বটে কিন্তু সে গুরু, শাস্ত্র এবং শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যজ্ঞানোপদেশের আচার্য্যমাত্র। কোন অনুষ্ঠান শিখাইবার গুরু নহেন। কেননা ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান অনুষ্ঠানসাপেক্ষ নহে। ফলে তন্ত্রোক্ত এই যে ব্রহ্মোপাসনা ইহা ব্রহ্মবিদ্যাতে যুক্ত ক্রিয়া মাত্র। ইহা সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞান নহে। কেবল পরোক্ষ ব্রহ্মের সগুণ উপাসনা মাত্র। ইহার ফল সাক্ষাৎ মোক্ষ নহে, কিন্তু কালান্তরভাবী মোক্ষের পরম্পরা হেতু; সুতরাং ইহা ব্রহ্মাত্মক্ দেব দেবির উপাসনার সহ প্রায়ই সমফলজনক। এবং কর্ম্মযোগের অন্তর্গত। বোধ হয় এই কারণে ইহার স্বতন্ত্র দীক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ত্রিশ বর্ষ পূর্ব্বে পণ্ডিতপ্রবর জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় উক্ত দীক্ষা প্রবর্ত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু বোধ হয় সফল হন নাই। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি মধ্যে উক্ত তান্ত্রিক ব্রহ্মোপাসনার 'পঞ্চরত্ন" নামক স্তোত্রটি মাত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ বর্ত্তমান আদি ব্রাহ্মসমাজ উক্ত স্তোত্রের কতক কতক শব্দগত পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া ব্রহ্মোপাসনাকালে পাঠ করিয়া থাকেন। যাহা হউক যদি সদ্গুরু লাভ হয়, এবং ঠিক অধিকারী শিষ্য থাকে, তবে যথা শাস্ত্র এইরূপ ব্রহ্মমন্ত্র দীক্ষার বাধা নাই। ফলে সে দীক্ষা, কুলধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হইলেও, শাক্ত ও বৈষ্ণব মতের সন্ধ্যোপাসনার স্থান গ্রহণ করিতে পারে না। তদ্ভিন্ন, তাহা সামাজিক নৈমিত্তিক কর্ম্ম ও পূজার্চ্চনাদিকে প্রত্যাখ্যান করিতেও পারে না। আর তাহা যদি সম্পূর্ণ আত্মবিদ্যাতে যুক্ত না হয়, তবে উন্নত ফলও মিলিবে না।*

* জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় অপ্রকাশিত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ভূমিকায় লেখেন যে, সমুদয় তন্ত্রের সংখ্যা ১৯২ খানি। তন্মধ্যে ৬৪ খানি একমাত্র গৌড়রাজ্যে (বাঙ্গালা দেশে) প্রচলিত। পূজ্যপাদ

৮৬। এইরূপ ব্রহ্মমন্ত্র দীক্ষাদ্বারা অদ্বৈত-ব্রহ্মোপাসনা ব্যতীত তন্ত্রশাস্ত্রে জীবব্রহ্মের ঐক্যরূপ যোগানুষ্ঠানের বিস্তর উপদেশ আছে।

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যকরণরূপ যোগ।

প্রাণতোষিণ্যাং পৃ ৫০২-৫০৫।

মুণ্ডমালা তন্ত্রে ষষ্ঠ পটলে।

শ্রীদুর্গাচরণাম্ভোজে
ভক্তিরব্যভিচারিণী।
তদৈব জায়তে ব্রহ্ম-
জ্ঞানং ব্রহ্মবিদুর্লভং॥

কুলার্ণবে পঞ্চম খণ্ডে—

ক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি যঃ
কুর্য্যাদাত্মচিন্তনং।
কোটিজন্মার্জ্জিতং পাপং
তৎক্ষণাত্তস্য নশ্যতি॥

নন্ যোগাবহুবিধাস্তৎ কথং জীবাত্মনোরৈক্যমাত্রং ইত্যুচ্যতে ইতিচেৎ সত্যং। তেযোগাঃ প্রাণায়ামাদি কল্পরূপভন্না গৌণ এব মুখ্যযোগস্ত জীবাত্মনোরৈক্যমেব॥

তথাচ কুলার্ণবে।

নপদ্মাসনতোযোগো
ননাসাগ্রনিরীক্ষণাৎ।
ঐক্যং জীবাত্মনোরাহু-
র্যোগং যোগবিশারদা॥

মহানির্ব্বাণে।

ব্রহ্মজ্ঞানং পরমজ্ঞানং
যস্যচিত্তে বিরাজতে।
কিংতস্য জপযজ্ঞাদ্যৈ
স্তপোভির্নিয়মব্রতৈঃ॥
স্বভাবাদ্ব্রহ্মভূতস্য
কিংপূজাধ্যানধারণাঃ।
নাপিধ্যেয়ো নবাধ্যাতা-
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি জানতঃ॥
অহং ব্রহ্ম নচান্যোস্মি
মুক্তোহমিতিভাবয়েৎ।
সচ্চিদানন্দরূপোহহং
নিত্যমুক্ত স্বভাববান্॥

শ্রীদুর্গাচরণে অব্যভিচারিণী ভক্তি উপার্জ্জিত হইলে কর্ম্মযোগ সার্থক হয়। তাদৃশ কর্ম্মযোগির চিত্তে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে। এ স্থানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগরূপ চিন্তনের মহাত্ম্য কহিতেছেন। ব্রহ্মই আমি এই প্রকার আত্মচিন্তা যিনি করেন তাঁহার কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। প্রাণায়ামাদিরূপ যে সমস্ত যোগ তাহা গৌণমাত্র।

কৃষ্ণানন্দ ঐগুলি হইতে সংগ্রহ করিয়া তন্ত্রসার গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। আর ৬৪ খানি তন্ত্র নেপাল, মিথিলা প্রভৃতি দেশে প্রচলিত। অবশিষ্ট ৬৪ খানি অন্যত্রে প্রচলিত। তর্কালঙ্কার মহাশয় লেখেন, তন্ত্রসারে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের উল্লেখ না থাকায় কেহ কেহ ইহার প্রামাণিকতা বিষয়ে সংশয় করেন, কিন্তু পদ্মপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে তাহার উল্লেখ আছে। ফলে আমরা দেখিতেছি যে প্রাণতোষিণী নামক বিস্তীর্ণ সংগ্রহে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের ভূরি উল্লেখ আছে। যাহা হউক, ইহা সত্য যে, এইতন্ত্র গৌড়রাজ্যের কাস্তিরেখার বহির্ভূত। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ইহা প্রথমে এদেশে আনেন এবং তাহাতে ব্রহ্মোপাসনার পদ্ধতি আছে বলিয়া তৎপ্রতি আদর প্রদর্শন করেন। কিন্তু সে উপাসনা অন্যান্য দৈবোপাসনার ন্যায় মন্ত্র ও দ্রব্যসমবায়ী। তাহা আমি উপরে বলিয়াছি।

কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীকরণরূপ যে যোগ তাহা মুখ্য। পদ্মাসনাদি অথবা নাসাগ্রনিরীক্ষণাদি অভ্যাসপটুতামাত্র যোগ নহে। কিন্তু যোগবিশারদেরা বলেন যে জীবের সহিত আত্মার যে যোগ তাহাই পরম যোগ। এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার চিত্তে বিরাজ করে তাঁহার চিত্তশুদ্ধি বা ব্রহ্মদর্শন নিমিত্তে জপ, যজ্ঞাদি, তপস্যা, ব্রত, নিয়ম প্রভৃতি অন্য কিছুমাত্র অনুষ্ঠেয় নাই। যে মহাত্মা স্বভাবতঃ ব্রহ্মভূত তাঁহার পক্ষে পূজা, ধ্যান ধারণা প্রভৃতি অনুষ্ঠান কি নিমিত্ত? তাঁহার পক্ষে ধ্যেয় ধ্যান ও ধ্যাতা নাই। কেননা সকলই ব্রহ্মময় এই জ্ঞান তাঁহার জাগ্রত। ব্রহ্মই আমার আত্মা, আমি অন্য কিছু নহি, আমি মুক্ত, আমি সচ্চিদানন্দরূপ নিত্যমুক্তস্বভাববান্ ইত্যাদি প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানকে জীবাত্মাতে যোগ করিবেক।

তথাচ যাজ্ঞবল্ক্যে প্রায়শ্চিত্ত অধ্যায়ে।

৩৪। ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বরজ্ঞানাৎ বিশুদ্ধি পরমা মতা।

প্রমাণরূপ জ্ঞান যাহা, তাহাই বুদ্ধিশুদ্ধিজনক। ক্ষেত্রজ্ঞ 'ত্বং' পদার্থভূত যাঁহাকে আমরা জীবাত্মা বলি। তত্ত্বমসি বিচার দ্বারা যে সাক্ষাৎকার ঈশ্বর জ্ঞান (অর্থাৎ অহং ব্রহ্মাস্মিরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান) তাহা ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মার মুক্তিরূপা পরমা বিশুদ্ধি। এই মহাযোগ জীবাত্মার সর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ এবং সাক্ষাৎ আত্মজ্ঞান। তথাচ রাজা রামমোহন রায় প্রণীত পথ্যপ্রদানে প্রথম পরিচ্ছেদে। "যোগশাস্ত্রে—

সোঽহংহংসঃ সকৃৎধ্যাত্মা-
সুকৃতো দুষ্কৃতোপি বা।
বিধূত কল্মষঃ সাধুঃ
পরাং সিদ্ধিং সমশ্নুতে॥

সুকৃত বা দুষ্কৃতো ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্যভাব ও জীবের সহিত ব্রহ্মের ঐক্যভাব একবার করিলেও সাধক সর্ব্বপাপ ক্ষয়পূর্ব্বক সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

কুলার্ণবে—

ক্ষণং ব্রহ্মাস্মীতি যঃ
কুর্য্যাদাত্মচিন্তনং।
তৎসর্ব্ব পাতকং নশ্যেৎ
তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥

জীবব্রহ্মের অভেদ চিন্তা ক্ষণমাত্র করিলেও সকল পাপ নষ্ট হয় যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নষ্ট হয়।"

অপিচ—

কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের ভূতপূর্ব্ব আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ১৭৬৫ শকের ১১ মাঘের ব্রাহ্মসমাজের ব্যাখ্যানে আত্মজ্ঞানের সাধনকে মুখ্য ব্রহ্মোপাসনা কহিয়াছেন। যথা অয়মাত্মা ব্রহ্ম অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি, ইত্যাদি মহাবাক্য প্রতিপাদ্য জীবাত্মা পরমাত্মার যে অভেদচিন্তন ইহা মুখ্যোপাসনা হয়"।

জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যকরণরূপ এই যে পরম যোগ ইহাই মুখ্যব্রহ্মোপাসনা এবং আত্মশুদ্ধি। কর্ম্মযোগের পরিপাকাবস্থায় ইহা সাধকের চিত্তে সমুৎপন্ন হয়। ইহাই বেদ-স্মৃত্যাগমসিদ্ধ আত্মতত্ত্ব এবং নির্গুণমুক্তির সাক্ষাৎ উপায়। ফলে আমরা ইহার পর, ব্রহ্মোপাসনাতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব নামক স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আর দুইটি প্রকরণ লিখিব। অতএব সে সম্বন্ধে এখন আর অধিক বলা বাহুল্য।

৮৭। এতদূরে এই ক্রিয়াযোগ প্রকরণ সমাপ্ত করা গেল। ক্রিয়াযোগই নানাপ্রকার উপাসনা স্বরূপ। নানাপ্রকার সগুণব্রহ্মোপাসনা, সমাধিযোগ, এবং আত্মজ্ঞানসাধন জীবাত্মা পরমাত্মার যোগরূপ মুখ্যব্রহ্মোপাসনা, যথাধিকার ঐ ক্রিয়াযোগের সিদ্ধাবস্থায় সাধককে আশ্রয় করে। ক্রিয়াযোগ নির্গুণোপাসনায় পরিণত হইলে সাধকের নির্গুণমুক্তি হয়। নচেৎ সগুণমুক্তি ও শুক্লাগতি লাভ হয়। ইহা মন্ত্রময় কর্ত্তব্য সাধনসাপেক্ষ ও শাস্ত্রীয় বিধিবিহিত হইলেও বিধিকৈঙ্কর্য্য-বিরহিত এবং ঈশ্বরার্থ নিষ্কাম সাধন বিধায় কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও কর্ম্মবন্ধনশূন্য। এই কর্ম্মযোগরূপ ঈশ্বরারাধনা ক্রিয়াতে গুরু, পুরোহিত, ব্যবস্থাদাতা অধ্যাপক, পৌরাণিক, এবং গ্রহবিপ্রের সাহায্য প্রয়োজন। এরূপ কর্ম্মযোগীগণ ক্রমে জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ-প্রাপ্ত হয়েন, এবং তদবান্তর কালে দেবযান মার্গযোগে দেবলোকে বা সত্যাখ্যব্রহ্মলোকে শুক্লাগতি লাভ করেন। ইতি

# সংস্কৃত ভাষাই সমগ্র আর্য্যভাষার আদি জননী।

পশ্চিমদিগ্‌বলয়ের কোবিদবৃন্দের ইহাই ধারণা ও বিশ্বাস যে, আর্য্যনামধারী কতকগুলি লোক ভারতের বহির্দ্দেশ বাক্‌ট্রিয়া বা ঐরূপ কোন আসিয়াটিক ভূভাগ হইতে ভারতবর্ষ, পারস্য বা ইরাণ ও সমগ্র ইউরোপে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়া হিন্দু, জেন্দ বা পারসিক, গ্রীক, লাটিন, জর্ম্মাণ, শাকসন, লিথুনিয়ান, স্লাভনিক, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজপ্রভৃতি নানা বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। ইহাঁরাই সাধারণতঃ জগতে আর্য্যজাতি বলিয়া পরিচিত, এবং ইহাঁদিগের সংস্কৃত, জেন্দ, গ্রীক, লাটিন, গথিক, জর্ম্মাণ, শাকসন, কেল্টিক, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজী-প্রভৃতি ভাষাই আর্য্যভাষা নামের বিষয়ীভূত। এই ভাষাকদম্বক অথবা অন্ততঃ সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন ও জেন্দ, এই ভাষা চতুষ্টয় পরস্পর ভগিনীভাবাপন্ন, এবং ইহারা সেই আদিম আর্য্যনিকেতনে প্রচলিত অন্য একটি প্রাচীনতম মাতৃভাষা হইতে লব্ধজন্মা। এতদ্ভিন্ন জগতে অপর যে সকল জাতি ও ভাষা আছে, তৎসমুদয় অনার্য্য বা আর্য্যেতর স্বতন্ত্র পদার্থ। কিন্তু আমরা কিছুতেই এহেন ব্যাহত সিদ্ধান্তের নিকট মস্তক অবনত করিতে সমর্থ নহি। আমাদিগের বেদ, বেদান্ত, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতাদি পাঠে আমরা ইহাই জানিতে পারিতেছি যে, আমরা ভারতের বাহিরে যে স্থানে অবস্থিতি করিতে-

ছিলাম, মানবের আদি সূতিকাগার উক্ত পবিত্র ক্ষেত্রের নাম আদিব্যোম বা আদিস্বর্গ ইলাবৃতবর্ষ অথবা পিতৃলোক, যাহা বহু রাজ-পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া সম্প্রতি মঙ্গলিয়া নামে প্রখ্যাত, এবং তথায় সংস্কৃতভাষী কৃত-বিদ্য আমরা সাধারণতঃ দেবতা (বিদ্বাংসো বৈ দেবাঃ) নামে সংসূচিত ছিলাম। কালক্রমে আমাদিগের মাতৃষস্রেয় কিংবা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা (যাঁহারা এইক্ষণে আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ান বলিয়া উপেক্ষিত ও পদাহত,) পূর্ব্ব দেব দৈত্য ও দানবগণ দ্বারা পরাভূত হইয়া বামন বিষ্ণুর সহায়তায় সুরবর্ত্ম পরন্তু অথ অপোগস্তানের পথে জগতের দ্বিতীয় প্রত্নৌক ভারতে আসিয়া প্রবিষ্ট হই। এবং স্বর্গ হইতে এদেশে পূর্ব্বাগত (অতএব এ দেশের আদিম নিবাসী) কৃষ্ণচ্ছ লোকদিগকে পরাভূত করিয়া তাহাদিগের উপর প্রভুত্ববিস্তারপূর্ব্বক সেই শোচনায় অবস্থাপন্ন লোকদিগকে শূদ্র ও আপনাদিগকে প্রভু (Loid) বা আর্য্যনামে (অর্য্যঃ স্বামি বৈশ্যয়োঃ) সমলঙ্কৃত করি। এবং তাহাতেই আর্য্যভূত দেবতা আমাদিগের অধ্যুষিত বিন্ধ্যাচল ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী পবিত্র ভূখণ্ড সম্প্রতি আর্য্যাবর্ত্ত (আর্য্যাণাং আবর্ত্ত আ—সমন্তাৎ বর্ত্তন্তে অত্র বাসস্থানং) নামে প্রথিত হয়। এই আর্য্যাবর্ত্তই জগতের আদি আর্য্যনিকেতন। আর্য্যাবর্ত্তসনাথ এই ভারতবর্ষ হইতে অসুরসেবী অসুরাখ্য আর্য্যগণ, চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় যবন এবং সূর্য বংশীয় ক্ষত্রিয় শক বা শকদ্বয়, কিরাত ও কম্বোজক্ষত্রিয়গণ নানা কারণে কেহ পারস্য, কেহ তুরুস্ক, কেহ আরব কেহ মিশর ও কেহ কেহ বা সমগ্র হরিদ্বীপীয়াতে উপনিবিষ্ট হইয়া সর্ব্বত্র জেন্দ বা পারসীক, আসুরীয় (Assy-rian) ফিনিশীয়ান, কালডিয়ান, হিব্রু, আরমাণী, আরব, মিশর, গ্রীক, লাটিন, গথ, জর্ম্মাণ, শাকসন, লিথুনিয়ান, ফ্রেঞ্চ ও ইংরাজ প্রভৃতি নানা আর্য্যজাতিতে বিভক্ত হইয়াছেন, এবং আর কতকগুলি আর্য্যনামধারী ভারত-সন্তান, চীন, জাপান, লঙ্কা, সিংহল, বরাহ বা বালীদ্বীপ ও পূর্ব্বোপদ্বীপে যাইয়া গৃহপ্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় ভারতীয় আর্য্যসভ্যতার বিস্তার করিয়াছেন। সুতরাং যেরূপ হিন্দু, পারসিক ও ইউরোপীয়গণ আর্য্যনামের বিষয়ীভূত, তেমনই হিব্রু, কালডিয়ান, ফিনিশীয়ান, আর-মাণী, আরব, মৈশর ও গ্রীসদেশগত যবন বা আইওনিয়ানগণ এবং চীন, জাপানী, সিংহলী, মগ বালীদ্বীপ ও লঙ্কাদ্বীপবাসী মনুষ্যগণ আর্য্যনামের বিষয়ীভূত। এবং এই আর্য্যজাতির সাধারণ মাতৃভাষা সংস্কৃতের বিকারেই আজি ভারতের শৌরসেনী, মাগধী, মহারাষ্ট্রী ও পঞ্জাবী প্রভৃতি অষ্টাদশ ভাষা; জেন্দভাষা, হিব্রু, আরেবিক, মৈশর ভাষা, গ্রীক, লাটিন্ প্রভৃতি সমগ্র ইউরোপীয় ভাষা এবং চীন, জাপান, মগী ও সিংহলী প্রভৃতি ভাষাসমূহ সমুৎপন্ন। সুতরাং সংস্কৃত ভাষাই সমগ্র আর্য্যভাষার একমাত্র জননী, সংস্কৃত ভাষার পূর্ব্বে জগতে অন্য কোন ভাষা ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ জগতের সমগ্র সভ্যজাতির মহামান্য বেদ, বাইবেল, কোরাণ বা অন্য কোন ইতিহাস পুরাণাদি গ্রন্থে বিদ্যমান নাই, জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীও ইহার সমর্থনজন্য অঙ্গুলি উত্তোলন করে না। কাত্যায়ন (কাচ্চায়ন) প্রণীত পালী ব্যাকরণ বলিতেছেন যে—

সা মাগধী মূলা ভাষা,
নরা যা আদি কপ্পিকা।

ব্রাহ্মণা চা স্ সুতালাপা,
সংবুদ্ধা চাপি ভাষয়ে॥

অর্থাৎ মগধ দেশে প্রচলিত পালী ভাষাই জগতের আদি ভাষা, কিন্তু মগধদেশের জন্মের কত মহাযুগ পূর্ব্বে যে মঙ্গলায়াতে গীর্ব্বাণ বাণী সংস্কৃতের জন্ম হইয়াছিল, তাহা অবগত থাকিলে কাত্যায়ন একথা বলিতেন না। অবশ্য পাশ্চাত্য কোবিদবৃন্দ, করোটী ও হনুর গঠন বৈষম্যনিবন্ধন ও অন্যান্য কারণে মনুষ্যজাতিকে ককেশীয়, মঙ্গলীয়, ইথিওপীয় ও নিগ্রো প্রভৃতি নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু যখন সমগ্র সেমেতিক জাতি আমাদিগের ন্যায়ই তুঙ্গ-নাসিক, প্রশস্তললাট ও স্বল্পহনু, তখন আমরা তাঁহাদিগকে কোন্ হেতুতে আর্য্যনামের অপাংক্তেয় করিতে অধিকারী? ফলতঃ মঙ্গলিয়াই যখন আমাদিগের সাধারণ পিতৃভূমি, তখন মঙ্গলিয়ানদিগকে আমাদিগের হইতে পৃথক্ করার ন্যায় অসঙ্গত কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। English Accidence গ্রন্থের প্রণেতা মহামতি মারীচ সাহেব সেমেতিক ভাষাকে আর্য্যশ্রেণী হইতে নির্ব্বাসিত করার জন্য হেতু প্রদর্শনচ্ছলে বলিতেছেন যে It has not been shown that the Semetic languages, although inflexional, are historically connected with the Indo-European family. Page 15.

যদিও অন্যান্য আর্য্যভাষার ন্যায় সেমেতিক ভাষাতেও ধাতুরূপ ও শব্দরূপ-প্রভৃতি আছে, তথাপি কেহ এরূপ ঐতিহ্য প্রমাণের অবতারণা করিতে পারেন নাই, যাহাতে উক্ত সেমেতিক ভাষাকে ইণ্ডো-ইউরোপীয়ান কোন ভাষার সহিত কোন প্রকারে সংসৃষ্ট বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা যেন দিব্যচক্ষেই দেখিতেছি যে, হিব্রু, আরেবিক, কালডিয়ান, এসেরিয়ান ও মৈশর-প্রভৃতি ভাষাসমূহ, সমগ্র আর্য্যভাষার বর্ষীয়সী মাতা সংস্কৃতভাষার সহিত বাগর্থবৎ নিত্যসম্পৃক্ত। এক পিতা ও এক মাতার সন্তানদিগের মধ্যেই যখন "কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত", তখন এক ভাষার ভিন্ন ভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্যে অবস্থা ও ব্যবস্থাগত যে কিছু না কিছু পার্থক্য ঘটিবে ও থাকিবে তাহাও যেন অবশ্যম্ভাবী ও স্বাভাবিক। কেবল আমরা নহি অশেষ ভাষার পারদৃশ্বা বহুকাল ভারতপ্রবাসী পণ্ডিতাগ্রণী হালহেড সাহেব মহোদয়ও তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভূমিকায় প্রসন্নহৃদয়েই বলিয়াছেন যে—

"I have been astonished to find this similitude of Sanskrit words with those of Persian and Arabic, and even of Latin and Greek ; and these not in technical and metaphorical terms, which the mutation of refined arts and improved manners might have occasionally introduced, but in the main groundwork of language, in monosyllables, in the names of members, and the appellations of such things as could be first discriminated on the immediate dawn of civilisation.

অতএব আমরা আশা করি, পাঠক ও শ্রোতৃ-কোবিদবৃন্দ কেবল পাশ্চাত্য কাহার কথায় কুসংস্কারান্ধ হইয়া সত্য ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবেন

না। তাঁহারা বিশেষরূপে তুলাইয়া দেখিয়া তবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন। আমরা আমাদিগের উক্তির সমর্থনজন্য নিম্নে হিব্রু ও আরবিভাষার কতকগুলি শব্দ বিন্যস্ত করিব. ঐ সকল শব্দের সহিত সংস্কৃত শব্দের কোন সাগঙ্ক্ষা প্রকৃতই আছে কি না. তাহা প্রবীণেরা স্থির করিবেন।

| সংস্কৃত | হিব্রু। |
|---|---|
| অম্বা | আম্মঃ |
| বপ্তা ( বাবা ) | আব্বা |
| বাল ( বালক ) | বার ( পাল এসেরীয়ান |
| হরি ( সিংহ | অরি |
| ছদ্র | ছেদার |
| মেষ | মেহ |
| এনঃ ( পাপ ) | এয়েন |
| ওজঃ ( বল ) | ওজ |
| অজ ( ছাগ ) | এজ |
| গর্ব্ব | গবর্ |
| অব্ধি | অব্দ |
| নহুষ | নোওয়া |
| মিশ্র | মিস্রাইল |
| ক্রমেল | গেমেল |

| সংস্কৃত | আরবি |
|---|---|
| অম্বা | আম্মা, উম্ |
| বপ্তা | আবু |
| অল্লা ( মাতা ) | আল্লা |
| তাত | জাদ ( পিতামহ ) |
| দুহিতা | ওখ্ত |
| দীনার | দীনার ( Dollar ) |
| ষট্ | সট্ |
| হস্ত | ইয়াদ |
| পরাক | ফারাক ( Far ) |
| গল্দা | আরজ |
| বলি | অলি |
| নহুষ | নু |
| মা ( বৈদিক-জল ) | মা |
| সপ্ত | সবাঅ ( সপত ) |
| আহ্বান | আজান |
| অবনেজন | অজু |
| ক্রমেল | গিমেল, জিমেল |
| বালি | ওয়ালি |

অম্বা শব্দের অর্থ মাতা। সভ্যতার আদি যুগে আমরা গোবৎসের নিকট হইতে ইহা প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। তাই জগতের বহু জাতির মধ্যেই উহার সত্তা অনুভূত হইয়া থাকে; বঙ্গদেশ, লঙ্কা, সিংহল, এসেরিয়া, ফিনিশীয়া ও কালডিয়া, সর্ব্বত্রই উক্ত অম্বা শব্দ বিকৃত হইয়া আম্মা বা উম্ মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। ঐরূপ আমরা সভ্যতার অরুণোদয়কালেই উদ্বর্ণ ছাগ ও মেষশাবকগণের নিকট হইতে মধুমাখা "মা" কথাটি মাগিয়া লই। অম্বা আমাদের সাহিত্য অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু মা কথাটি আমরা নিত্য ব্যবহার করিয়া. আত্মায় আরাম আনি এবং উহাই সাগরপারে যাইয়া মাম্মা ও চীনদেশে যাইয়া "মো"তে পরিণত হইয়াছে। এবং এই মা ই গৃহের দ্রব্যাদির পরিমাণ করিয়া রাখিতেন বলিয়া মাতৃনামে সংজ্ঞিত হয়েন। উহা মা ধাতুর উত্তর ঔণাদিক তৃচ্ প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন। বলা বাহুল্য, মা ধাতু তৃণ্ প্রত্যয়নিষ্পন্ন যে পরিমাপকার্থ মাতৃ শব্দ আছে.যাহা মাতা, মাতারৌ ও মাতারঃ রূপ ধারণ করে. তাহা পুংলিঙ্গ বা বাচ্যলিঙ্গ এবং উহা স্বতন্ত্র পদার্থ। এই স্ত্রীলিঙ্গ মাতৃশব্দ প্রথমার বহুবচনে মাতরঃ হইয়া থাকে.

গ্রীক, লাটিন ও ইংরাজি প্রভৃতি ভাষায় Meter, Mater ও Mother প্রভৃতি উহারই বিসর্গহীন বিপরিণতিমাত্র। অম্বা, অক্কা ও অম্বা অর্থ মাতা। সেই অম্বা যাইয়া জগন্মাতা আল্লায় পরিণত হইয়াছে।

বপ্তার অর্থ বপনকর্ত্তা—যিনি ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতেন। উঁহারই অপভ্রংশে আমাদিগের দেশে বাপ, বাপা, বাপু ও বাবা প্রভৃতি হইয়াছে, এবং আরবি ও হিব্রু প্রভৃতির আবু ও আব্বাও উক্ত বাবা-প্রভৃতির অধস্তন সন্তান। বিলাতে যাইয়া এই বাপাই পাপা বা পাপ্পার জন্মদান করিয়াছে। আমরা সাহিত্যে যে পিতৃশব্দের ব্যবহার করিয়া থাকি, উহার অর্থ রক্ষাকর্ত্তা, পা ধাতু ঔণাদিক তৃচ্ ণ, এবং ইহারই বহুবচনান্ত 'পিতরঃ' পদ বিসর্গলোপে পাশ্চাত্য জগতের Pater ও Father প্রভৃতি শব্দের দেহ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছে এবং উক্ত পিতরঃই যাইয়া যাবনিক ভাষায় "পিসরে" কথার জন্মদান করিয়াছে। পিতৃবোধক আর একটি শব্দের নাম "তাত"। ভাষার বিকারে ইহা তাদ, দাদ ও দাদা হইয়া গিয়াছে। তাই হিন্দুস্থানীরা অনেকে মাকে দীদী ও বাপকে দাদা বলিয়া থাকেন। আর অনভিজ্ঞ আমরা হাসিয়া আটখানা হই ও উহাদিগকে মেড়ুয়াবাদী বলিয়া উপহাস করি। কিন্তু আমরা যে পিতামহ ও মাতামহকে "ঠাকুর দাদা" বলিয়া থাকি, উহার অর্থ যে ঠাকুর বা পিতার দাদা (তাত) বা বাপ তাহা তলাইয়া দেখি না। বড় ভাই তাতসদৃশ বা পিতৃতুল্য এবং বড় ভগিনী মাতৃতুল্যা। তাই বঙ্গদেশে আমরা বড় ভাইকে দাদা ও বড় ভগিনীকে (তাতী) দিদী বলিয়া ডাকিয়া থাকি। খুল্লতাত বা খুড়াও আমাদের তাত বটেন, তাই যাবনিক ভাষার খুড়ার নাম চাচা। বলা বাহুল্য ভাষার বিকারে দুইটি তই চ হইয়া যাইয়া উহার মূর্ত্তি খাড়া করিয়া দিয়াছে। এবং উক্ত তাত শব্দই প্রথমে চাচা হইয়া জাপানে যাইয়া চিচি (পিতা) তে পরিণত হইয়াছে। জাপানে বাপকে যে টটেও বলিয়া থাকে, উহাও আমাদের তাতেরই বিপরিণতিবিশেষ। আর আমরা ঠাকুরদাদাকে দাদাও বলিয়া থাকি। এই দাদাও তাত ভিন্ন আর কিছুই নহে, আর আরববাসীরা সেই ঠাকুরদাদা ও পিতামহকে বলিয়া থাকেন 'জাদ'। বলা বাহুল্য তাত শব্দ ক্রমে তাদ ও দাদ হইয়া শেষে জাদ হইয়া গিয়াছে। ভাষার বিকারে দ, জ ও হইয়া থাকে। যেমন বৈদ্যনাথ—বৈজনাথ, গদাধর—গজাধর, দ্যুপিতরঃ—Dupiter প্রভৃতি। আমাদের দেশে খুড়াকে কাকা ও খুড়ীকে কাকী বলার রীতি প্রচলিত আছে। যেমন ধাঁটা কথাটার নিদান কোন সংস্কৃত কথা, তাহা অদ্যাপি জানা যায় নাই, তদ্রূপ কাকা কাকীর নিদানও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। পক্ষান্তরে মাড়ওয়ার প্রদেশের অনেকে বাপকে কাকা ও মাকে কাকী বলিয়া থাকেন। আর সুদূর চীনদেশে বাপকে বলে "হো" ও জাপানে মাকে বলিয়া থাকে "হাহা"। ভাষার বিকারে ক ও খ, হ হইয়া থাকে, যেমন টাকা—টাহা, মুখে—মুহে প্রভৃতি। তাই জাপানীরা আমাদের মাতৃবাচক কাকী হইতে হাহী বা হাহা ও চীনেরা পিতৃবাচক কাকা হইতে কাহা, হাহা, হাআ ও শেষে হো গড়াইয়া লইয়াছেন।

ভাষার বিকারে প—ব ও ব প হইয়া থাকে, এবং "বলয়োরভেদঃ"। সুতরাং

সংস্কৃত বাল, হিব্রু বার ও এসেরিয়ান পাল একই বস্তু। ভাষার বিকারে হ—অ হইয়া থাকে, তাই পূর্ব্বাঙ্গে বলিয়া থাকে হরিকে অরি, আর হিব্রুগণও বলিতেছেন অরি। পূর্ব্ববঙ্গে হাতকে বলিয়া থাকে "আত", আর আরবে ঐ হাত যাইয়া 'ইয়াদ' মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বিকারকালে ভাষার সম্প্রসারণ হইয়া থাকে। তাই পূর্ব্ববঙ্গের লোকেরা ছুরিকে বলিয়া থাকেন ছুওরি, আর হিব্রুরা বলিতেছেন ছেদার। ভাষার বিকারে শ, ষ ও স, হ হইয়া থাকে। তাই পূর্ব্ববঙ্গে শ্যাল (শালা) শূকর, শৃগাল ও সবন্ধীকে বলে হালা, হুয়ার, হিয়াল ও হমন্দী, আর জেন্দারা বলেন দশকে দহ, মাসকে মাহ ও সপ্তাহকে হপ্তা, আর হিব্রু বলিতেছেন আমাদের মেষকে মেহ। ভাষার বিকারে বর্ণের লোপ হয় ও ক-গ এবং গ-জ হইয়া থাকে। তাই সংস্কৃত ক্রমেল (উষ্ট্র) যাইয়া হিব্রুতে গেমেল ও আরবীতে গিমেল বা জিমেল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ভাষার বিকারে প—ব ও ত—অও হইয়া থাকে, তাই আমাদের সপ্ত যাইয়া আরবীতে সবাঅ হইয়াছে। ভাষার বিকারে প, ব, ভ—ফ হইয়া থাকে, তাই পরাক যাইয়া ফারাক ও আরও একটু ফারে (দূরে) যাইয়া Far এ পরিণত হইয়াছে। সংস্কৃতে গল্দা ও বেক্রা অর্থ ভাষা বা বাণী। ভাষার বিকারে গ—অ, ল—র ও দ—জ হওয়াতে উক্ত গল্দা যাইয়া আরবে অরজা হইয়া শেষে আরজে পরিণত হইয়াছে। ভাষার বিকারে হ—জ হইয়া থাকে। যেমন বাহু—বাজু, আহ্বান—আজান। অবনেজন অর্থ হস্তপদপ্রক্ষালন, উহাই আরবে যাইয়া অজু মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ভাষার বিকারে ব—অ, উ এবং ও হইয়া থাকে তাই আমাদের বলি ও বালি যাইয়া আরবের অলি মহম্মদ ও ওয়ালি মহম্মদের জাতকিয়া সম্পাদন করিয়াছে।

মানুষ হাঁড়ীর একটা ভাত টিপিয়া দেখে, ভাত ফুটিয়াছে কিনা, আমরাও সামান্য কয়েকটি উদাহরণদ্বারা সংস্কৃতের সহিত হিব্রু ও আরবীর সম্বন্ধ প্রদর্শন করিলাম। যদি তোমরা বাঙ্গলা ও পূর্ব্ববাঙ্গালার ভাষাকে সংস্কৃতের বিকারপ্রভব বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলে হিব্রু ও আরবিভাষাকেও সংস্কৃতের সহিত জন্যজনকত্ব ভাবসম্পন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য আরবগত হিন্দু ক্ষত্রিয় যবনেরা জাতক্রোধ হইয়া একটি নূতন ভাষা ও নূতন অক্ষরের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু তথাপি উক্ত ভাষা অদ্যাপি পৈতৃক সংস্কৃত ভাষার সহিত একবারে নিঃসম্পর্ক হইতে পারে নাই। অতঃপর আমরা জেন্দাভাষার কথা বলিব। হালহেড জেন্দার কথা বলেন নাই, পারস্যভাষাকে সংস্কৃতের সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু পারস্যের প্রাচীন আসুরিক ভাষার নামই জেন্দা ও বর্ত্তমান ভাষার নামই পারসিক। যদি সংস্কৃত ভাষাকে দুগ্ধ বলা যায়, তাহা হইলে জেন্দাকে দধি ও পারসীকে ঘোল বলা যাইতে পারে। আমরা প্রতীপগামিগণের মনঃকণ্ডূয়ননিবৃত্তির জন্য নিম্নে কতকগুলি জেন্দশব্দের অবতারণা করিব।

| সংস্কৃত | জেন্দ |
|---|---|
| সোম (রস) | হওমা |
| সরস্বতী | হরহ্বতী |
| সরযূ | হরজু |

| | |
|---|---|
| দশ | দহ |
| সপ্তন্ | হপ্তন্ |
| সপ্তসিন্ধু | হপ্ত হিন্দু |
| মাস | মাহ |
| ভার | বার |
| ভ্রাতরঃ | ব্রাতর |
| পিতরঃ | পেইতর |
| দুহিতরঃ | দুঘ্‌ঘর |
| উভ | উব |
| জানু | ঝেনু |
| বৃক | বেহেরকো |
| ঘর্ম্ম | গরম |
| চক্র | চরখ |
| গোধূম | গোন্দূম |
| ক্ষুদ্র | খুর্দ |
| ভরণ | বরনস |
| ভরন্তং | বরেন্তেম |
| স্তারঃ ( নক্ষত্রাণি ) | স্তেয়ার |
| পতিস (ঃ) | পয়তিস্ |
| ব্রাহ্মণ | বর্ম্মন |
| ক্ষত্রিয় | চত্রী |
| বৈশ্য | বাশ |
| শূদ্র | শুদ, শুদিন্ |
| অপ্ | আব্ |
| শ্বেত | শফেদ |
| মৃত্যু | মেরেথু |
| বৃত্রঘ্ন | বেরেথ্রঘন |
| নেম ( অর্দ্ধ ) | নিম |
| শৃগাল | শেঘাল |
| যম | যিম |
| নঃ ( অস্মান্ ) | নৌ |
| যুবানঃ | জোয়ান |

| | |
|---|---|
| গৌঃ | গাও |
| তৃষ্ণা | তিষন্ |
| ত্রৈতন | থ্রেতন |
| কৃশাশ্ব | কেরেশাস্প |
| কাব্য উশনা | কবউশ |
| বিবস্বৎ | বিবনুঘৎ |
| বয়ম্ | বয়েম |
| ত্বম | তম |
| অহং | অজেম |
| অহি | অজি |
| বাহু | বাজু |
| বহামি | বজামি |
| জিহ্বা | হিজ্জা |
| হরিদ্রা | জর্দা |

উদাহৃত শব্দকদম্বক সম্বন্ধে কোন সমালোচনা করা অনাবশ্যক। পাঠ ও শ্রুতিমাত্রই সামাজিকগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, ইহার মধ্যে কে প্রকৃতি ও কে বিকৃতি কিন্তু এ হেন জন্য-জনকত্বভাব বিরাজমান দৃষ্টেও পাশ্চাত্য মনীষী মাননীয় মুইর সাহেব তাঁহার Sanskrit Text Book নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের একত্র বলিতেছেন যে, যদিও বলিবার বহু কথা আছে, তথাপি জেন্দ ভাষা যে সংস্কৃতের কন্যাস্থানীয় তাহা বলা যায় না, তবে ভগিনীভাবাপন্ন বটে

"It is true that more may be said in favour of the hypothesis that the Zend has been derived from Sanskrit, but there are sufficient reasons for believing that Zend is a sister and not a daughter of Sanskrit, and consequently, that

both have a common mother of a more primeval date. Page 275.

কিন্তু আমরা মুইর মহোদয়েরই গ্রন্থ হইতে জেন্দভাষার যে সকল শব্দাবলী সমাহৃত করিয়াছি, তৎসমুদায়ের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে কি সংস্কৃত ভাষাকেই জেন্দার মাতা বলিয়া স্বীকার করা সঙ্গত হইবে না? কেন মুইর মহোদয়ের প্রসন্নমনেও আমাদের মনোভাবের ন্যায় একটা ভাবের ছায়া নিপতিত হইল? তিনিও কি যোল আনা ভাবেই জেন্দাকে সংস্কৃতের কন্যা বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হয়েন নাই? যে প্রচুর কারণের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি শেষে উদ্বৃদ্ধ মতের প্রতিসংহার করিলেন, সেই কারণসমূহের মধ্যে একটি কারণেরও নির্দ্দেশ করিয়া কেন স্বমতের সমর্থন করিলেন না? কিন্তু পাঠক! মেল্টে ব্রুন (Malte Brun) তাঁহার ইউনিভার্সেল জিওগ্রাফীর চতুর্থ খণ্ডের ১৯৭ পৃষ্ঠাতে বলিতেছেন যে, "The analysis of the Greek language and its comparison with the Sanskrit, of which we have seen that the Zend and the Parsi are derivatives. অর্থাৎ কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিত এ পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত নহেন যে, জেন্দা ও পারসী ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে সমুৎপন্ন। কিন্তু গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষাও যে হেয় ভারতবর্ষের ভাষা সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন, ইহা মনে করিতে তাঁহাদের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানে দারুণ আঘাত লাগে। ফলতঃ

I think so, He thought so,
Perhaps it may be so.

এই তিনটি আপ্তবাক্য ভিন্ন পাশ্চাত্য মনীষিগণের স্ফটিকস্তম্ভে আর কোনই ব্রহ্মাস্ত্র সংগোপিত নাই। তাঁহারা উহারই সহায়তায় অর্ব্বাচীন গ্রীক ও লাটিন প্রভৃতি অপভ্রষ্ট ভাষা সমূহকে সংস্কৃতের ভগিনী ভাষা প্রতিপন্ন ও সংস্কৃতের মাতৃত্ব বিধ্বস্ত করিতে প্রয়াসবান। মুইর অম্লান বদনেই বলিতেছেন যে—

"But the few instances which can be adduced, are quite insufficient to prove that even in these cases the Greek or the Latin words are borrowed from the Sanskrit. They may with quite equal probability have been derived from an earlier language from which the Sanskrit is also drawn. There is no appearance of Greek and Latin words having resulted from any modification of the Sanskrit: for, while many of their forms have a close resemblance to the Sanskrit forms, they are at the same time, for the most part, equally original with those of that language; and many of them are so different from the Sanskrit, and so peculiar, that they could not be deduced from it according to any laws of mutation recognized by philologists. The Greek and Latin forms can, therefore, only be derived from another and anterior source, from

which the Sanskrit forms also, as well as they, have flowed."

Page 271.

কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি, পাশ্চাত্য মনীষিগণের মনেও কেন সংস্কৃত ভাষাকেই উত্তমর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে? বস্তুতঃ কি মাত্র সংস্কৃত ভাষা উত্তমর্ণ ও কথ্য গ্রীক্ ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা অধমর্ণ নহে? কেবল কি কয়েকটা বিষয়ে কিঞ্চিৎ সামান্য সামান্য সমতা আছে বলিয়াই পাশ্চাত্যগণের মনে উক্ত ধারণার সঞ্চার হইয়া থাকে? গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষার বহু সামগ্রীসম্ভারই কি সংস্কৃত ভাষা হইতে সমাগত নহে? সংস্কৃতের সভ্যো-বিকারেই কি উক্ত উভয় ভাষারও বহু শব্দেরই দেহ প্রতিষ্ঠা হয় নাই? মুইর তাঁহার গ্রন্থের বহুত্র যে সকল উদাহরণের সমাহার করিয়াছেন, সেই উদাহৃত পদকদম্বকই কি আমাদিগের উক্তির সমর্থন ও তাঁহাদিগের মতের খণ্ডন করিয়া থাকে না? গ্রীক, ল্যাটিন, জেন্দা ও সংস্কৃত ভাষার আবার একটা মা আছে, ইহা কি কেবল কথার কথাই নহে? কেন পাশ্চাত্যগণ সেই মাতৃ ভাষার একখানি গ্রন্থ, অন্য কোন ভাষার কোন গ্রন্থে উদ্ধৃত সেই আকাশকুসুম মাতৃভাষার একটি বাক্য অথবা একটি মাত্র শব্দ বা পদের প্রদর্শন দ্বারা উহার অস্তিত্বের প্রমাণ করিলেন না? কেন তাঁহারা সেই আদি মাতৃভাষার নাম ও বাড়ীর খবর জানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসুগণের হৃদয়ের কণ্ডুয়নের নিরসন করিয়া দিলেন না? ফলতঃ মুইর তাঁহার স্বদেশের যে সকল ভাষাতত্ত্ববিদ্গণকে Distinguished ভাষাতত্ত্ববিদ্ বলিয়া মনে করিয়াছেন, যাঁহাদিগের ভাষাতত্ত্ববিষয়িণী সূত্রাবলী তাঁহার নিকট অনবদ্য বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের সেই সকল ক্ষুদ্রসূত্রের জন্যই তাঁহারা উদাহৃত ভাষাসমূহের মধ্যে কি প্রকৃত সম্বন্ধ বর্ত্তমান তাহা নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অবশ্য ঐ সকল ভাষায় এরূপ কতকগুলি শব্দ আছে, যাহার সহিত সংস্কৃতের কোন সাম্যই বিদ্যমান নাই। কিন্তু তাহার কারণও যথেষ্ট বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রথম কারণ, ঔপনিবেশকগণের ভাষার সহিত উপনিবেশভূমির আদিম বা পূর্ব্বাধিবাসিগণের ভাষার সম্মিশ্রণ। দ্বিতীয় কারণ নানাকারণে ঔপনিবেশিকগণের ভাষায় নূতন নূতন শব্দের উদ্ভাবন ও সমাগম। তৃতীয় কারণ, যোজনান্তরে ভাষার বিকার বাহুল্য। জগতের প্রত্যেক ভাষাতেই বহু শব্দ নানা বিকারের ভিতর দিয়া যাইয়া এরূপ এক অভিনব অবস্থায় উপনীত হইয়াছে যে, শেষে সেটা যে কোন্ গাই এর বাছুর তাহা আর সাধারণ দৃষ্টিতে নির্ণয় করিতে না পারাতে উহা একটা স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বস্তু বলিয়া অনুমিত হইয়া গিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা এখানে একটি সংস্কৃত, একটি গ্রীক ও একটি ল্যাটিন শব্দের অবতারণা করিব। যেমন পুরোডাশ, Hydor ও Elysium। এই পুরোডাশ শব্দ বৈদিক যুগের অরুণোদয়কাল হইতে এখনও আমাদিগের নয়নে ও কর্ণে একটা বিভীষিকা জন্মাইয়া থাকে যে, বস্তুতঃ এটা কোন্ জীব। কিন্তু গবেষণাদ্বারা জানা গিয়াছে যে, আমাদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য পরোটা, পুরি, রোটী,

রুটী ও নিমন্ত্রণবাটীর দন্তদংষ্ট্রাসন্দংশ অচ্ছেদ্য লুচী, উক্ত পুরোডাশেরই সন্তানসন্ততি। ঐরূপে আমাদেরই ক্রোড়ে লালিতপালিত বর্দ্ধিত পাথস্ শব্দ পাথারে ভাসিতে ভাসিতে যাইয়া শেষে গ্রীসদেশে Hydor মূর্ত্তি ধারণ করিয়া একটি কেহ-কেটা হইয়া বসিয়াছেন, যেন ইনি মথুরারই বনেদী রাজা, কোন দিন বজের রাখাল ছিলেন না। ঐরূপ বিকারের ভূরি আবর্ত্তের ভিতর দিয়া নাকানি চুবানি খাইয়া শেষে আমাদেরই ইলাবৃতবর্ষম্, ইরিযূপীয়ায় যাইয়া একত্র Elysium ও অন্যত্র Elysian মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছেন। এইরূপ অনেক ভুলো ভোলানাথ ও অনেক Caterpillar স্বরূপ প্রজাপতিতে পরিণত হওয়াতে Dabbler আমরা পদার্থনির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া আসম্যের ভেরী বাজাইয়া আসিতেছি। পণ্ডিতাগ্রণী মেগাস্থিনিস বহুকাল মগধের অন্নধ্বংস ও বায়ুসেবন করিয়াও শেষে তাঁহার অন্নদাতা চন্দ্রগুপ্তকে সণ্ড্রাকোটাশে পরিণত করিয়াছিলেন। ইহার পরও তোমরা পাশ্চাত্যজাতির নিকট ভাষাতত্ত্বের ঐতিহ্যের কি প্রত্যাশা করিতে পার? ফলতঃ যে দেশের লোকেরা পৈতৃক ত্রিষষ্ঠি বা চতুঃষষ্টিটা বর্ণের মধ্যে কেবল ছাব্বিশটা লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, জিহ্বার জড়তা বশতঃ আজিও যাঁহারা ত উচ্চারণ করিয়া স্বর্ণপদক লইতে পারিলেন না, সেই বিকারের রাজ্যের লোকদিগের নিকট তোমরা ভাষার কোন কথা শুনিতে যাইও না। ফলতঃ বিকারের বহু অশনিসম্পাতের ভিতর দিয়া ভাষা যাইয়া এক এক দেশে এক এক নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে মাত্র, বস্তুতঃ তৎসমুদয়ের নিদান একই সেই জগদম্বা গীর্ব্বাণবাণী সংস্কৃত ভাষা। ভাষাগত বৈষম্যের চতুর্থ কারণ, প্রাদেশিকতা। কেহ আমাদিগের পিতরঃ লইয়া গিয়া গড়িয়া লইলেন Pater or Father; কেহ 'বপ্তা' লইয়া গিয়া বানাইলেন আব্বা বা আবু ও পাপা বা পাপ্পা, আবার আমাদিগেরই 'তাত' যাইয়া একত্র হইলেন দাদ ও অন্যত্র হইলেন চিচি, এবং আমাদিগেরই কাকা ও কাকী যাইয়া একত্র হো ও অন্যত্র হাহা রূপ ধারণ করিয়া বৈষম্যের জগতে হাহাকার তুলিয়া দিলেন। কলিকাতার লোকে ঝাঁটাকে বলিয়া থাকেন—খেঙ্রা, বরিশালে পিছা ও মৈমনসিংহে আবার তিনি সাচইন মূর্ত্তিতে বিরাজমানা। Dabbler বলিলেন, বটেই ত এই তিনটা শব্দের একটাও ত সংস্কৃতমূলক নহে, ইহারা ভারতের অনার্য্যজাতিদিগের নিকট হইতে টেঁকী, কুলা ধুচুনীর ন্যায় ধার করা। কিন্তু তুমি যদি তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে সংস্কৃত জীবন্ত খিঙ্খরী, পিচ্ছ ও সম্মার্জ্জনী শব্দ বিকৃত হইয়া এই প্রাদেশিক ভাষাগত বিভিন্নতার সৃষ্টি করিয়াছে। মাইকেল লিখিয়াছেন—

খেদাইল তারে সিন্ধুতীরে

অমনি কলিকাতা হাসিয়া বলিল, দেখ বাঙ্গাল্ কি লিখে ফেল্লে। কিন্তু তুমি দেখ আমার মা জগদম্বা গীর্ব্বাণবাণীর ভাণ্ডারে তাড়াইয়া দেওয়া অর্থের দ্যোতক যেমন "তাড়িত" শব্দ রহিয়াছে, তেমনই "খেদিত" শব্দও বিষ্ণুশর্ম্মার পঞ্চতন্ত্রে সশরীরে বিরাজমান। সমগ্র ইউরোপে জল বুঝিতে Water, Wasser ও Hydor প্রভৃতি শব্দ প্রচলিত, কিন্তু অষ্ট্রীয়া উহার একটি কথাও বুঝিবে না।

তথায় "অপা" ও "নীরো" শব্দ জলার্থবাচী। বলা বাহুল্য উক্ত Water, Wasser, Hydor এবং এই অপা ও নীরোর আদি নিদান একমাত্র আমাদের সংস্কৃতভাষা। বৈদিক কোষে ভাষা বা বাণী অর্থের দ্যোতক সাতান্নটি শব্দ। তন্মধ্যে গল্দা ও বেকুরা শব্দও বিদ্যমান। আমাদিগের কোন লৌকিক সাহিত্যেই উহাদের প্রচলন দেখা যায় না, টীকাকার দেবরাজযজ্বাও বহু অন্বেষণ করিয়া বৈদিক সাহিত্য হইতে উহাদের নিগম বা শিষ্টপ্রয়োগ বাহির করিয়া দিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, "নিগমঃ অন্বেষণীয়ঃ", কিন্তু এই গল্দাই বহু গলদ্‌ঘর্মের ভিতর দিয়া আরবের মরুভূমিতে যাইয়া "আরজে" পরিণত হইয়াছে। ঐরূপ বেকুরাও ভাসিতে ভাসিতে কোথায় যাইয়া চড়ায় ঠেকিয়া এউলা কি বেউলাতে পরিণত হইয়া গোত্রান্তর হইয়া গিয়াছে। ভাষাগত বৈষম্যসংঘটনের পঞ্চম কারণ, পাশ্চাত্য Distinguished ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের Law বা সূত্রপ্রণয়নগত ত্রুটিভূয়িষ্ঠতা। যে দেশের অকলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র বেদাচার্য্য ভট্টমোক্ষমূলর বলিয়াছেন যে, সংস্কৃত নিরপরাধ "উর্ব্বশী" শব্দ হইতে ইউরোপ শব্দ ব্যুৎপাদিত, পরন্তু ঋগ্বেদের হরিযূপীয়া শব্দ হইতে নহে তোমরা তাঁহাদিগের নিকট ভাষাতত্ত্বের বিষয়ে কোন মীমাংসা প্রার্থনা করিতে এখনও পার না। যাহা হউক, আমরা মুইর মহোদয়ের সমাহৃত শব্দসমূহ হইতেই দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, গ্রীক ও লাটিন প্রভৃতি সমগ্র পাশ্চাত্য ভাষাই সংস্কৃত ভাষার একমাত্র বিকারপ্রভব।

| সংস্কৃত | গ্রীক |
|---|---|
| পবন | Pan |
| দেবর | Daer |
| যব | Zea |
| অবিস্ ( মেষ ) | Ois |
| দেবস | Theos |
| বরুণস্ | Aurenos |
| দ্রু | Dru ( Tree ) |
| দ্রুমস্ | Drumos |
| ধূমস্ | Thumos |
| ঘর্ম ( গ্রীষ্ম ) | Thermos |
| পত্নী | Patnia |
| প্রস্তরস্ | Petros |
| দ্যৌ পিতরঃ | Zeas pater |
| মনস | Menos |
| অজস | Aix |
| মধু | Methu |
| জ্ঞাতস | Gnotos |
| দীর্ঘস্ | Dolikhos |
| গিরস | Gerus |
| ফল্লম্ | Phullon |
| দুস্ | Dus |
| দারু | Doru |
| তোকস | Tekos |
| পুরী | Polis |
| কোণ | Gonia |
| গৌঃ | Goia |
| ক্রতুস্ | Kratos |
| অর্জন | Ergon |
| যুক্তস্ | Zeuktos |
| ভ্রূস্ | Ophrus |
| ভারস | Phoros |
| বীরস্ | Heros |
| স্বপনস | Hupnos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| সমস্ | Homos | যুবানস্ | Juvenus |
| সকলস্ | Holos | দ্যুপিতরঃ | Jupiter |
| সপ্ত | Hepto | অগ্নিস | Ignis |
| স্বাদু | Hedu | দানম্ | Donum |
| সামি ( অংশ ) | Heme | ভার্গবীণস | Valcanus |
| পোতস্ | Polos | সূর্য্য | Sol |
| ক্রমেলস্ | Kamelos | নামন | Nomen |
| পাথস | Hydor | সামি | Semi |
| ভ্রাতরঃ | Phratria | ক্রমেলস্ | Camelus |
| পিতরঃ | Pater | বনম্ ( জল ) | Vinum |
| মাতরঃ | Meter | মঞ্চ | Mensa |
| সূর্য্যাস | Helios | রাজ্ঞী | Regina |
| দান | Doron | বিধবা | Vidua |
| গর্ত্ত | Crypto | বীর | Vir |
| অহম্ | Ego | ভবতি | Habet |
| প্রতি | Prote | ভবন্তি | Habent |
| অন্যদা | Allote | ভবামি | Habeo |
| অস্মি | Esmi | ভবামঃ | Habemus |
| স্তৃণোমি | Stronnumi | ক্রীডতি | Currit |
| তদা | Tote | ক্রীডন্তি | Current |
| কদা | Hote | অসি | Es |
| ভূ | Phuo | সন্তু | Sunto |
| দদামি | Didomi | অস্তি | Est |
| দাতারঃ | Doter | অহম্ | Ego |
| সংস্কৃত | লাটিন | দেব | Dea |
| পবনস্ | Favonus | মহান্তঃ | Magister |
| বালস্ | Filius | মহত্তম | Magnum |
| বালিকা | Filia | রাজত্বং | Regnum |
| ভামিনী | Femina Femella | দক্ষ | Dux |
| পোতস | Pullus | সমিতি | Senutos |
| পোতী | Puella | হংসাঃ | Anser |
| পুত্র | Puer | কুল | Folos |

| | | | |
|---|---|---|---|
| রাজা | Reo | ভঙ্গ | Frango |
| শত্রুস্ | Hostis | গর্ত্ত | Crypta |
| নভস্ | Nubes | | |
| জানু | Genu | | |
| চিহ্নম্ | Signum | | |
| দিবস | Deas | | |
| দ্যৌস্ | Deus | | |
| ভূ | Fui | | |

আমরা গ্রীক ও লাটিন ভাষার অতি সামান্য কয়েকটি শব্দ লইয়া সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। আশা করি এই সকল শব্দের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন ইহার মধ্যে কে দুগ্ধ ও কে দধি।

আগামীতে সমাপ্য।

# মেধসাশ্রম।

## ১। মার্কণ্ডেয়চণ্ডী ও শাক্তধর্ম্ম।

মেধসাশ্রম হিন্দুর, বিশেষতঃ শাক্ত সম্প্রদায়ের, মহাতীর্থ। সেই মহাতীর্থের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কেন এ আশ্রমকে আমাদের মহাতীর্থ বলা যাইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। কিরূপে সেই আশ্রমের আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, সে কথা বলিব। কিন্তু তাহার আগে, শাক্তধর্ম্ম বা শক্তিবাদ আমাদের সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে।

এই শক্তিবাদ মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতেই প্রথম প্রচারিত হয়। চণ্ডীতেই প্রথম মহামায়ার তত্ত্ব এবং তাঁহার পূজা প্রকটিত হইয়াছে। এই জন্য চণ্ডী হিন্দুর, বিশেষতঃ শাক্তের, প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ। হিন্দুর প্রায় সকল ধর্ম্মকর্ম্মেই চণ্ডীপাঠ বিহিত। চণ্ডী পাঠের অশেষ ফল চণ্ডীতেই এবং অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থে বিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। এখন বেদের পরিবর্ত্তে শাক্তগণ চণ্ডীপাঠই করিয়া থাকেন। যজ্ঞের পরিবর্ত্তে এখন তন্ত্রোক্ত দেবদেবী পূজা প্রচলিত। তাহাতে বেদমন্ত্র উচ্চারণের পরিবর্ত্তে এখন চণ্ডীই মন্ত্ররূপে পঠিত হইয়া থাকে।

চণ্ডী যে কেবল পূজাপার্ব্বণে স্বস্ত্যয়নে সংকল্পপূর্ব্বক পঠিত হইয়া থাকে, তাহা নহে। এমন অনেক হিন্দু আছেন, যাঁহারা প্রত্যহ চণ্ডী পাঠ করিয়া থাকেন। বোধ হয় জগতে

আর কোন গ্রন্থ নাই যাহা সমগ্র এতবার পঠিত হইয়াছে। ইহা হইতে ধর্ম্মজগতে চণ্ডীর স্থান কত উচ্চে তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি। চণ্ডীতে যে নূতন দার্শনিক তত্ত্ব, যে আশ্চর্য্য ধর্ম্মমত, স্থাপিত হইয়াছে, তাহাই চণ্ডী গ্রন্থের এত আদর—এরূপ পূজা—এত সম্মানের কারণ। আমরা এই তত্ত্ব অতি সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

চণ্ডীর প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই অতি প্রবলপরাক্রান্ত চৈত্রবংশীয় সুরথ রাজা শত্রু কর্ত্তৃক পরাজিত ও হৃতরাজ্য হইয়া রাজধানী কোলা নগরী পরিত্যাগ করিয়া ঋষিশ্রেষ্ঠ মেধসের আশ্রমে পলায়ন করিলেন। পুত্রদারাদি কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব ও বিতাড়িত হইয়া সমাধি নামক এক বৈশ্যও সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। উভয়েই নিজজ্ঞানে বুঝিলেন যে এ অবস্থায় তাঁহাদের রাজ্য ধনাদির প্রতি মমতা অকর্ত্তব্য। তাঁহারা বিশেষ চেষ্টা করিয়াও সে মায়া দূর করিতে পারিলেন না। তখন তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া উভয়েই মুনিশ্রেষ্ঠ মেধসের নিকট গমন করিয়া এ মমতার কারণ জিজ্ঞাসু হইলেন। মেধস ঋষি বুঝাইলেন—

"জ্ঞানমস্তি মনুষ্যাণাং
জন্তোর্বিষয়গোচরে।
তথাপি মমতাগর্ত্তে
মোহগর্ত্তে নিপতিতাঃ।
মহামায়া প্রভাবতঃ
সংসারস্থিতি কারণঃ॥

অর্থাৎ মানুষ ও পশু উভয়ের চিত্তবৃত্তি ও বিষয়জ্ঞান সমান, আর সেই জ্ঞান মোহাবদ্ধ। সংসারস্থিতিকারিণী মহামায়াই জীবকে এইরূপ মোহগর্ত্তে ও মমতাগর্ত্তে নিপতিত করেন, জীবকে কলের পুত্তলের মত চালিত করেন। সেই মহামায়া কে?

মেধস ঋষি কহিলেন,—

জগতের পতি হরি
তাঁর যোগনিদ্রা— এই মহামায়া
রাখে বিশ্ব মুগ্ধ করি।
তিনিই নিশ্চয় দেবী ভগবতী,
তিনি মহামায়া হন্।
জ্ঞানীদের চিত্ত করেন মোহিত
বলে করি আকর্ষণ।
যাঁ হতে প্রসব এ বিশ্ব জগৎ
সেই মহামায়া ইনি।
প্রসন্না হইলে নরে মুক্তি দিতে
তিনি বরদারূপিণী।
তিনি পরাবিদ্যা মুক্তির কারণ
তিনি হন্ সনাতনী
তিনিই সংসারে বন্ধনের হেতু
সবার ঈশ্বরী তিনি।

সুরথ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

কেবা সেই দেবী মহামায়া যাঁরে
কহিলা দেব! আপনি।
কিবা কর্ম্ম তাঁর কহ দ্বিজবর
কিরূপে উৎপন্না তিনি?
স্বভাব স্বরূপ কিবা সে দেবীর
কি হতে উদ্ভব তাঁর?

ঋষি বলিলেন—

নিত্যা হন্ তিনি জগৎরূপিণী
তাঁহে ব্যাপ্ত এই সব;
তবু নানাভাবে আমার নিকটে
শুন তাঁর সমুদ্ভব।*

* আমার পরম প্রীতিভাজন আত্মীয় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিশ্র কৃত চণ্ডীর পদ্যানুবাদ হইতে গৃহীত।

তাহার পর মেধস ঋষি তিন উপাখ্যান অবলম্বনে সেই মহাকালী বা যোগনিদ্রারূপে আবির্ভাব, মহালক্ষ্মী বা সর্ব্বদেবতেজসমুদ্ভূত সর্ব্বদেবতা দ্বারা অলঙ্কৃত মহিষাসুরমর্দ্দিনাদেবী-রূপে আবির্ভাব, এবং মহাসরস্বতীরূপে শুম্ভ নিশুম্ভ সংহারকর্ত্রীরূপে, বিকাশের বিবরণ দ্বারা সেই মহাশক্তিতত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। সেই উপাখ্যান হইতে, বিশেষত চণ্ডীতে বিবৃত অতি অদ্ভুত তিনটি স্তোত্র হইতে, এই শক্তিবাদের স্বরূপ বুঝা যায়। সেই উপাখ্যানের গূঢ় অর্থ অতি আশ্চর্য্য। তাহা এস্থলে বর্ণনীয় নহে। সেই উপাখ্যানের ঐতিহাসিক, অধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার সামান্য আভাষমাত্র চণ্ডীমাহাত্ম্য প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি।

এই মহামায়াই আমাদের সকলের মধ্যে চেতনারূপে, বুদ্ধিরূপে, শক্তিরূপে, বৃত্তিরূপে, চিৎরূপে, ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃরূপে অবস্থিতা। তাঁহারই তমঃ বা আবরণাত্মক শক্তিতে আমাদের এই সকল বৃত্তি আবরিত মোহিত হয়, তাঁহারই বিক্ষেপাত্মক রজঃ শক্তিতে আমাদের এই সকল বৃত্তিপ্রবৃত্তি চালিত, বিষয়াভিমুখী, দুঃখজড়িত, কর্ম্মনিরত হয়। আর তাঁহারই সত্ত্ব শক্তিতে এই সকল বৃত্তি প্রকাশাত্মক বিকাশশীল সাত্ত্বিক হয়। আমাদের এই সাত্ত্বিক প্রকৃতিকে দৈবীপ্রকৃতি, আর রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতিকে আসুরী প্রকৃতি কহে। গীতায় ইহা বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। তামসিক প্রকৃতি, আমাদের পাশব প্রকৃতি; এই প্রকৃতিবশে মানুষ পশুর ন্যায় চালিত হয়। রাজসিক প্রকৃতিবলে আমরা রজঃ স্বভাব প্রাপ্ত হই—অহঙ্কারের বিশেষ বিকাশ হয়। অহন্তা ও মমতা আমাদের জ্ঞানকে আবরিত করিয়া দিয়া আমাদিকে অহংসর্ব্বস্ব করিয়া, আমাদিগকে স্বার্থচালিত করে।

আর আমাদের দৈবী বা সাত্ত্বিক প্রকৃতির বিকাশ হইলে আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে, দুঃখ নিবৃত্ত হইয়া আনন্দের স্ফূর্ত্তি হইতে থাকে, আমাদের ধর্ম্মপথে মতিগতি হয়।

আমাদের মধ্যে এই দৈবী ও আসুরী প্রকৃতির সংগ্রামই দেবাসুর সংগ্রাম। ছান্দোগ্য উপনিষদে ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই দেবাসুর সংগ্রামের কথা আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্-উক্ত "দেবাসুরা হ বৈ যত্র সংযেতিরে" এই শ্রুতির ব্যাখ্যার ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"দেবা দীপ্যন্তে দ্যোতনার্থস্য শাস্ত্রোদ্ভাষিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। অসুরাস্তদ্বিপরীতাঃ। স্বেষ্বেবাসুষু বিষ্বগ্বিষয়াসু প্রাণন ক্রিয়াসু রমণাৎ স্বাভাবিক্য স্তম আত্মিকা ইন্দ্রিয় বৃত্তয় এব। .........সংগ্রামং কৃতবন্ত—শাস্ত্রীয় প্রকাশ বৃত্ত্যাভিভবনায় প্রবৃত্তাঃ স্বাভাবিক্যস্তমোরূপা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়োঽসুরাঃ। তথা তদ্বিপরীতাঃ শাস্ত্রার্থবিষয়বিবেক জ্যোতিরাত্মনো দেবাঃ স্বাভাবিকতমোরূপা সুরাভিভবনায় প্রবৃত্তা-ইত্যন্যোন্যাভিভবোদ্ভবরূপঃ সংগ্রাম ইব সর্ব্ব-প্রাণিষু প্রতিদেহং দেবাসুরসংগ্রামোঽনাদিকাল প্রবৃত্ত ইত্যভি প্রায়ঃ।"

ভাবার্থ এই যে, দেব অর্থে দ্যোতিত বা শাস্ত্রোভাষিত ইন্দ্রিয় বৃত্তিসকল, আর অসুরগণ তাহার বিপরীত। তাহারা স্বাভাবিক তমো আত্মক বৃত্তি সকল, প্রাণন ক্রিয়াকাল স্ব স্ব বিষয়ে রমণকারী। তাহারা শাস্ত্রীয় প্রকাশ বৃত্তিকে অভিভব বা পরাজয় করিতে প্রবৃত্ত

দ্বন্দ্ব, আর শাস্ত্রার্থ বিষয় বিবেক জ্যোতি আত্মক দৈবীবৃত্তি দেবগণও এই স্বাভাবিক তমোরূপ অসুরদের অভিভব করিতে পরত। এই পরস্পর পরস্পরকে অভিভব করিবার চেষ্টাই দেবাসুর সংগ্রাম নামে, অভিহিত। এই সর্ব্বপ্রাণীতে প্রত্যেকের দেহ মধ্যে দেবাসুর সংগ্রাম অনাদিকাল হইতে প্রবর্ত্তিত।

চণ্ডীতে এই দেবাসুর সংগ্রামতত্ত্বই উপাখ্যান দ্বারা বর্ণিত ও বিস্তারিত হইয়াছে। প্রথম উপাখ্যানে জাগতিক (Cosmic) সত্ত্ব শক্তির নিয়ন্তা ভগবানের দ্বারা রজঃ ও তমঃ শক্তির উদ্দাম জড়ভূতের বিষয় অভিভব দ্বারা জীবজগতের সৃষ্টি ও বিকাশ বর্ণিত আছে, দ্বিতীয় উপাখ্যানে—মহিষাসুর যুদ্ধে কিরূপে সেই মহাশক্তির সহায়ে জীব পাশব বৃত্তিকে দমন করিয়া উন্নতির পথে সাত্ত্বিক প্রকৃতির বিকাশের পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহা উপাখ্যান ছলে বুঝান আছে আর শুম্ভ নিশুম্ভের সংগ্রামে সেই মহাবিদ্যারূপিণী দেবীর দর্শন লাভ করিয়া, তাঁহাকে লাভ করিবার চেষ্টায় দেবীর সহায়ে আত্মসংগ্রাম করিয়া একে একে মোহ, কাম ক্রোধ, প্রধূসনা মমতা অহন্তাকে নষ্ট করিয়া কিরূপে মানুষ মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহা ইঙ্গিতে বুঝান আছে।

এই দেবাসুর যুদ্ধ জগতের মহাতত্ত্ব। সকল ধর্ম্মগ্রন্থেই ইহার উল্লেখ আছে। ইহুদী, খ্রিষ্টীয় ও মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে সয়তানদের সহিত দেব দূতদের যুদ্ধ অবস্থায় অহুরমজ্‌দের সহিত আহিরমানের চিরবিরোধ এই দেবাসুর যুদ্ধেরই নামান্তর। কিন্তু এই দেবাসুর যুদ্ধ যে প্রতি দেহে নিয়ত চলিতেছে তাহা আর কোথায় ইঙ্গিত নাই। যাহা জগতের নিয়ম (Cosmic law) তাহাই যে প্রতিজীব (Microcosm) সম্বন্ধে নিয়ম, তাহা আর কোথাও স্পষ্টীকৃত হয় নাই। এই জাগতিক দেবাসুর সংগ্রামে যে দেবতাদের কোন শক্তি নাই তাহা যে ব্রহ্মের ব্রহ্মের মহাশক্তি দ্বারা নিয়মিত ইহা উপনিষদে উক্ত হইয়াছে।*

আর প্রতিদেহে যে দেবাসুর সংগ্রাম নিয়ত চলিতেছে তাহার নিয়ন্তা যে এই মহামায়া জীবের যে এই অসুর জয়ে তাহার নিজের স্বভাবজ কুপ্রবৃত্তি দমনে কোন শক্তি বা পুরুষকার নাই তাহা চণ্ডীতেই বিশদ করিয়া বুঝান হইয়াছে মানুষ যখন সত্ত্বশক্তি বা শুভ দৈবী প্রকৃতিরূপে চালিত হইয়া তাহার এই

---

* কেনোপনিষদে আছে, "ব্রহ্মই দেবতাদের জন্য জয় (অসুর পরাভব) করেন। সেই ব্রহ্মের বিষয়েই দেবতারা মহিমান্বিত হন। যখন দেবতারা নিজে জয় করিয়াছেন বলিয়া অভিমান করিলেন তখন ব্রহ্ম দেবতাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। দেবতারা তাঁহাকে জানিতে তখন তিনি অগ্নিকে সামান্য তৃণ দিয়া বলিলেন তুমি সকল দগ্ধ করিতে পার অভিমান করিতেছ ইহাকে দগ্ধ কর। অগ্নি পারিলেন না। বায়ুকে তিনি বলিলেন তুমি সকল বস্তু গ্রহণ করিতে পার বলিয়া অভিমান করিতেছ এই তৃণকে গ্রহণ কর। বায়ু পারিলেন না। তখন ইন্দ্র তাঁহাকে জানিতে গেলেন। ব্রহ্ম অন্তর্হিত হইলেন। তখনই ইন্দ্র সেখানে "তস্মিন্ এব আকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানাং উমাং হৈমবতীং" "দেখিতে পাইলেন। তিনি ইন্দ্রকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিলেন।" এই হৈমবতী উমাই ব্রহ্মশক্তি।

আসুরিক প্রকৃতি সকল দমন করিবার জন্য সেই মহাদেবীর শরণাপন্ন হয়। তখনই তিনি তাহার জন্য তাহার এই সকল স্বাভাবিক তমোআত্মিকা আসুরীবৃত্তি দমন বা জয় করিয়া দেন ক্রমে তাহাকে ধর্ম্মের পথে মুক্তির পথে অগ্রসর করান। ( ইহাই চণ্ডীর মূলতত্ত্ব। )

এই মহামায়া মহাশক্তি জড়বাদীর জগৎ উপাদান কারণ নহে। তিনি ন্যায়ের "ভূত" নহেন, বৈশেষিকের পরমাণু নহেন, সাংখ্য পাতঞ্জলের জড় মূল প্রকৃতি নহেন, পূর্ব্ব মীমাংসার জড় কর্ম্মশক্তি নহেন, বৌদ্ধের শূন্য নহেন, বেদান্তের অজ্ঞান অবিদ্যা বা মায়া নহেন। এই মহাশক্তি চিন্ময়ী। তিনি সর্ব্ব ভূতে সর্ব্বজীবে চৈতন্যরূপে ব্যাপিয়া। তাঁহা হইতে জড় অণু বা শক্তি, তাঁহা হইতেই মূল প্রকৃতি, তাঁহা হইতেই অবিদ্যা বা অজ্ঞান। তিনি ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই। তিনি নিত্যা সচ্চিদানন্দময়ী। সগুণ অবস্থায় সৃষ্টিকল্পে ব্রহ্মের বিবর্ত্তন একদিকে পরম পুরুষ বা মূল পিতৃশক্তিরূপে, আর অন্যদিকে পরা প্রকৃতি বা মহাশক্তিরূপে, তাহারাই জগতের পিতা মাতা মহেশ্বর উমা—ওঁ মা।

এই মহাশক্তিই জগতের মাতৃরূপিনী, জগৎধাত্রী। আমরা জগতে যে দুইরূপ শক্তির বিকাশ দেখিতে পাই এক পিতৃশক্তি, আর আর এক মাতৃশক্তি, তাহার মধ্যে এই মাতৃশক্তিকে স্ত্রীরূপে ধারণা করা যাইতে পারে। তিনিই মহামায়া সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থিতা; সকল নারীই তাহার কলারূপিণী। তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিয়া আছেন, মহামার্ত্তরূপে জগতকে রক্ষা, করিতেছেন পোষণ ও ধারণ করিতেছেন। তাহার প্রভাবেই জীবজাতির জন্ম রক্ষা বৃদ্ধি ও বিকাশ হইয়া থাকে। এই জন্য এই সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী সর্ব্বশক্তিময়ী জননীর সাধনাই চণ্ডীতে বিহিত হইয়াছে।

এইরূপে চণ্ডী হইতে আমরা অনেক নূতন ও নিগূঢ়ধর্ম্ম ও দার্শনিকতত্ত্ব জানিতে পারি। সে সকল সংক্ষেপে বুঝিতে চেষ্টা করা সম্ভব নহে। তবে আর একটি তত্ত্বমাত্র এস্থলে উল্লেখ করিব। চণ্ডীতে সকাম সাধনা ও সাকার উপাসনার কথা আছে। যিনি সর্ব্বব্যাপী চিন্ময়ী মহাশক্তি সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত, তাহারও মহাময়ীমূর্ত্তি গড়িয়া উপাসনা করা আছে। সুরথ ও সমাধি উভয়ে মেধস ঋষির নিকট চণ্ডীমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া নদীপুলিনে গিয়া তাঁহার মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি গড়িয়া তিন বৎসরকাল একচিত্তে উপাসনা করিয়াছিলেন। দেবীও তাঁহাদের সাধনায় প্রসন্না হইয়া মূর্ত্তিময়ী হইয়া তাঁহাদের দেখা দেন ও অভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলেন। দেবী হইতে বরলাভ করিয়া সুরথ সেই জন্মে নিজ হৃতরাজ্য পুনর্লাভ করিলেন ও অন্য জন্মে অবিভ্রংশী রাজ্যলাভ করিয়া বৈবস্বত মনু হইবেন। আর বৈশ্যও বাঞ্ছিত জ্ঞানলাভ করিয়া পরিণামে মুক্ত হইবেন, এই বর পাইলেন। সমাধির সাধনা নিষ্কাম ছিল। অতএব চণ্ডীতে সকাম ও নিষ্কামভাবে মহামায়ার আরাধনার কথা উক্ত হইয়াছে। চণ্ডীর এক স্থানে উক্ত হইয়াছে—

প্রসন্না যাদের প্রতি তাহারা নিয়ত .
তোমা হতে লভে দেবী ! অভ্যুদয় যত
দেশে পূজ্য সেই জন বৃদ্ধি তার যশোধন
ধর্ম্ম আদি চতুর্বর্গ নাহি হয়-ক্ষয়

তারা ধন্য—নিরুদ্বিগ্ন দারা পুত্রে রয়।”

অন্যত্র উক্ত হইতেছে—

“গন্ধ পুষ্প ধূপ আদি দানে
করিলে তাঁহার পূজা আর স্তুতি
দেন তিনি সম্পদ সন্তান
আর দেন তিনি ধর্ম্মে শুভ মতি।

অতএব সকাম ও সাকার উপাসনা দ্বারা ক্রমে ধর্ম্মে মতি হয়। অন্যত্র আছে—

চিন্তার অতীতা তিনি মুক্তির কারণ
কঠোর সাধনালভ্যা যাঁরে ঋষিগণ
ইন্দ্রিয় সংযম করি. সর্ব্বদোষ পরিহরি
চিন্তা করে মোক্ষ তরে তত্ত্বজ্ঞানে মতি,
সেই পরাবিদ্যা তুমি দেবি ভগবতি।

অতএব এই দেবী যাহার প্রতি প্রসন্না হন তাহারা ইহ সংসারের সুখসমৃদ্ধি ভোগ করেন,পরকালে সদ্গতি লাভ করেন, ও পরিণামে মুক্ত হন। তবে মুক্তির জন্য তাঁহার সাধনা, সে অতি কঠিন ও কঠোর সাধনা।

যাহা হউক, পূর্ব্বে এই সকাম সাধনা বেদের কর্ম্মকাণ্ডে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন তাহা হেয় ছিল না। ক্রমে মুক্তির জন্য সাধনাই শ্রেয় এবং সকাম সাধনা হেয় এই তত্ত্ব প্রচারিত হইয়া ভারতে অবিশ্রান্ত বৈরাগ্যের স্রোত বহিতেছিল। চণ্ডীতে আবার সকাম সাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহা যে হেয় নহে, প্রয়োজনীয়, তাহা ইঙ্গিতে বুঝান আছে। সকাম সাধনার মধ্য দিয়া নিষ্কাম সাধনার পথ পাওয়া যায়, সাকার উপাসনা হইতে নিরাকার চিন্ময় ব্রহ্মে বা চিন্ময়ীশক্তির তত্ত্বজ্ঞান হয় তাহা দেখান হইয়াছে।

অতএব চণ্ডীর এই শক্তিবাদ অদ্ভুত। তাহা চণ্ডীগ্রন্থের পূর্ব্বে আর কোথাও স্পষ্ট উল্লিখিত হয় নাই। ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত এই শক্তিবাদের মূল হইলেও, তাহা অতি গূঢ়। বেদান্তে বা অন্য কোন দর্শনে এই শক্তিবাদ প্রচারিত হয় নাই। মাতৃভাবে এই ব্রহ্মময়ী মহাশক্তির পূজা ও আরাধনা আর কোথাও কোন ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। কোন দর্শনে বা বিজ্ঞানে এই আদ্যাশক্তি পরাপ্রকৃতিকে চিন্ময়ী মাতৃশক্তি রূপে ধারণা করা হয় নাই। আশ্চর্য্য যে এমন কোমল মধুময় মর্ম্মস্পর্শী, এমন মনপ্রাণস্নিগ্ধকর উপাসনা, এমন জোর করিয়া ভগবানকে আপনার করিয়া লইয়া সাধনা, মার কাছে যেমন আবদার অভিমান চলে তেমনই জোর করিয়া আবদার করিয়া আরাধনা অদ্যাবধি আর কোথাও প্রবর্ত্তিত হয় নাই। এই মহা মাতৃভাবে ব্রহ্মের আরাধনা এক হিন্দু ব্যতীত জগতে সকল জাতির নিকট অজ্ঞাত। সকলেই সে মহা রসাস্বাদে বঞ্চিত। অমৃতনিস্যন্দিনী ‘মা’ শব্দের মহিমা তাহার অদ্ভুত শক্তি যিনি বুঝেন, তিনিই এই মাতৃভাবে সাধনার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইহার নিকট পিতৃভাবে উপাসনা অনেক শক্তিহীন; বুঝি পতিভাবে মধুর রসের প্রেমউপাসনাও ইহার সমকক্ষ নহে। এই একমাত্র মহাধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারে চণ্ডীর অমরত্ব; চণ্ডী আমাদের মহা ধর্ম্মগ্রন্থ।

চণ্ডী—জ্ঞানীর নিকট, জিজ্ঞাসুর নিকট; শক্তিবাদ প্রচার করিয়া জগতের অজ্ঞেয় তত্ত্ব জ্ঞানের বিষয়ীভূত করিয়া দিয়াছেন। চণ্ডী ভক্তের নিকট মাতৃভাবে ঈশ্বরোপাসনা প্রবর্ত্তিত করিয়া তাহার ভক্তিবৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতার উপায় করিয়া দিয়াছেন। চণ্ডী—কর্ম্মীর

নিকট সকাম সাধনার নববিধান প্রচারিত করিয়া তাহার কর্ম্মবৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন দ্বারা ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার তাহার যোগ্য পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। চণ্ডী—আত্মসর্ব্বস্ব স্বার্থপর অসুরী লোকের নিকট তাহার ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ আমিত্বের চারিদিকে অসীম অনন্ত শক্তির একরূপ অতিভীষণ অথচ করুণাময়ভাব তাহার ধারণাযোগ্য করিয়া প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাহার অভিমানকে সংকীর্ণ করিয়া, তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ বপন করিবার উপায় করিয়া দিয়াছেন। এইজন্য হিন্দুর নিকট চণ্ডী গ্রন্থের এত আদর, এত সম্মান, এত পূজনীয়তা। এই জন্য চণ্ডী হিন্দুর নিকট অমৃতনিস্যন্দিনী অপূর্ব্বগ্রন্থ—হিন্দুর প্রত্যহ পাঠ্যধর্ম্ম পুস্তক। *

---

# ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আইন।

( ২ )

প্রথম প্রবন্ধে আমরা ১৭৯৩ সালের রেগুলেসনগুলির আলোচনা করিয়াছি। অতঃপর যে রেগুলেসনগুলি সচরাচর প্রচলিত নহে, সেগুলির মাত্র উল্লেখ করিয়া যেগুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় সেগুলির বিস্তারিত আলোচনা করিব।

| সাল। | নং। | বিষয়। |
|---|---|---|
| ১৭৯৪ | ১ | কালেক্টরের দেশীয় কর্ম্মচারীগণের নিকট কাগজ আদায়ের ক্ষমতা সম্বন্ধে— |
| ১৭৯৯ | ৫ | যে সকল ব্যক্তি উইল করিয়া মরিবে তাহাদের উইলের অনুযায়ী কার্য্যকরণ ও উইল না থাকিলে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে দেওয়ানী আদালতের জেলা এবং সিটি কোর্টের ক্ষমতা সম্বন্ধে - |

| সাল। | নং। | বিষয়। |
|---|---|---|
| ১৮০০ | ৮ | লাখেরাজ জমির রেজেষ্টারী সম্বন্ধে বাদসাহী ও অন্য লাখেরাজ সম্বন্ধীয় আইনে বিধান আছে যে কালেক্টর নোটিশ দিবার ৬ মাস মধ্যে রেজেষ্টারি না করিলে লাখেরাজ অসিদ্ধ হইবে। যদি সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল মেয়াদের মধ্যে রেজেষ্টারি না করার |

* চণ্ডীমাহাত্ম্য প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

যথেষ্ট কারণ না পান। উক্ত আইনে লেখা আছে যে বাদসাহি লাখেরাজের নোটিশ প্রত্যেক বাদসাহি লাখেরাজদারের সদর কাছারীতে জারি করিতে হইবে এবং অন্য লাখেরাজের নোটিশ নিম্নলিখিত স্থানে জারি করিতে হইবে। যথা –

(১) খারিজা মহালে প্রত্যেক ভূস্বামী ও ইজারদারের প্রধান কাছারি।

(২) গবর্ণমেণ্টের খাসের জমিতে প্রত্যেক দেশীয় কালেক্টরের প্রধান কাছারী।

(৩) উক্ত মহাল বা খাসের জমি ২ বা ৩ পরগণায় থাকিলে প্রত্যেক পরগণা ও পরগণার অংশের প্রধান কাছারি।

কিন্তু ঐরূপভাবে সকল স্থলে নোটিশ জারি হয় নাই। সে মতে এই আইন জারি হইবার পর কালেক্টর দেখিবেন যে নোটিশ রীতিমত জারি হইয়াছে কি না এবং না হইয়া থাকিলে অবিলম্বে ঐরূপ ভাবে নোটিশ জারি করিবেন, এবং নিজের ও জেলার দেওয়ানি আদালতের কোর্টে নোটিশ জারি করিবেন। এই নোটিশ জারির পর এক বৎসর সময় মধ্যে লাখেরাজ-দার লাখেরাজ রেজেষ্টারি করিতে পারিবেন। তাহার পরে যে লাখেরাজ রেজেষ্টারি হয় নাই তাহা অসিদ্ধ গণ্য হইবে ও তাহার খাজানা ধার্য্য হইবে।

| সাল। | নং। | বিষয়। |
|---|---|---|
| ১৮০০ | ১০ | মেদিনীপুর এবং অন্য জেলার জঙ্গল মহলের বাটোয়ারা নিষেধ সম্বন্ধে— |

মেদিনীপুর ও অন্য জেলার জঙ্গল মহলে দেশীয় প্রথা অনুসারে একব্যক্তি মরিলে সমুদায় সম্পত্তি অপর একব্যক্তি পায়, সমুদায় উত্তরাধিকারির মধ্যে উহা বণ্টন হয় না। ঐ প্রথা অনুসারে আদালত চলিবেন।

| সাল। | নং। | বিষয়। |
|---|---|---|
| ১৮০১ | ১ | সম্পত্তির অংশের উপর কর ধার্য্য করা, তালুক খারিজ করা সম্বন্ধে— |

সমুদায় সম্পত্তির জমার সহিত তাহার নিট্ উৎপন্নের যে অনুপাত অংশের জমার সহিত তাহার নিট্ উৎপন্নের সেই অনুপাত হইবে। মোট খাজানা বা মোট উৎপন্ন হইতে আদায়ের ও রক্ষণের খরচ বাদে যাহা থাকে তাহাই নিট্ উৎপন্ন। ভূস্বামী স্বয়ং যাহা গ্রহণ করেন, যথা মালিকানা, খরচ বলিয়া বাদ যাইবে না। পাটোয়ারীর কাগজ অশুদ্ধ হইলে, গত ৩ তিন বৎসরের সমুদায় মহালের জমি ও জমার কাগজ হইতে অংশের নিট্ উৎপন্ন স্থির করিতে হইবে। কালেক্টর সাবধান হইবেন যে কাগজ বিশুদ্ধ হয় ও তিনি অংশের জমা মঞ্জুরের জন্য বোর্ডে লিখিবেন। ভূস্বামী ভূমির শাসন বা হিসাব রাখার জন্য যে কোনও দেশীয় কর্ম্মচারী রাখিবেন তাহায় প্রতি পাটোয়ারীর বিধান বর্ত্তিবে এবং মিথ্যা কাগজ তৈয়ার করার জন্য তাহার জেলা কোর্টে দণ্ড হইলে, ভূস্বামী তাহাকে কখনও চাকুরিতে রাখিতে পারিবেন না, রাখিলে আদালত কর্ত্তৃক তাঁহার অবস্থানুযায়ী দণ্ড হইবে। ভূস্বামীর বা অপর ব্যক্তির উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী থাকিলে এবং ঐ কর্ম্মচারী দ্বারা কার্য্য সমাধা হইলে ভূস্বামী বা অপর ব্যক্তিকে কালেক্টর স্বয়ং উপস্থিত হইবার জন্য সমন দিবেন না, যদি দেন তবে দেওয়ানী আদালতে তাঁহার নামে ক্ষতিপূরণের মোকর্দ্দমা চলিবে। যে সমুদায় তালুকদার

জমিদারী হইতে খারিজ হইতে চান ও খারিজ হইবার যোগ্য, তাঁহারা এই আইন জারি হইবার ১ বৎসর মধ্যে কালেক্টরের নিকট লিখিত দরখাস্ত দিবেন। ঐ মেয়াদ অস্তে তালুক খারিজ করা হইবে না। এই নিয়ম দশশালা বন্দোবস্তের পর সৃষ্ট তালুকের প্রতি বর্ত্তিবে না। কালেক্টরকে না জানাইয়া জমিদার কোনও মহালের অংশ হস্তান্তর করিলে (৭) ঐ মহালের অংশের পৃথক সরকারি জমা ধার্য্য না হইলে, ঐ হস্তান্তর গবর্ণমেণ্ট মানিবেন না।

| সাল। | নং। | বিষয়। |
|---|---|---|
| ১৮০৪ | ১০ | সামরিক আইন দ্বারা রাজবিদ্রোহের অবিলম্বে দণ্ডবিধান করার সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের ক্ষমতার বিষয়— |
| ১৮০৫ | ১২ | কটক জেলা ও বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলাভুক্ত পটাসপুর, কামরদাচর এবং বোগ্‌রাই পরগণার বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায় বিষয়— |
| ১৮০৫ | ১৩ | কটক জেলায় পুলিশের কার্য্য ও শান্তিরক্ষার বিষয়— |

এই আইনের ভূমিকায় লেখা আছে যে মারহাট্টা শাসনকালে সরদার পাইক বা খণ্ডেট শান্তিরক্ষার কার্য্য করিত, তাহার অধীনে নিম্ন পাইক থাকিত। সকলের ভরণপোষণের জন্য সরকার হইতে জমি দেওয়া হইত।

| সাল। | নং। | বিষয়। |
|---|---|---|
| ১৮০৬ | ১১ | কোম্পানির এলাকার মধ্য দিয়া সৈন্য গমনের বা পথিকের যাতায়াতের সুবিধার বিষয়— |

যে ভূস্বামীর এলাকার মধ্য দিয়া সৈন্য গমন করিবে তাঁহাকে কালেক্টর সংবাদ দিবেন ও তিনি রসদাদি যোগাড় ও খাল বা নদী পার হইবার সেতু তৈয়ার করিয়া দিবেন। সকল খরচ তাঁহাকে দেওয়া হইবে। পথিক ভ্রমণের সাহায্যের দরকার হইলে নিকটস্থ থানায় সাহায্য চাহিলে পাইবেন। মূল্য তিনি দিবেন।

| সাল। | নং। | বিষয়। |
|---|---|---|
| ১৮১০ | ১৯ | মসজিদ, মন্দির, কলেজ প্রভৃতির সংরক্ষণের ও অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্য ও হিতকার্য্যের জন্য দত্ত ভূসম্পত্তির তত্ত্বাবধান, সেতু, সরাই, কাট্রা এবং অন্য অন্য সর্ব্বসাধারণের জন্য নির্ম্মিত বাটীর সংরক্ষণ ও মেরামত, যে সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে অশিয়াছে তাহার রক্ষণাদি সম্বন্ধে। |

এই আইনের ভূমিকায় লেখা আছে যে, পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট ও ব্যক্তিবিশেষে মসজিদ, মন্দির, কলেজ প্রভৃতির এবং অন্যান্য ধর্ম্মকার্য্য ও হিতকার্য্যের সংরক্ষণের জন্য অনেক ভূসম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন।

| সাল। | নং। | বিষয়। |
|---|---|---|
| ১৮১০ | ২০ | সামরিক বিভাগের যুদ্ধ ভিন্ন অন্য যে কোনও কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের সামরিক আইন অনুযায়ী বিচার সম্বন্ধে— |
| ১৮১১ | ৫ | রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে— |

বকেয়া রাজস্ব আদায় না হওয়ায় সমুদায় মহাল বিক্রয় হইলে কোনও এক অংশীদার আপন অংশে দখল পায় নাই বলিয়া আদালত ঐ বিক্রী অসিদ্ধ করিবেন না। নিলামে মহাল বকেয়া রাজস্ব অপেক্ষা অনেক বেশী টাকায়

বিক্রয় হওয়ার দরুণ আদালত নিলাম অসিদ্ধ করিবেন না।

| সাল। | নং। | বিষয়। |
|---|---|---|
| ১৮১২ | ১১ | ভিন্ন রাজার দেশ হইতে আসিয়া ব্রিটিশ রাজ্যে বাস করতঃ ভিন্ন রাজার সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ব্যক্তিগণের আটক করা সম্বন্ধে— |

ভূমিকা—আভা রাজ্যের আরাকান দেশীয় মগেরা আরাকান দেশের সীমানার নিকট চাটিগাঁ জেলায় ব্রিটিশ রাজ্যে বাস করতঃ ব্রিটিশ রাজ্যের সহিত মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ আভা রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করে এই আইনের মর্ম্ম ঐরূপ যুদ্ধবিগ্রহকারী ব্যক্তিকে অন্যত্র উঠাইয়া দেওয়ার বা অবস্থাবিশেষে কোনও নিদ্ধারিত সময়ের জন্য আটক করার ক্ষমতা সকৌন্সিল গবর্ণর জেনেরলের থাকিল।

| | | |
|---|---|---|
| ১৮১৪ | ২৯ | বীরভূম জেলার ঘাটোয়ালী মহালের বন্দোবস্ত বিষয়ে |

ঘাটোয়ালী মহালের জমা চিরস্থায়ী হইল ও ঘাটোয়াল পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে মহাল ভোগ করিবে। ঐ জমা গবর্ণমেণ্ট আদায় করিবেন এবং মহালের দশশালা বন্দোবস্তের জমার অতিরিক্ত টাকা জমিদারকে দেওয়া হইবে। ঘাটোয়াল জমা না দিলে, সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল তাহার মহাল নিলাম করিতে বা বকেয়া জমা দিলে অপরের সহিত বন্দোবস্ত করিতে বা সাবেক জমার তুল্য, বেশী বা কম জমায় পুনরায় বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন।

| | | |
|---|---|---|
| ১৮১৬ | ৫ | কটক জেলা, পটসপুর পরগণা প্রভৃতিতে কানুনগো নিয়োগ সম্বন্ধে— |

| সাল। | নং। | বিষয়। |
|---|---|---|
| ১৮১৬ | ৯ | সুন্দরবন কমিশনারের নিয়োগ। |

সুন্দরবন কমিশনার বোর্ডের অধীনে কার্য্য করিবেন ও তাঁহার কালেক্টরের ক্ষমতা থাকিবে।

| | | |
|---|---|---|
| ১৮১৬ | ১১ | কটক জেলার কতিপয় করদ মহালে উত্তরাধিকারিত্ব বিষয় নিস্পত্তি— |
| ১৮১৭ | ১২ | পাটোয়ারী সম্বন্ধে— |
| ১৮১৭ | ২০ | দারোগা ও অন্যান্য পুলিশের নীচস্থ কর্ম্মচারী সম্বন্ধে— |
| ১৮১৮ | ৩ | আদালতের সাহায্য না লইয়া ব্যক্তিবিশেষকে কয়েদ করার বা তাহার সম্পত্তি আবদ্ধ করার সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের ক্ষমতা সম্বন্ধে— |

যে কর্ম্মচারীর জিম্মায় আবদ্ধ ব্যক্তি থাকিবেন তিনি ১লা জানুয়ারী ও ১লা জুলাই তারিখে আবদ্ধ ব্যক্তির ব্যবহার, স্বাস্থ্য, সচ্ছন্দতা সম্বন্ধে রাজনীতি বিভাগের সেক্রেটারীকে সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের নিকট পেশ করার জন্য রিপোর্ট দিবেন।

আবদ্ধ ব্যক্তি জিলা বা সিটি ম্যাজিষ্ট্রেটের জিম্মায় থাকিলে সেসের সময় জজ তাঁহাকে দেখিবেন ও তাঁহার ব্যবস্থা সম্বন্ধে হুকুম দিবেন। আবদ্ধ ব্যক্তি জিলা বা সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য সরকারী কর্ম্মচারীর জিম্মায় থাকিলে, সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল হুকুম দিবেন যে জিলা বা সিটি ম্যাজিষ্ট্রেট বা জজ বা অন্য কোনও রাজকর্ম্মচারী নির্দ্ধারিত সময়ে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট দেন।

আবদ্ধ ব্যক্তি সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের নিকট কোনও আবেদন পাঠাইলে তিনি যে কর্ম্মচারীর জিম্মায় আছেন ঐ কর্ম্মচারী নিজ মন্তব্য সহ ঐ আবেদন তিনি অবিলম্বে সকৌন্সিল্ গবর্ণর জেনারলের নিকট রিপোর্ট দিবেন যে, যেরূপে ঐ আবদ্ধ ব্যক্তিকে রাখা হইয়াছে তাহাতে তাঁহার স্বাস্থ্য খারাপ হইবে কি না ও তাঁহার ভরণপোষণের জন্য যে টাকা মঞ্জুর হইয়াছে তাহাতে তাঁহার নিজের ও পরিবারের খরচ চলিবে কি না। এবং ঐ কর্ম্মচারী সাবধান হইবেন যেন মঞ্জুরি টাকা প্রকৃত কার্য্যে ব্যয় করা হয়। কোনও জমিদার, জাগিদার, তালুকদার বা অন্য ব্যক্তির ভূসম্পত্তি আদালতের সাহায্য না লইয়া সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল্ আবদ্ধ করিলে, ঐ ভূসম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের খাসে রাখা হইবে ও আবদ্ধ সময়ের মধ্যে আদালতের ডিক্রী বা জরিমানা আদায় বা অন্য কারণে উহা বিক্রয় হইবে না, গবর্ণমেণ্ট টাকা দিবার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন। ভূস্বামী যখন ঐ ভূসম্পত্তি ফিরাইয়া পাইবেন তখন আবদ্ধ সময়ের উদ্বৃত্ত মুনফা তাঁহাকে দেওয়া হইবে।

| সাল। | নং। | বিষয়। |
|---|---|---|
| ১৮১৯ | ১ | বঙ্গদেশে কানুনগো নিয়োগ ও পাটোয়ারীর কার্য্যের পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে— |

কানুনগো নিম্নলিখিত কার্য্য করিবেন—(১) খাস বা আবদ্ধ জমির তহশীলদার বা সাজোয়ালের আদায়ের টাকার জমাওয়াশীল বাকীর নকল রাখা, (২) সর্ব্বপ্রকার নিষ্কর জমির চিরস্থায়ী বা জীবনস্বত্ব হউক হিসাব রাখা ও ঐ জমি গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হইলে কালেক্টরকে সংবাদ দেওয়া, (৩) প্রত্যেক গ্রামের পাটোয়ারির লিষ্টি রাখা এবং ভূস্বামী নীচস্থ প্রজাকে যে পাট্টা দিয়াছেন তাহার রেজেষ্টারি রাখা, (৪) বিক্রয় নীলামে বা আপোসে দায়াবদ্ধ, ইজারা বা অন্য কারণে মহালের হস্তান্তরের রেজেষ্টরি রাখা এবং পক্ষগণের প্রার্থনা মতে ফি বা পারিশ্রমিক না লইয়া হস্তান্তর পত্রে দস্তখত দেওয়া, (৫) পরগণা ও মহালের সরেজমিনের সীমানার, এবং প্রত্যেক পরগণায় গ্রামের নম্বর নাম, উৎপন্ন দ্রব্য, খাজানার নিরিখ, নিয়ম ও দেশাচার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা এবং আদালত ও কালেক্টরের প্রার্থনা মতে স্থানীয় খবর তাঁহাদিগকে দেওয়া, (৬) গবর্ণমেণ্ট বা ভূস্বামী বা রায়ত কর্ত্তৃক জমির মাপে সাহায্য করা এবং তাহা লেখা (৭) বোর্ড অব্ রেভিনিউ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ফারমে উপরি লিখিত বিষয় ও হিসাব লেখা, (৮) মালগুজারের মৃত্যু ও তাহার ওয়ারিশের নাম কালেক্টরের নিকট এত্তেলা দেওয়া এবং জমির উত্তরাধিকারীত্ব সূত্রে নূতন দখলকারের নামের রেজেষ্টারি রাখা বোর্ড অব্ রেভিনিউ কানুনগোর কার্য্যের স্থান বিশেষ পরিবর্ত্তন করিবেন।

| সাল। | নম্বর | বিষয়। |
|---|---|---|
| ১৮১৯ | ২ | অসিদ্ধ নিষ্কর বা বেবন্দোবস্ত জমির করধার্য্য সম্বন্ধে— |

কালেক্টর বা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনও কর্ম্মচারী নিজ এলাকার ভিতর অসিদ্ধ নিষ্কর, অযথোচিত জমাবিশিষ্ট বা বেবন্দোবস্তি জমি দেখিলে বোর্ড অব্ রেভিনিউ বা বোর্ডের ক্ষমতাযুক্ত অপর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট দিবেন। ঐ কর্ত্তৃপক্ষ অনু-

সন্ধানের যথেষ্ট কারণ আছে মনে করিলে কালেক্টর বা উল্লিখিত অপর কর্ম্মচারীকে অনুসন্ধান করিতে হুকুম দিবেন। হুকুম পাইলে কালেক্টর জমির উপর গবর্ণমেণ্টের দাবি উল্লেখ করিয়া ১ মাসের ভিতর দলিলাদি সহ স্বয়ং বা উকিল দ্বারা উপস্থিত হইবার জন্য পক্ষের নামে নোটিশ দিবেন। নোটিশ পক্ষের নিজের উপর জারি না করিয়া উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর উপরে জারি করা যাইতে পারে। নোটিশ গ্রহণ করিয়া রসিদ না দিলে জমির উপরে বা নিকটস্থ গ্রামে বাসিন্দা ২ জন লোকের সাক্ষ্যদ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। নোটিশে পক্ষকে জানান হইবে যে যদি সে দলিলাদি দাখিল না করে তবে তাহা উপযুক্ত কারণ ব্যতীত পরে গ্রহণ করা যাইবে না। নোটিশ জারি করা না গেলে কালেক্টর তাঁহার কাছারির প্রকাশ্য স্থানে সাবেক নোটিশের নকল এবং একখণ্ড ইস্তাহার লটকাইয়া জারি করিবেন। যে কোনও নির্দ্ধারিত তারিখে (ঐ তারিখ ইস্তাহার জারির পর পনর দিনের কম না হয়) পক্ষ উপস্থিত না হইলে কালেক্টর একতরফা তদন্ত করিবেন। ঐ নোটিশ ও ইস্তাহারের নকল অনতিবিলম্বে পক্ষের বাটীর বাহিরের দরজা অথবা ভূমি যে গ্রামের ভিতর সেই খানে বা নিকটস্থ কোনও গ্রামে প্রকাশ্য স্থানে লটকাইবার হুকুম কালেক্টর দিবেন। যে সময়ে ও স্থানে ইস্তাহার জারি হইয়াছে তাহা লিখিয়া নাজির হুকুম ফেরৎ দিবেন এবং ঐ হুকুম কালেক্টরের নথির সামিল থাকিবে। যদি ইস্তাহার বা নোটিশ জারির পর নির্দ্ধারিত তারিখে পক্ষ উপস্থিত না হয় অথবা উপস্থিত হইয়া জবাব দিতে অস্বীকার করে, তবে কালেক্টর একতরফা তদন্ত শেষ করিবেন। বেবন্দোবস্তি জমি সম্বন্ধে কালেক্টর বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান করিবেন যে, দশ-সালা বন্দোবস্ত সময়ে ঐ জমির অবস্থা কিরূপ ছিল এবং নূতন চরের সম্বন্ধে সৃটির সময় তদন্ত করিবেন। বোর্ড অব্ রেভিনিউ বা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কর্তৃপক্ষের হুকুম লইয়া কালেক্টর ঐ জমির এবং ঐ জমি যে মহালের সামিল বলিয়া প্রকাশ তাহার জরিপ করাইতে পারিবেন। ঐ জমি বা মহালের হিসাব পত্র যে ব্যক্তি রাখে সেই পাটোয়ারি, গোমস্তা বা অপর ব্যক্তিকে কালেক্টর হিসাব পত্র সহ তলব করিয়া ঐ কাগজপত্রের সত্যতাদি সম্বন্ধে তাহার হলফান্ জবানবন্দি লইতে পারিবেন। উল্লিখিত কার্য্যের জন্য কোনও ভূস্বামী, ইজারাদার, পাটোয়ারি, গোমস্তা বা অপর কর্ম্মচারীর উপস্থিতি দরকার হইলে কি কারণে উপস্থিতি দরকার, যে কাগজ আনিতে হইবে এবং যে সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইতে হইবে লিখিয়া নিজের সিল ও দস্তখত-যুক্ত নোটিস কালেক্টর ঐ ব্যক্তির উপর জারি করাইবেন। নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কাগজ পত্র দাখিল করিতে অস্বীকার বা অবহেলা করিলে বোর্ড অব্ রেভিনিউ বা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ তৎক্ষণাৎ ঐ জমি আবদ্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্টের খাস মহাল স্বরূপ গণ্য করিয়া উহার খাজানা আদায় করার হুকুম দিতে পারিবেন, কিন্তু কালেক্টর দখলকারের স্বত্ব সম্বন্ধে বিস্তারিত তদন্ত করিয়া বোর্ডে রিপোর্ট দিবেন। বোর্ড স্থির করিবেন যে জমির খাজানা হইবে কি না। রেভিনিউ

কর্ম্মচারীগণের হুকুমের বিরুদ্ধে দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিলে যে দলিল কালেক্টরের নিকট দাখিল হয় নাই তাহা কালেক্টরের নিকট দাখিল না করার সন্তোষজনক কারণ না দেখাইলে এবং ঐ কারণ কালেক্টরের নিকট দেখান না হইয়া থাকিলে তাহার কারণ না দেখাইলে দেওয়ানী আদালত গ্রাহ্য করিবেন না। কোনও ভূস্বামী বা ইজারাদার নোটিশের নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে স্বয়ং উপস্থিত হইতে বা কর্ম্মচারী উপস্থিত করিতে বা আবশ্যক দলিল পত্রাদি দাখিল করিতে অবহেলা বা অস্বীকার করিলে এবং অবহেলার যথেষ্ট কারণ না দেখাইলে বোর্ড অব্ রেভিনিউ বা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষ কালেক্টরের হুকুম যতদিন তিনি মান্য না করেন ততদিন তাঁহাকে তাঁহার অবস্থা অনুযায়ী কোনও হারে দৈনিক জরিমানা করিতে পারিবেন। ঐ জরিমানা দৈনিক দেয় এবং ঐ হার সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের অবগতির জন্য লিখিতে হইবে এবং সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারল মঞ্জুর করিলে বকেয়া রাজস্বের ন্যায় ঐ জরিমানা আদায় করা যাইবে। বোর্ড অব্ রেভিনিউ বা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের আদেশানুযায়ী কোনও জমির আবদ্ধ করা বা জরিপ কার্য্যে কোনও ভূস্বামী বা অপর ব্যক্তি বাধা দিলে বা দেওয়াইলে, কিম্বা হিসাব পত্র দাখিল করা ও তৎসম্বন্ধে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য পাটোয়ারি, গোমস্তা বা অপর কর্ম্মচারীর উপর নোটিশ জারি কার্য্যে বাধা দিলে বা দেওয়াইলে বোর্ড অব্ রেভিনিউ বা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কর্ত্তৃপক্ষ ঐ ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিলে তাহার অবস্থা ও দোষের গুরুত্ব অনুযায়ী তাহাকে জরিমানা করিতে পারিবেন এবং বকেয়া রাজস্বের ন্যায় ঐ জরিমানা আদায় করিবেন, কিন্তু জরিমানা ৫০০৲ টাকার অধিক হইলে বোর্ড সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের নিকট রিপোর্ট দিবেন ও তাঁহার বিনানুমতিতে জরিমানা আদায় করিবেন না। নোটিশ বা সমন অনুযায়ী পক্ষ উপস্থিত হইয়া স্বত্বের দলিল দাখিল করিলে কালেক্টর ঐ দলিলের রসিদ দিবেন এবং উহা উপযুক্তরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহার জমির করধার্য্যের হেতু লিখিয়া পক্ষকে দিবেন এবং সেই সঙ্গে যে দলিলের উপর কালেক্টর মত স্থাপন করিয়াছেন তাহার বেপ্ কাগজে নকল দিবেন। ৭ দিবসের মধ্যে লিখিয়া জবাব দিবার জন্য কালেক্টর পক্ষকে বলিবেন। কালেক্টর বা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারী ভূস্বামী বা অপর ব্যক্তির দাখিলা দলিলে যত্নপূর্ব্বক নম্বর দিবেন, চিহ্ন দিবেন তারিখ দিবেন ও দস্তখত করিবেন এবং ঐ দলিলের নাম ও নম্বর তাঁহার হুকুমে উল্লেখ করিবেন। চূড়ান্ত হুকুম দিবার পূর্ব্বে কালেক্টর পক্ষকে জানাইবেন যে তাঁহার নিকট যে দলিল দাখিল হয় নাই ও দাখিল না করার উপযুক্ত কারণ দেখান হয় নাই তাহা পরে রাজস্ববিষয়ক বা বিচার আদালত গ্রহণ করিবেন না, এবং তাঁহার হুকুমের উপরে লিখিবেন যে তিনি এইরূপ জানাইয়াছেন। পক্ষের জবাব পাইলে কালেক্টর গবর্ণমেণ্ট পক্ষে সাক্ষী ও পক্ষের মানিত সাক্ষী তলব করিয়া পক্ষের বা তাহার উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীর সাক্ষাতে বিচার কার্য্যের নিয়মে ঐ সাক্ষীর জবানবন্দি লইবেন। পক্ষের দাখিলা দলিল

কালেক্টর যত্নের সহিত পরীক্ষা করিবেন এবং জমির কর ধার্য্য করা সম্বন্ধে যে দলিলের উপর নির্ভর করেন তাহা পক্ষকে দেখিতে দিবেন। কালেক্টর ও কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এই আইনের মোতাবেক কার্য্যে সাক্ষী তলব করিয়া হলপ্ দেওয়াইতে বা হলপের পরিবর্ত্তে সত্যপাঠ পড়াইতে পারিবেন। অনুসন্ধান কার্য্য শেষ করিয়া কালেক্টর একটি রোব কারিতে হেতু উল্লেখ করতঃ নিজ মন্তব্য লিখিবেন এবং জমি করধার্য্যের উপযুক্ত কি না তাহাও লিখিয়া ঐ রোবকার ইত্যাদি বোর্ড অব্ রেভিনিউ বা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহাদের উপদেশ মোতাবেক পাঠাইবেন এবং সেই সময়ে চূড়ান্ত রোবকারির একখণ্ড রেপ্ কাগজে নকল পক্ষকে দিবেন ও পক্ষকে যে দিয়াছেন তাহা বোর্ড বা পূর্ব্বোক্ত অপর কর্ত্তৃপক্ষের নিকট লিখিবেন। বোর্ড অব্ রেভিনিউ বা পূর্ব্বোক্ত অপর কর্ত্তৃপক্ষ কালেক্টরের হুকুম পড়িয়া ও আবশ্যক অন্য প্রমাণ গ্রহণ করিয়া অফিসে প্রকাশ্য নোটিশ দিয়া একটি দিন স্থির করিবেন (ঐ দিন কালেক্টর যে তারিখে পক্ষকে চূড়ান্ত রোবকারির নকল দিবেন তাহা হইতে ছয় সপ্তাহের কম না হয়) এবং সেই দিন পক্ষ উপস্থিত থাকিলে তাহাকে শুনাইয়া একটি রোবকারি লিখিয়া হুকুম দিবেন ও পক্ষ প্রার্থনা করিলে তাহাকে ঐ রোবকারির নকল দিবেন। কালেক্টর ও বোর্ড যে চূড়ান্ত রোবকারি লিখিবেন তাহাতে মোকর্দ্দমার বিষয়, হুকুমের হেতু, সাক্ষীর নাম ও প্রত্যেক পঠিত দলিলের নাম থাকিবে। বোর্ড অব্ রেভিনিউ বা পূর্ব্বোক্ত অপর কর্ত্তৃপক্ষ, খাজনা ধার্য্য করার নিষেধ করিয়া হুকুম দিলে মোকর্দ্দমা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে, যদি পূর্ব্বের তদারকে শঠতা হইয়াছে বলিয়া বিচারালয়ে প্রমাণ না হয়। বোর্ড খাজানা ধার্য্য করার উপযুক্ত বলিয়া হুকুম দিলে কালেক্টর পক্ষ বা তাহার উকিলকে ঐ হুকুম জানাইবেন, জমির সীমানা নির্দ্ধারণ করিবেন এবং খাজানা ধার্য্য করিবেন। বোর্ডের হুকুম অবগত হইবার পনর দিন মধ্যে যদি পক্ষ যে জমা পরে ধার্য্য হইবে, তার শতকরা ১২ টাকা হারে সুদ জামিন দেওয়ার তারিখ হইতে দেওয়ার জন্য কালেক্টরের নিকট উপযুক্ত জামিন দেয় এবং ঐ তারিখ হইতে দশ দিবসের মধ্যে দেওয়ানী আদালতে খাজানা ধার্য্য সম্বন্ধে নালিশ রুজু করিবে বলিয়া জানায় (দশ দিবসের দিন আদালত বন্ধ থাকিলে, আদালত খোলার ৩ দিনের মধ্যে) তবে কালেক্টর পক্ষকে জমিতে দখলকার রাখিয়া বোর্ডে সংবাদ দিবেন, কিন্তু জামিনের পরিমাণ স্থির করার জন্য পক্ষ সমুদায় হিসাবের কাগজ কালেক্টরকে দেখাইবেন। পক্ষ ইচ্ছা করিলে আংশিক জমার জামিন দিতে পারে—ঐ স্থলে কালেক্টর বোর্ডের হুকুম লইয়া জমি খাসে রাখিবেন বা বোর্ডের মঞ্জুরি মিয়াদে ইজারা দিবেন এবং পক্ষ জমার যে অংশের জামিন দিয়াছে সেই অংশানুযায়ী আদায়ের ভাগ কালেক্টর তাহাকে দিবেন। কালেক্টর পক্ষের দিতে চাওয়া জামিন লইতে অস্বীকার করিলে, আদালত ঐ জামিন যথেষ্ট মনে করিলে কালেক্টরকে জামিন লইতে অনুমতি করিতে পারিবেন, কিন্তু জামিনদার কত টাকার জন্য দায়ী হইবেন তাহা বোর্ডের আদেশানুযায়ী

কালেক্টর স্থির করিবেন। প্রথমতঃ ঐ টাকা জমির যে বার্ষিক খাজানা ধার্য্য হইবে অথবা পক্ষ এক বৎসরে যে টাকা পাইবেন, মায় সুদ সেই টাকা অপেক্ষা বেশী হইবে না, কিন্তু যদি বোর্ডের হুকুম অবগত হওয়ার এক বৎসর পরে মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি না হয় তবে কালেক্টর ঐ টাকার দ্বিতীয় জামিন লইবেন। মোকররিদার জামিন দিতে স্বীকার করিলে ও মোকর্দ্দমা করার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে মোকররি জমা দিবে এবং পরে যে অতিরিক্ত জমা ধার্য্য হইতে পারে তাহার জন্য জামিন দিবে। যদি পক্ষ জামিন না দেয় অথবা জামিন দিয়া মোকর্দ্দমা রুজু করিতে ত্রুটি করে তবে কালেক্টর জমির কর চূড়ান্তরূপে ধার্য্য করিবেন। জামিনা না দেওয়া বা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে মোকর্দ্দমা রুজু না করার দরুণ যে সকল ব্যক্তির জমির কর ধার্য্য হইবে তাহারা বোর্ডের হুকুম অবগত হইবার এক বৎসর মধ্যে মোকর্দ্দমা করিতে পারিবে কিন্তু ঐ মেয়াদ গতে বোর্ডের হুকুম চরম হইবে। কিন্তু নাবালগ্ বা অনুপস্থিত প্রভৃতি সন্তোষজনক কারণ দেখাইলে এক ব্যক্তির সহিত অপর ব্যক্তির মোকর্দ্দমায় যেরূপ মেয়াদ থাকে সেই রূপ মেয়াদ থাকিবে। জিলা কোর্টের মোকদ্দমার আপিল সদর দেওয়ানী আদালতে হইবে। সদর দেওয়ানী আদালত নিম্ন আদালতের হুকুমের সহিত বোর্ড অব্ রেভিনিউ বা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কর্ত্তৃপক্ষের চূড়ান্ত রোবকারি পাঠ করিবেন এবং যদি মনে করেন যে নিম্ন আদালতের হুকুম ভ্রমাত্মক বা মোকর্দ্দমার আরও তদন্ত আবশ্যক, তবে আপীল গ্রহণ করিবেন। কোনও ফরমান্, সনদ, পরওয়ানা প্রভৃতি দানের দলিল দাখিল হইলে রাজস্ব ও বিচারের কর্ম্মচারীগণ শিল বা দস্তখত দেখিয়া প্রকৃত বলিয়া ধরিয়া লইবেন না, কিন্তু সাক্ষীর প্রমাণ ও অফিসের কাগজাদি দ্বারা পরীক্ষা করিবেন। ঐ দলিল রেজেষ্টারি করা না হইলে সন্তোষজনক কারণ ব্যতীত গ্রহণ করা হইবে না। যেস্থলে প্রথমতঃ জমি দান পাইয়া পরে তদ্‌পরিবর্ত্তে টাকা বৃত্তিস্বরূপ পায় এইরূপ স্থলে বোর্ড অব রেভিনিউ বা বোর্ডের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের হুকুম লইয়া কালেক্টর বা কালেক্টরের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারী ঐ জমি দানের সন্দেহ হইলে এই আইন অনুযায়ী কার্য্য করিবেন। ঐ জমিদান অসিদ্ধ বলিয়া বিবেচনা করিলে বোর্ড টাকার বৃত্তি বন্ধ করিবেন এবং বিচারালয়ে বোর্ডের হুকুমের বিরুদ্ধে নালিশ চলিতে পারিবে কিন্তু সকৌন্সিল গবর্ণর জেনারলের হুকুমানুযায়ী ১২ বৎসর বা ততোধিক কালের দখল টাকা-বৃত্তি ঐরূপে বাজেয়াপ্ত হইবে না। দশশালা বন্দোবস্তের অন্তর্গত পতিত জমি পরে আবাদ হইলে তাহার জন্য ভূস্বামী অতিরিক্ত কর দিবেন না। ঐরূপ জমির কর ধার্য্য করিলে আদালতে নালিশ চলিবে। দশশালা বন্দোবস্তের অন্তর্গত কোনও জমির ভুল বা জুয়াচুরি বা অন্য কোনও অজুহাতে অতিরিক্ত খাজানা ধার্য্যের কার্য্য সম্পূর্ণ বেআইনি ও অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে।

# রাজা রামচন্দ্র খাঁ।

দুই বৎসরেও অধিক অতীত হইল 'অবসর' নামক মাসিক পত্রিকায় রাজা রামচন্দ্র খাঁ শীর্ষক একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ দেখিয়াছিলাম। প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বি, এ, মহাশয় পরিচিত সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলিয়া তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি আছে। আমার মাতৃ-ভূমি চন্দনপুরের সন্নিকটেই রাজা রামচন্দ্র খাঁর আবাস ছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষ আজি পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। চারু বাবু একজন শিক্ষিত প্রত্নতত্ত্বাভিজ্ঞ সুলেখক হইয়াও যে রাজা রামচন্দ্র খাঁর কাল নির্ণয় করিতে বিষম ভুল করিয়াছেন, আমি তাহার প্রতিবাদ 'অবসর' পত্রিকার জন্য লিখিয়াছিলাম, কিন্তু দুঃখের বিষয় পত্রিকার তিন সংখ্যা প্রকাশিত হইতে না হইতেই কাগজখানি বন্ধ হইয়া গেল। আমার এতদ্বিষয়ক সিদ্ধান্ত এখন প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিলাম। প্রাচীন বৈষ্ণবগ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া এই প্রবন্ধলেখা হইয়াছে। যেখানে চারুবাবুর উক্তি উদ্ধৃত না করিলে প্রবন্ধ বিশদ হয় না, কেবল সেইস্থলে চারুবাবুর প্রবন্ধের কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়াছি।

বাঙ্গলার পাঠান রাজা আলাদিন হুসেনসাহের রাজত্বকালে ও তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে আমরা মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গে রাজা মুকুট রায়, চন্দ্রকেতু প্রভৃতি কয়েকটি প্রায় স্বাধীন হিন্দুরাজার অস্তিত্ব দেখিতে পাই। রাজা রামচন্দ্র খাঁ তাঁহাদেরই সমসাময়িক একজন তদ্রূপ স্বাধীন হিন্দুরাজা ছিলেন। কিন্তু চারুবাবু কেবলমাত্র প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া ষোড়শ শতাব্দীর নরপতিকে একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আনিয়া ফেলিয়াছেন। রাজা রামচন্দ্র খাঁ যশোহর জেলার অতীত গৌরব ও শৌর্য্যবীর্য্যের একটি প্রধান নিদর্শন। তিনি সে সময়ের একজন প্রখ্যাত ভূপতি ছিলেন। বেণাপোলের ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে আজ পর্য্যন্ত রাজা রামচন্দ্র খাঁর রাজপ্রাসাদ ও সংকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। এত বড় একজন প্রাচীন হিন্দু রাজার রাজত্বকাল নির্ণীত হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। সে সময়ের প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারগণ মুসলমান রাজাকে সামান্য কিছু কর দিয়াই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে পারিতেন। চারু বাবু বলিয়াছেন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বেণাপোল একটি সমৃদ্ধিশালী পল্লী ছিল। রাজা রামচন্দ্র খাঁ বেণাপোলের একজন প্রবলপ্রতাপ ভূম্যধিকারী ছিলেন। রামচন্দ্র খাঁ জাতিতে ব্রাহ্মণ। তাঁহার সময়ে মারহাট্টা ও মগদিগের অত্যাচারে দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গ প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। মারহাট্টাগণ গঙ্গাপার হইয়া দক্ষিণে টাকী লুণ্ঠন করিয়া যশোহর নগরের নানাস্থান লুট করিতে আরম্ভ করে; রাজা রামচন্দ্র প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও প্রজারক্ষণে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বাঙ্গালা,

বেহার, উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দী খাঁ যাহাদিগকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই, সামান্য একজন ভূমাধিকারী তাহাদিগকে সহজে শাসন করিতে পারিবেন তাহা সম্ভবপর নহে। একে মারহাট্টাদিগের উৎপাতে তিনি ব্যতিব্যস্ত, তাহার উপর আবার মগদস্যুগণ বড়ই উপদ্রব আরম্ভ করিল। ব্রাহ্মণদিগের জাতিনাশ করিতে ব্রাহ্মণকন্যা বলপূর্ব্বক বিবাহ করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ হইত না। তৎকালে কামান বন্দুকের প্রচলন না থাকিলেও লাঠি তরবারির বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। রাজা রামচন্দ্র খাঁ লাঠি, সড়কি খেলায় বিলক্ষণ পারদর্শী ছিলেন। সে সময়ের তিনি একজন প্রধান যোদ্ধা। প্রতাপের জায়গীর চাঁদখালী তখন রাজা রামচন্দ্রের হস্তে আসিয়াছে। রামচন্দ্র যখন শুনিলেন যে মগদস্যুগণ চাঁদখালী লুণ্ঠন করিতে আসিতেছে, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া সৈন্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। মগদিগের সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল। অবশেষে রামচন্দ্র জয়লাভ করিলেন। তিনি চাঁদখালীতে একপক্ষ কাল অবস্থিতি করতঃ আবশ্যকীয় বন্দোবস্তাদি করিয়া রাজধানী বেণেপোলে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার বিজয়ী ক্লান্ত সেনার অধিকাংশই প্রাপ্য গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান করিল। গৃহে প্রত্যাগত হইবার পর দিবসই তিনি অবগত হইলেন, মারহাট্টা দস্যুগণ শ্রীনগর লুটিয়া ক্রমে তাঁহার রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইতেছে। রামচন্দ্র আর কালবিলম্ব না করিয়া ইচ্ছামতী তীরে যথাসম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মারহাট্টাদিগকে বাধা দিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তিনি দস্যুদিগের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন। ইচ্ছামতীর ২।৩ ক্রোশ পূর্ব্বে বেণাপোলে তাঁহার রাজধানী। বেণাপোলের যাবদীয় পৌরজন রাজার পরাজয় বার্ত্তা অবগত হইয়া ধনসম্পত্তি লইয়া নগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিল; কেহই একবার রাজার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। রামচন্দ্র মনক্ষোভে অগত্যা মারহাট্টাদিগের হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সপরিবারে পাতনাজে প্রবেশ করিলেন। একজন ভৃত্য বাহির হইতে পাতনাজ বন্ধ করিয়া লুকাইয়া রহিল। মারহাট্টা দস্যুদিগের লুণ্ঠন কার্য্য শেষ হইয়াছে বুঝিয়া বিশ্বস্ত ভৃত্য প্রভুকে সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য বংশীরব অবগত হইয়া বংশীবাদকের অনুসন্ধান আরম্ভ করিল, অবশেষে তাহাকে হত্যা করিয়া চলিয়া গেল। রাজা রামচন্দ্র আর পাতনাজ হইতে উঠিতে পারিলেন না, সপরিবারে তাঁহার জীবন্ত কবর হইয়া গেল।

শ্রদ্ধাস্পদ চারুবাবু রাজা রামচন্দ্রের অভ্যুত্থান ও দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সত্য ও স্থানীয় জনপ্রবাদের সহিত মিল হয়। রাজা রামচন্দ্র সম্বন্ধে আর নূতন কিছু অনুসন্ধানে পাওয়া যায় না। কিন্তু এক্ষণে দেখা যাউক রাজা রামচন্দ্র মারহাট্টাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, না কেবল মগদস্যুদলের সহিত যুদ্ধ করিয়া অসাধারণ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন; তিনি যশোহরের প্রতাপাদিত্যের রাজধানী চাঁদখালীর মালিক হইয়াছিলেন, না তাঁহার রাজত্বের ধ্বংসের পর প্রতাপের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল? তিনি অষ্টাদশ

শতাব্দীর রাজা ছিলেন, না ষোড়শ শতাব্দীর স্বাধীন হিন্দু রাজা! আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখিতে পাই রাজা রামচন্দ্র খাঁ অদ্বৈত প্রভুর সমসাময়িক। আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বিবৃত বৃত্তান্তের সত্যতায় সন্দিহান হইবার কোনই কারণ দেখিতে পাই না। যখন চৈতন্যচরিতামৃতের সমস্ত ঘটনাগুলিই ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতেছে তখন কেবল রাজা রামচন্দ্রের বিবরণকেই অনৈতিকহাসিক বলিতে গেলে তাহা নিতান্তই স্বেচ্ছাচার হয়। শ্রদ্ধাস্পদ চারুবাবু বলিয়াছেন, "রাজা রামচন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার গুড় উপাধি ছিল, তাঁহার জ্ঞাতি বংশ এখনও অনেক স্থানে আছেন," কিন্তু তিনি জ্ঞাতি-বংশের একটিরও নাম করেন নাই। রাজা রামচন্দ্র বেনাপোলের নিকটবর্ত্তী গদখালির ব্রাহ্মণ বংশের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন; গদখালির ব্রাহ্মণগণ এখনও রাজা রামচন্দ্রের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী আছে, সে সমস্ত ভিত্তিহীন কথার অবতারণা করিয়া প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা অনাবশ্যক। চারুবাবু রামচন্দ্রের মৃত্যু সম্বন্ধে যে প্রবাদের অবতারণা করিয়াছেন তাহা ঠিক নহে। বোধ হয় তিনি কেবলমাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়াই রাজা রামচন্দ্র খাঁর কাল নির্ণয়ে অযথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজা রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর হইতে নিম্নলিখিত একটি ছড়ার প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায়—

চাকলা হলো মগের মুলুক গেল রসাতল,
মাল্লে তারা রামরাজারে রাখবে কে আর বল!
কেনোরে বাঁশী রাতবেরাতে গাছের উপর বাজে
যায় না কেও রাস্তা দিয়ে কচিৎ কোন কাজে॥

এই প্রাচীন ছড়াটির উপর নির্ভর করিয়া স্থানীয় জনশ্রুতি অবলম্বন করিলে চৈতন্য-চরিতামৃতের উক্তির সহিত প্রায়ই সামঞ্জস্য থাকে। ছড়ার সহিত প্রবাদের সম্পূর্ণ মিল রহিয়াছে। রাজা রামচন্দ্র দস্যুদিগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার জন্য পাতাল-গৃহে সপরিবারে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য কালাচাঁদের নিকট পাতনাজের চাবি ছিল। কালাচাঁদ দেবদারু গাছের উপর লুকাইয়াছিল, মগদস্যুগণ পলায়ন করিয়াছে অনুমান করিয়া প্রভুকে সংবাদ দিবার অভি-প্রায়ে বাঁশী বাজায় তখনও দস্যুগণ সকলে রাজবাটী পরিত্যাগ করে নাই। তাহারা রাজবাটীতে লোক লুকাইয়া আছে বুঝিতে পারিয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। কালাচাঁদ উচ্চ বৃক্ষ হইতে খিড়কীর পুষ্করিণীতে লম্ফ দিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিল। কালাচাঁদ আর উঠিল না, রাজা রামচন্দ্রেরও সপরিবারে জীবন্ত সমাধি হইল। শুনিতে পাওয়া যায় দস্যুগণ পলায়ন করিলে কালা-চাঁদের মাতা রাজার চা'লধোয়া পুষ্করিণীর ধারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইত, সেই জন্য কালু তাহার মাতাকে স্বপ্ন দেখায় যে, মা আমি আর উঠিতে পারিব না, তোমার কান্নায় আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছে. তুমি প্রতিদিন প্রাতে ভাত লইয়া পুষ্করিণীর ধারে গিয়া পিছনে ফিরাইয়া বসিও আমি আসিয়া তোমার প্রস্তুত অন্ন আহার করিয়া যাইব। আর রাজ পরিবারের পাতনাজের চাবি আমার কাছে আছে সেই চাবিটি তোমার কাছে দিব,' তুমি পাতনাজের চাবি খুলিয়া দিও আমি বড় পাপ কাজ করিয়াছি, রাজ পরিবার উদ্ধার

না হইলে আমার মুক্তি হইবে না। কিন্তু মা তুমি খুব সাবধানে পিছন ফিরাইয়া বসিও, যেন প্রাণান্তেও আমার দিকে ফিরিয়া চাহিও না. তাহা হইলে আর আমার সাক্ষাৎ পাইবে না। পর দিবস কালুর মাতা অন্নব্যঞ্জন লইয়া যথাস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল, কালুও পুকুর হইতে উঠিয়া আহার করিতে বসিল। কালা চাঁদের মাতা অপত্যস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া কালাচাঁদের কথা না শুনিয়া যেমন একমুহুর্ত্তের জন্য পুত্রকে দেখিবার জন্য মুখ ফিরাইল, কালাচাঁদও অমনি জন্মের মত জলে ঝাঁপ দিল, আর কখনও ফিরিয়া উঠিল না। কালা-চাঁদের মাতা চাবিও পাইলেন না; রাজা রাম-চন্দ্র পরিবার সহ মাটিতেই মিশিয়া গেলেন, আর তাহার অনুসন্ধান হইল না। মধ্যে মধ্যে কালাচাঁদের বংশীধ্বনি রাজবাটী হইতে শুনিতে পাওয়া যাইত দিনমানেও কেহ বাজবাটীর পথ দিয়া হাঁটিত না। এই প্রকারে রাজা রাম-চন্দ্রের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছিল। এক্ষণে রাজা রামচন্দ্র যদি মারহাট্টা দস্যুদিগের ভয়ে না হইয়া মগ দস্যুদিগের ভয়ে পাতালগৃহে প্রবেশ করিয়া থাকেন ত তাঁহার মৃত্যু ষোড়শ শতাব্দীতে ঘটিতে পারে, কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবাব অলিবর্দ্দীর আমলেই আমরা মারহাট্টাদিগকে এদেশে দেখিতে পাই, তাহার পূর্ব্বে তাহাদিগকে বাঙ্গালা মুলুকে দেখিতে পাই না। আরাকাণ রাজ্যের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীর কিছু পূর্ব্বে মগদস্যুগণ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে লুঠ তরাজ করিত। অতএব রাজা রামচন্দ্র ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে যদি মগদস্যুগণের উৎপাতেই প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন তাহা হইলে চৈতন্য-চরিতামৃতের চলিত প্রবাদের সহিত সামঞ্জস্য থাকে। রাজা রামচন্দ্রের মগদস্যুকর্ত্তৃক পরাভব ও মৃত্যু সম্ভবপর ও সমীচীন বলিয়া অনুমান হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও তাঁহার মৃত্যুটা কিছু অস্পষ্ট রহিয়াছে। এক্ষণে দেখা যাউক চরিতামৃত রামচন্দ্রকে কোন্ সময়ের রাজা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বলিতেছেন—

* * *

হরিদাস যবে নিজ গৃহ ত্যাগ কৈলা।
বেণাপোলের বন মধ্যে কথোদিন রহিলা॥
নির্জ্জন বনে কুটীর করি তুলসী সেবন।
রাত্রি দিনে তিন লক্ষ নাম সংকীর্ত্তন॥
ব্রাহ্মণের ঘরে করে ভিক্ষা নির্ব্বাহণ।
প্রভাবে সকল লোক করয়ে পূজন॥
সেই দেশাধ্যক্ষ—নাম রামচন্দ্র খান।
বৈষ্ণব বিদ্বেষী সেই পাষাণ্ডি-প্রধান॥
হরিদাসে লোকের পূজা সহিতে না পারে।
তার অপমান করিতে নানা উপায় করে॥
কোন প্রকারে হরিদাসের ছিদ্র নাহি পায়।
বেশ্যাগণ আনি করে ছিদ্রের উপায়॥
বেশ্যাগণে কহে এই বৈরাগী হরিদাস।
তুমি সব কর ইহার বৈরাগ্যধর্ম্ম নাশ॥

* * * *

হরিদাসের মহিমা কহে করি নমস্কার॥
রামচন্দ্র খান অপরাধ বীজরুইল।
সেই বীজ বৃক্ষ হঞা আগেতে ফলিল॥
মহদপরাধের ফল অদ্ভুত কথন।
প্রস্তাব পাইয়া কহি, শুন ভক্তগণ॥
সহজেই অবৈষ্ণব রামচন্দ্র খান।
হরিদাসের অপরাধে হৈল অসুর সমান॥
বৈষ্ণব ধর্ম্ম নিন্দা করে বৈষ্ণব অপমান।

বহুদিনের অপরাধে পাইল পরিণাম॥
নিত্যানন্দ গোসাঞি যবে গৌড়ে আইলা।
প্রেম প্রচারিতে তবে ভ্রমিতে লাগিলা॥
প্রেম প্রচারণ আর পাষণ্ড দলন।
দুই কার্য্যে অবধূত করেন ভ্রমণ॥
সর্ব্বজ্ঞ নিত্যানন্দ আইল তার ঘরে।
আসিয়া বসিলা দুর্গামণ্ডপ উপরে॥
অনেক লোক জন সঙ্গে—অঙ্গন ভরিল।
ভিতর হইতে রামচন্দ্র সেবক পাঠাইল॥
সেবক কহে গোসাঞি। মোরে পাঠাইল খান।
গৃহস্থের ঘরে তোমায় দিব বাসস্থান॥
গোয়ালের ঘরে গোযালি সে অত্যন্ত বিস্তার।
ইহাঁ সঙ্কীর্ণ স্থান, তোমার মনুষ্য অপার॥
ভিতরে আছিল শুনি ক্রোধে বাহির হৈলা।
অট্ট অট্ট হাসি গোসাঞি কহিতে লাগিলা॥
সত্য কহে—এই ঘর মোর যোগ্য নয়।
ম্লেচ্ছ গো-বধ করে তার যোগ্য হয়॥
এত বলি ক্রোধে গোসাঞি উঠিয়া চলিলা।
তারে দণ্ড করিতে সেই গ্রামে না রহিলা॥
ইহাঁ রামচন্দ্র খান সেবকে আজ্ঞা দিল।
গোসাঞি যাহাঁ বসিলা, তাহাঁ মাটি খোদাইল॥
গোময় জলে লেপিল সব মন্দির অঙ্গন।
তভু রামচন্দ্রের মন না হৈল প্রসন্ন॥
দস্যুবৃত্তি করে রামচন্দ্র না দেয় রাজকর।
ক্রুদ্ধ হঞা ম্লেচ্ছ উজীর আইল তার ঘর॥
আসি সেই দুর্গা মণ্ডপে বাসা কৈল।
অবধ্য বধ করি মাংস সে-ঘরে রান্ধাইল॥
স্ত্রী পুত্র সহিতে রামচন্দ্রেরে বান্ধিয়া।
তার ঘর গ্রাম লুটে তিন দিন রহিয়া॥
সেই ঘরে তিন দিন করে অমেধ্য-রন্ধন
আর দিন সভা লঞা করিল গমন॥
জাতি-ধন-জন খানের সব নষ্ট হৈল।
বহুদিন পর্য্যন্ত গ্রাম উজাড় রহিল॥
মহান্তের অপমান যেই গ্রামে দেশে হয়।
একজনের দোষে সব দেশ ক্ষয় হয়॥

সে সময়ে গৌড়ের পাঠান রাজা ছিলেন হুসেন সাহের পুত্র নাসিরৎ সাহ। নাসিরৎ সাহের ম্লেচ্ছ উজীর আসিয়া স্ত্রী পুত্র সমেত রাজা রামচন্দ্রকে বান্ধিয়া তিন দিন গ্রাম লুট করিল এবং রাজ বাটীতে অমেধ্য রন্ধন করিল। তিন দিন পরে উজীর সভাভঙ্গ করিয়া রাজবাটী পরিত্যাগ করিয়া গেল, রাজার ধনজন জাতি নষ্ট হইল, নগর জনশূন্য হইল, কিন্তু উজীর রাজাকে সপরিবারে হত্যা করিয়া গেল কি না তাহা আমরা জানিতে পারিলাম না। রাজা রামচন্দ্র যে ষোড়শ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাতে আর সন্দেহ থাকিল না। এক্ষণে যদি কালাচাঁদ ভৃত্য-ঘটিত প্রবাদটির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আমরা দেখিতে পাই যে গৌড়রাজের উজির কর্ত্তৃক রাজা রামচন্দ্রের নগর লুণ্ঠিত হইয়াছে, রাজা সহায় সম্পদ সৈন্য সামন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছেন এই কথা রাষ্ট্র হওয়ায় জানিতে পারিয়া মগ দস্যুগণ তাহাদের পূর্ব্ব যুদ্ধে বিজয়ী যোদ্ধা রামচন্দ্রকে বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া রাজার নগর আক্রমণ করিয়াছিল; আর এদিকে ধনজন সহায় সম্পদ হীন, অনুতপ্ত, অপমানিত রাজা রামচন্দ্রও স্ত্রী পরিবারের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিবার জন্য সন্তান সন্ততি সমভিব্যাহারে পাতনাজে প্রবেশ করিয়া ভৃত্য কালাচাঁদের নিকট পাতনাজের চাবি রাখিয়া জন্মের মত জীবন্ত সমাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি যে ষোড়শ

শতাব্দীর ব্রাহ্মণ রাজা ছিলেন ও তাঁহার অধঃপতন সম্বন্ধে প্রাচীন ছড়ার সহিত ঐক্য জনশ্রুতিটাই সত্য, সে বিষয়ে আর কোনও সংশয় জন্মিতে পারে না। যশোহরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের অভ্যুত্থানের কিছু পূর্ব্বে মধ্যবঙ্গে যে সমস্ত স্বাধীন হিন্দুরাজা ও মুসলমান পীরের প্রভুত্বের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা পরে লিখিবার বাসনা রহিল।

---

# উদ্ভিদতত্ত্ব।

( ১ )

## উদ্ভিদের আহার ও পরিপাক ক্রিয়া।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে আহার পান নিদ্রা প্রভৃতি স্বাভাবিক ক্রিয়াসকল উদ্ভিদ আমাদেরই ন্যায় প্রতিনিয়ত সাধন করিতেছে। কেবল প্রণালী বিভিন্নমাত্র। উদ্ভিদের বায়বীয় আহার গ্রহণ করিবার শক্তি আছে সুতরাং তাহার তদনুরূপ ইন্দ্রিয়ও বর্ত্তমান। একস্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া উদ্ভিদকে চতুর্দ্দিক হইতে ভোজ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হয়, সুতরাং চতুর্দ্দিকেই তাহার ভোজনেন্দ্রিয় বর্ত্তমান। উদ্ভিদের পত্রকেই আমরা তাহার ভোজনেন্দ্রিয় বা মুখ মনে করিব।

উদ্ভিদের আহার্য্য কি? কিরূপে উদ্ভিদ স্বীয় আহার সংগ্রহ করে ও কিরূপে তাহার পরিপাক ক্রিয়া সাধিত হইয়া উদ্ভিদের কলেবর পুষ্ট হয়, ইহাই আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করিব।

উদ্ভিদের যে আহারের আবশ্যকতা আছে, আহার ব্যতিরেকে উদ্ভিদ যে জীবিত থাকিতে পারে না—একথা কাহারও অবিদিত নহে। যে কোন উদ্ভিদকে সমূল উৎপাটিত করিয়া কিছুদিন রাখিয়া দিলেই দেখিতে পাওয়া যাইবে যে তাহার জীবলীলা সাঙ্গ হইয়াছে। Orchid পরগাছা নামক এক প্রকার উদ্ভিদ অনেকে গৃহে রজ্জুতে লম্ববান থাকিয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করে। উক্ত Orchid যদিও ভূমিতে সংলগ্ন থাকে না, ও ভূমি হইতে কোন আহার্য্য পদার্থ গ্রহণ করে না, তথাপি পত্রের সাহায্যে বায়ু হইতে যে কার্ব্বন সংগ্রহ করে তাহাতেই সে জীবিত থাকিতে পারে।

যে কোন উদ্ভিদকে দগ্ধ করিলে তাহার জলীয় অংশ প্রথমতঃ বাষ্পাকারে বহির্গত হইয়া যায়। পরে শুষ্ক অংশ কতক কয়লা, কতক ভস্মে পরিণত হইয়া থাকে। সমগ্র কয়লা অংশ উদ্ভিদের পত্রদ্বারা ভুক্ত কার্ব্বন ব্যতীত আর কিছুই নয়। যে ভস্ম অবশিষ্ট থাকে তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে

তাহাতে Ammonia, Sulphur, Silicon, Iron প্রভৃতি ধাতব পদার্থ সকল বিদ্যমান। এইগুলি উদ্ভিদ মূল দ্বারা আকর্ষণ করে। বৃষ্টি হইলে এই সকল পদার্থ দ্রব হয়। উদ্ভিদের মূলের অন্তর্গত কোষ ( Cell ) সমূহের মধ্যে এই দ্রব পদার্থ প্রবেশ করে—পরে এক কোষ হইতে অন্য কোষে প্রবিষ্ট হইয়া কাণ্ডের নিম্নাংশে উপনীত হইয়া থাকে। কাণ্ডের মধ্যে বিবিধ শিরা (Vessels) সকল বর্ত্তমান। এই সকল শিরাদ্বারা জলীয় অংশ উদ্ভিদের সর্ব্বাঙ্গে নীত হইয়া পত্রের অন্তর্গত কোষ মধ্যে অবশেষে উপস্থিত হয়। বায়ু হইতে গৃহীত কার্ব্বন ও অম্লজান পত্রের কোষমধ্যে ঐ সকল জলীয় পদার্থের সহিত রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করে। শ্বেতসার ( Starch ), শর্করা ( Sugar ), অ্যালবুমেন ( Albumen ), ক্ষার পদার্থ ( Alkaloid ), চর্ব্বি ( Fat ), তৈল ( Oil ) প্রভৃতি পদার্থ সকল এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত হইয়া উদ্ভিদের পুষ্টিসাধন করে। আমরাও উদ্ভিদের নিকট ঐ সকল পদার্থ গ্রহণ করিয়া আমাদের আহারক্রিয়া সাধন করি। উদ্ভিদ যদি স্বীয় প্রয়োজন সাধন উদ্দেশ্যে এই সকল পদার্থ সৃষ্টি না করিত তাহা হইলে আমরা আমাদের আহার্য্য এত অনায়াসে লাভ করিতে পারিতাম না।

উদ্ভিদের আহার্য্য দ্রব্য যে সকল মূল পদার্থ লইয়া গঠিত তাহাদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বায়ু হইতে পত্র সাহায্যে গৃহীত।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Carbon | বায়বীয়। |
| 2. | Oxygen | |

ভূমি হইতে মূলদ্বারা গৃহীত।

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Hydrogen | বায়বীয়। |
| 2. | Nitrogen | |
| 3. | Sulphur | ধাতব। |
| 4. | Iron | |
| 5. | Potassium | |
| 6. | Calcium | |
| 7. | Phospherous | |
| 1. | Manganese | বায়বীয়। |
| 2. | Ammonia &c. | |

উদ্ভিদের পত্রে আমাদের লোমকূপের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম অসংখ্য ছিদ্র ( Stomalta ) বর্ত্তমান। এই সকল ছিদ্র দ্বারা উদ্ভিদ বায়ু হইতে বায়ুর অন্যতম উপাদান Carbonic acid gas ( $Co_2$ ) বা দ্বায়াঙ্গারকজন গ্রহণ করে। Carbon অঙ্গারজন ও Oxygen অম্লজন উভয় পদার্থের সংমিশ্রণে এই পদার্থ উৎপন্ন হয়। বায়ুতে Carbonic Acid gas-এর ভাগ অতি অল্প। অথচ জগতে উদ্ভিদের সংখ্যা অত্যধিক। সুতরাং অনেকে মনে করিতে পারেন যে, এই অত্যাবশ্যক পদার্থ কিরূপে সকল উদ্ভিদ প্রাপ্ত হয়। উদ্ভিদ একপক্ষে যেমন Carbonic acid gas শোষণ করিয়া লয় সেইরূপ আবার শ্বাসকার্য্যের দ্বারা এই পদার্থ ত্যাগ করিয়া থাকে। মনুষ্য প্রভৃতি যাবতীয় জন্তুও প্রশ্বাসের সহিত অনবরত Carbonic acid gas ত্যাগ করিতেছে। এতদ্ব্যতীত কোন পদার্থ দগ্ধীভূত হইবার সময়ও এই পদার্থ উৎপন্ন হইয়া বায়ুতে আসিয়া মিলিত হয়। সুতরাং Carbonic acid gas-এর অল্পতা হেতু উদ্ভিদের কোন ক্ষতি হয় না। Hydrogen বা উদজন-উদ্ভিদ মূল দ্বারা যে জল গ্রহণ করে তাহা Hydrogen ও Oxygen সংমিশ্রণে উৎপন্ন ( $H_2o$ ) সুতরাং

জলগ্রহণ কালেই Hydrogen উদ্ভিদের উদরসাৎ হয়। Nitrogen বা যবক্ষারজন, বায়ুতে যথেষ্ট পরিমাণে এই পদার্থ মিশ্রিত থাকিলেও উদ্ভিদ বায়ু হইতে ইহা গ্রহণ করে না। নানাবিধ ক্ষার পদার্থ ( Nitrates ) Nitrogen লইয়া গঠিত। এই সকল ক্ষার পদার্থ উদ্ভিদ মূলদ্বারা গ্রহণ করিয়া Nitrogen-এর অভাব পূরণ করে। Bacteria নামক এক প্রকার জীব কোন কোন উদ্ভিদের মূলদেশে সংলগ্ন থাকে। ইহারা বায়ু হইতে Nitrogen বিশ্লেষ করিয়া লইতে পারে। ইহাদের নিকট উদ্ভিদ Nitrogen প্রাপ্ত হয়।

কোন কোন উদ্ভিদ মাংসাশী। এক প্রকার উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের পত্রে এক প্রকার আটাল পদার্থ থাকে। কোন পতঙ্গ তাহাতে উপবেশন করিলে আর পলায়ন করিতে পারে না, সেই স্থানেই ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আফ্রিকা দেশে এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মে; ইহারা বৃহত্তর জন্তুকেও উদরসাৎ করিতে পারে। এই সকল প্রাণীদেহ হইতে এই সকল উদ্ভিদ nitrogen প্রাপ্ত হয়।

Potassium—এই পদার্থ প্রায় উদ্ভিদেরই অতি প্রয়োজনীয় খাদ্য। প্রায় সমস্ত উদ্ভিদেরই পত্রান্তর্গত শিরা সকল ( Vessels ) এই পদার্থে পরিপূর্ণ। ভূমিতে Potassium nitrate বা যবক্ষার নামক এক প্রকার ধাতব পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই পদার্থ Potassium ও nitrogen উভয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন।

উদ্ভিদে যে সকল প্রাণিজ সার ( animal manures ) দেওয়া হয় তাহার অধিকাংশে ammonia যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। ইহা হইতে উদ্ভিদ ammonia প্রাপ্ত হয়। সমুদ্রতীরবর্ত্তী উদ্ভিদসমূহে Sodium-এর অংশ দেখিতে পাওয়া যায়।*

আমরা অনেক উদ্ভিদে চূণ সার দিয়া থাকি। চূণ Calcium Hydrate ca $(Ho_2)$ ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং সেই সকল উদ্ভিদ এইরূপে Calcium প্রাপ্ত হয়। আহার্য্য পস্তুত ( assimilation ) কার্য্যে উদ্ভিদের সূর্য্যালোক ও উত্তাপের প্রয়োজনীয়তা। কোন পদার্থ দীর্ঘকাল কোন আবরণ দ্বারা আবৃত থাকিলে শ্বেতবর্ণ হইয়া যায়। ইহার কারণ আলোক অভাবে উদ্ভিদের chlorophyll জন্মাইয়া কার্য্য করিতে পারে না। এই chlorophyll সূর্য্যালোক হইতে এক অদ্ভুত শক্তি ( Energy ) প্রাপ্ত হয়। সেই শক্তির বলে বায়ু হইতে গৃহীত কার্ব্বনিক য়্যাসিড গ্যাস ( $Co_2$ ) জলীয় পদার্থের সহিত ( $H_2o$ ) নানাবিধ মিশ্র পদার্থের সৃষ্টি করে। এই মিশ্র পদার্থগুলি Carbo Hydrate নামে সচরাচর উক্ত হয়। শ্বেতসার (starch $c_6H_{10}O_5$) শর্করা ( $cH_2o$ বা $c_{12}H_{22}o_{11}$ ) প্রভৃতি পদার্থ Carbo Hydrate এর অন্তর্গত। সূর্য্যালোক প্রাপ্ত হইলে উদ্ভিদের অভ্যন্তরে এই সকল

* উদ্ভিদের সমগ্র দেহ যে সকল কোষ বা cell লইয়া গঠিত সেই সকল কোষ মধ্যে Chlorophyll নামক এক প্রকার দ্রব্য থাকে। সূর্য্যালোকের প্রভাবে ভূমি হইতে গৃহীত লৌহাংশ উদ্ভিদের কোষ মধ্যে এই পদার্থের সৃষ্টি করে। এই Chlorophyll উদ্ভিদকে মনোরম হরিৎ ভূষায় ভূষিত করে।

রাসায়নিক ক্রিয়া সংসাধিত হয়। সুতরাং দিবাভাগে এই সকল প্রক্রিয়া দ্বারা উদ্ভিদের আহারক্রিয়া সাধিত হইয়া রাত্রিকালে সে বিশ্রামের অবসর লাভ করে।

উপরোক্ত Carbo Hydrate পদার্থের সহিত গন্ধক Sulphur ও যবক্ষারজান nitrogen মিশ্রিত হইলে albumen proteid প্রভৃতি পদার্থ সকলও সৃষ্ট হয়।

Starch বা শ্বেতসার জলে দ্রব হয় না, অথচ দ্রবীভূত না হইলেও পত্রান্তর্গত cell হইতে অন্য cellয়ে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। সুতরাং Diastse নামক এক প্রকার পদার্থ দ্বারা এই শ্বেতসার শর্করায় পরিণত হয় ও পরে দ্রবীভূত শর্করা উদ্ভিদের প্রতি অঙ্গে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে।

আহার সংগ্রহ ও পরিপাক বিষয়ে আলোকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়, সেই হেতু উদ্ভিদের প্রতি শাখা প্রশাখা পল্লব যে দিকে সামান্য মাত্র আলোক প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে সেই দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্সের এক অংশে একটি উদ্ভিদ রোপণ করিয়া যদি সেই বাক্সের এক পার্শ্বে একটি ছিদ্র রাখা যায় তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ঐ উদ্ভিদের শাখা প্রশাখা গুলি সেই ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসিতেছে। উদ্ভিদের শাখা প্রশাখা ও পল্লবে আকৃতিগত যে বৈষম্য দেখা যায়, সমপরিমাণে আলোক না পাওয়াই তাহার একমাত্র কারণ। যে অংশ একেবারেই আলোক না পায় সে অংশ অচিরে শুষ্ক হইয়া যায়।

আলোকের ন্যায় উত্তাপও আহার্য্য পরিপাক বিষয়ে সহায়তা করে। শীতকালে উদ্ভিদ পত্রাদিশূন্য হইয়া দীন ভাবে কালযাপন করে। বসন্ত সমাগমে যখন সূর্য্যকিরণ ঈষৎ প্রখর হয় তখনই আবার নবকিশলয়দামে সুশোভিত হইয়া মানবনয়নের তৃপ্তিসাধন করে।

আলোক ও উত্তাপ লাভের প্রাণপণ চেষ্টা অনেক স্থলে আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। কোন কোন উদ্ভিদ দেখা যায়, অন্য উদ্ভিদের উপর আরোহণ করিয়া স্বীয় প্রয়োজন উপযোগী আলোক ও উত্তাপ সংগ্রহ করে। কোন খর্জ্জুর বৃক্ষের তলে বট বা পাকুড় প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মিলে তাহারা অচিরে উক্ত খর্জ্জুর বৃক্ষকে আয়ত্ত করিয়া তাহার উপর আরোহণ করে।

উদ্ভিদ যে কোন আহার গ্রহণ ও তাহা পরিপাক করিয়াই ক্ষান্ত হয় তাহা নহে ভবিষ্যতের নিমিত্ত ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া রাখে। বীজ বা কাণ্ডের নিম্ন প্রদেশে শ্বেতসার ইত্যাদি যে সকল পদার্থ সঞ্চিত থাকে তাহাই উদ্ভিদের ভবিষ্যৎ খাদ্য। অনেক বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, শীতকালে সম্পূর্ণ পত্রশূন্য হয়। সুতরাং কার্ব্বন গ্রহণের মুখ্য উপায় তখন তাহাদের থাকে না, সেই সময় উদ্ভিদ পূর্ব্বের সঞ্চিত কার্ব্বনে পরিপুষ্ট হয়। কোন সুপক্ক বীজ আর্দ্র অবস্থা প্রাপ্ত হইলেই অঙ্কুরিত হয়। মৃত্তিকায় প্রোথিত না হইলেও কয়েক দিন যাবৎ তাহারা জীবিত থাকে। সেই সময় তাহারা পূর্ব্বের সঞ্চিত খাদ্যে পুষ্ট হইয়া থাকে।

একক্ষণে আমরা দেখিলাম উদ্ভিদ পত্র ও মূল সাহায্যে আহার্য্যের উপাদান সকল সংগ্রহ

করিয়া আহার্য্য বস্তু সৃষ্টি করে। পরে আলোক ও উত্তাপ সাহায্যে সেই সকল আহার্য্য পদার্থ সম্পূর্ণ পরিপাক করিয়া পুষ্ট হইয়া থাকে। দিবাভাগে এই সকল কার্য্য সমাধা হওয়ায় রাত্রিকালে ইহাদের কলেবর বর্দ্ধিত হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়।

---

## গ্রন্থ-সমালোচনা।

মুকুর। শ্রীরমণীমোহন ঘোষ প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ।

এই গীতি কবিতার পুস্তকের যখন দ্বিতীয় সংস্করণ। হইয়াছে তখন ইহা যে সাহিত্য সমাজে সমাদর লাভ করিয়াছে, এ কথা বলাই বাহুল্য। রমণীমোহন বাবুর কবিতার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা তাঁহার 'মঞ্জরীর' সমালোচনাতেই বলিয়াছি। তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন

রমণীবাবুর একটা বিশেষত্ব সকলের চক্ষেই পড়িবে—তাহা তাঁহার কবিতার পবিত্রতা। তাঁহার লিখিত কবিতায় অপরিস্ফুর্তি বা প্রচ্ছন্নতা দোষ আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ বাবুর শিষ্যানুশিষ্য নবীন কবিদিগের মধ্যে প্রচ্ছন্নতা দোষ বড়ই অধিক। কেবল রমণীবাবুর পুস্তকে সে দোষ দেখিলাম না। নমুনাস্বরূপ একটা কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

তোমারে যত দেখি
তৃষিত আঁখি তুলে'
ও রূপ মাধুরীতে
আপনা' যাই ভুলে'।
মধুর মুখ পানে
চাহিয়া থাকি যত
ততই নবশোভা
নিরখি অবিরত।
কি মোহমাখা ওই
নয়ন শতদল।
নিমেষে ভু'লে যাই
আকাশ ধরাতল।
নয়ন মুদি যদি,—
আঁধারে উঠে ফুটি'
অসীম স্নেহ ভরা
তোমারি আঁখি দুটি।
তোমারি মাঝে শুধু
আমারে পাই খুঁজি,
নহিলে আমি আর
কোথাও নাই বুঝি!
যতই করি ধ্যান,
তোমার নাহি কূল;

যেন গো তুমি ছাড়া
এ জগৎ শুধু ভুল।

সিদ্ধতত্ত্ব বা কর্ম্মপথ। শ্রীকুমুদিনী কান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৲ এক-টাকা।

পুস্তকখানি মোটের উপর উপাদেয় এবং শিক্ষাপ্রদ। যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং যে সকল নীতিসূত্র বিবৃত করা হইয়াছে তাহা প্রতিপালন করিলে জীবনে বাস্তবিকই সিদ্ধিলাভ হয়। এমন সুন্দর পুস্তকে ঐতিহাসিক অনভিজ্ঞতা থাকিলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। এই পুস্তকের ৩১ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "এবং গ্যারিবল্ডী যুক্তআমেরিকায় স্বাধীনতার বিজয়-নিশান উত্তোলিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন"। ইহার উপর অন্য বক্তব্য কিছু নাই, কেবল বাঙ্গলাসাহিত্যের পরিণামের জন্য কপালে করাঘাত করিয়া হা-হুতাশ করিতে হয়। শুধু ইঁহাদেরই বা দোষ দিতেছি কেন? একখানি লব্ধপ্রতিষ্ঠ মাসিকপত্রে একজন ভূপ্রদক্ষিণ-কারী লিখিয়াছেন, Loid Byron প্রণীত Last days of Pompeii. বাঙ্গলা সাহিত্য হইতে চলিল কি? যাহা হউক সমালোচ্য পুস্তকখানি পড়িয়া লোকে উপকৃত হইবে।

লোকশিক্ষার জন্য যে পুস্তক লিখিত হয় তাহাতে ভাষাগত অশিষ্টতা ও বর্ব্বরতা পরিহার করা কর্ত্তব্য। এই পুস্তকের ২২ পৃষ্ঠায় লেখা আছে, "রাজনৈতিক ক্ষেৎকোদ্লাইয়া।" ইহা কি বাঙ্গলা না ইংরাজী? শ্রীযুক্ত কুমুদিনী-কান্তবাবু ইচ্ছা করিলে কি এই সকল অপ-ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না? তথাপি পুস্তকখানি লোককে পড়িতে অনুরোধ করি।

বিক্রমপুরের ইতিহাস। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা মাত্র।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের নিকট বঙ্গদেশ ও বাঙ্গলা সাহিত্য ঋণী। যেমন বিক্রম-পুরের ইতিহাস লিখিত হইল, সেইরূপ আর সকল জেলার ইতিহাস লিখিত হইলে সমগ্র বঙ্গের একখানি সম্পূর্ণ ইতিহাস সঙ্কলনের পথ সুগম হয়। মোটের উপর পুস্তকখানি ভালই হইয়াছে। তবে স্থানে স্থানে অনেক অনাবশ্যক বিবরণও আছে। পরিজ্ঞাত এবং অপরিজ্ঞাত কতকগুলি ব্রাহ্মণপণ্ডিতের নামের তালিকা দিয়া যে কি লাভ তাহা বুঝিতে পারিলাম না। গ্রন্থকার একস্থলে লিখিতেছেন, "ইংলণ্ডের দাসত্ব প্রথার ভীষণত্ব "Uncle Tom's Cabin" নামক পুস্তক পাঠ করিলেই বিশেষরূপ অবগত হওয়া যায়।" যিনি এত বড় একখানি ইতিহাস লিখিবার উচ্চভিলাষ রাখেন, তিনি যে ইহা জানেন না যে, Uncle Tom's Cabin আমেরিকার কথা, ইংলণ্ডের কথা নহে, ইহা নিতান্ত শোচনীয় কথা। এমন দুই একটা ভুল থাকিলেও গ্রন্থকার আমা-দিগের ধন্যবাদের পাত্র। শ্রীমান্ অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গলার ইতিহাসের অনেক উপাদান প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানির যদি গুণ না থাকিত তাহা হইলে আমরা দোষ দেখাইবার পণ্ডশ্রম স্বীকার করিতাম না। গুণ আছে বলিয়াই দোষ দেখান প্রয়োজনীয় বোধ করিলাম। শুনিয়াছি যোগেন্দ্রনাথ বাবু অল্পবয়স্ক। চর্চ্চা রাখিলে তিনি যে কালে যশস্বী হইবেন, এমন কথা অনায়াসে বলা চলে।

**সিন্ধু-গৌরব।** (ইতিহাস অবলম্বনে) উপন্যাস। শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ, প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচসিকা মাত্র।

এ খানি অতি সুন্দর উপন্যাস। পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। হিন্দু পুরুষ ও হিন্দু নারীর যে কি বীর্য্যবত্তাই ছিল তাহা পুস্তক পড়িলে লোকে বুঝিতে পারিবে। রাজপুত যে জীবনটাকে কত তুচ্ছ বলিয়া মনে করিত তাহা আমাদের বুঝিয়া রাখা ভাল। লোকে এই পুস্তকের একটা দোষ বোধ হয় ধরিবে—সেটা হিন্দু স্ত্রীলোকের এমন প্রতিহিংসা। আমরা মহাভারত পড়িয়া জানি, কাশীরাজ কন্যা ভীষ্মকে বিনাশ করিবার জন্য কি না করিয়াছিলেন। স্ত্রীজাতি নিতান্ত কোমল, কিন্তু যে দিন তার প্রাণে আঘাত লাগে, তখন সে না করিতে পারে এমন কর্ম্ম নাই। পুরুষ এমন কোমল হইতেও জানে না, এমন কঠোর হইতেও জানে না। আমরা এই প্রতিহিংসার চিত্রের সর্ব্বান্তকরণে প্রশংসা করিতেছি। পুস্তকখানিকে সমাদৃত হইতে দেখিলে আমরা পরম সন্তুষ্ট হইব।

**হিন্দু বিজ্ঞান-সূত্র।** "মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি?"

পবিত্র হিন্দুত্ব সাধন।

কেন?

তবে শুনুন।

মূল্য কত?

এখন বিনা মূল্যে।

সময়ান্তে?

পরার্দ্ধ মুদ্রা।

মূল্য এত কেন?

এতৎ হিন্দু-বিজ্ঞান সূত্রং।

শ্রীবিশ্ব-নিন্দক বায় ওরফে বি, এন্ রায় প্রণীত।

পাঠকবর্গ গ্রন্থকারের পরিচয় ত পাইলেন। ইহার পরও কি আবার গ্রন্থের পরিচয় দিতে হইবে? সুহৃদ্‌বর্গ যদি কেহ থাকেন তবে চিকিৎসক ডাকিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। তথাপি পুস্তকের মধ্যে দুই একটি ভাল কথাও আছে। আমরা তাহা "কুস্থানাদপি কাঞ্চনং" হিসাবে গ্রহণ করিতে পারি।

# উপাসনা।

—★—

## ব্রহ্মোপাসনাতত্ত্ব।*

—★—

### (১) প্রয়োজন।

৮৮। ব্রহ্মোপাসনা-তত্ত্ব নামক এই বর্ত্তমান প্রকরণে নির্গুণোপাসনা বিষয়ে কিঞ্চিত বিবরণ প্রদান করা প্রয়োজন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে পার কিজন্য প্রয়োজন? এ কথাব উত্তর এই যে, জীবের নিরুপাধিক মুক্তি যে অন্তিম ও অনন্ত ব্রহ্মসহবাসরূপ ব্রহ্মজীবন, এই নির্গুণোপাসনা তাহার শেষ সোপান এবং অন্তরঙ্গ সম্পত্তি। উক্ত ব্রহ্মজীবনের নামান্তর আত্মজ্ঞান, পরমাত্মজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান, তত্ত্বজ্ঞান এবং আত্মতত্ত্ব। ফলে এই উপস্থিত প্রকরণে যে নির্গুণ-ব্রহ্মের নির্গুণোপাসনা ব্যাখ্যা করার প্রতিজ্ঞা তাঁহার লক্ষণ কি? ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা, বেদন্তাধ্যয়ন এবং তদুভয়ের হেতু স্বরূপ চিত্তশুদ্ধির তাৎপর্য্য কি; উপাসনার সাধারণ তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম কি? নির্গুণোপা-

* "BRAHMOPASHANA"—This means Divine Worship pure and simple as prescribed by the Upanishads in contradistinction to any divine service performed under the natural inclination of the worshiper. This is direct worship of God, but not through any religious rite or ceremony, and is thus a control over the bondage of Nature, Law and Faith. With a Sannyasin or Paribrajaka who follows this pure worship, the performance of religious rites as ordained by Law ( Shastras ) is optional, but for a Brahmopashaka ( or worshiper of Brahmo ) who is also a householder ( grihastha ), the observance of those rites is compulsory. This pure divine service brings on direct immortality or at least that of the Brahmo-loka ( ragion of Brahma ). I might perhaps add that when the worhiper attains to this stage of progress he does not ascribe any attributes to God who is One only without a second, nor any to his individual soul. His worship consists in meditations with the pure and simple knowledge of God without any terrestrial motives and desire of good in the world to come.

C. S. B

সনার কোন অর্থ এবং শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিদর্শন আছে কিনা? নির্গুণোপাসনায় উপাস্য উপাসক সম্বন্ধ থাকে কিনা? এই বর্ত্তমান প্রকরণে এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন। শাস্ত্রের গূঢ় অর্থাবধারণে বিশেষ মনোযোগী না হইয়া অনেকে মনে করেন উপাসনা মাত্রেই সগুণ; অতএব নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা, যাহার লক্ষণ সর্ব্বতোভাবে নির্গুণ, নিরুপাধিক ও অকত্রাত্মক হওয়া চাই, তাহা সম্ভব নহে। উপবিউক্ত প্রশ্নসকলের মীমাংসার মধ্যে এই সব সন্দেহেরও সিদ্ধান্ত লাভ হইবে। এক্ষণে আমি ক্রমপূর্ব্বক ঐ সকল কথার বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম।

## (২) নির্গুণ-ব্রহ্মের লক্ষণ।

৮৯। নির্গুণ-ব্রহ্মের লক্ষণ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে নিম্নস্থ কতিপয় শ্রুতি উদ্ধৃত করিতেছি। তৎসমস্ত নির্গুণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক এবং সর্ব্বপ্রকার প্রাকৃতিক গুণ ও উপাধির নিষেধবাচী। তন্ত্রশাস্ত্রেও নিগুণবোধক অনেক বচন আছে। যদি প্রয়োজন হয় তাহারও দুই একটি উদ্ধৃত করিব।

(১) নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং
নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।
অমৃতস্য পরং সেতুং
দগ্ধেন্ধন মিবানলম্॥ ইতি

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ১৯শ শ্রুতি।

পরব্রহ্ম, নিরবয়ব, নিষ্ক্রিয় (যিনি কোন ক্রিয়া দ্বারা পরিবর্ত্তিত ও বিকৃত হন না, স্বীয় মহিমাতে প্রতিষ্ঠিত,কূটস্থ) শান্ত (সর্ব্ববিকার উপসংহৃত)। নিরবদ্য (অগর্হণীয়), নিরঞ্জন (নির্লেপ), অমৃতের সেতু (সংসার মহোদধির উত্তরণোপায়) এবং প্রজ্বলিত ইন্ধননিঃসৃত অনলের ন্যায় দেদীপ্যমান। স্বয়ম্প্রকাশ।

(২) একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা।
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥
(ঐ ১১শ শ্রুতি)।

তিনি একদেব (অদ্বিতীয় দ্যোতন স্বভাব-স্বপ্রকাশ), সর্ব্ব প্রাণিতে সংবৃত, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, সর্ব্বপ্রাণিকৃত বিচিত্রকর্ম্মাধিষ্ঠাতা, সর্ব্বভূতে অধিবাসী, সর্ব্ব-জীবের সাক্ষী, চেতয়িতা, এবং কেবল নিরু-পাধিক-সত্ত্বাদিগুণরহিত। অতএব নির্গুণ।

(৩) যওদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং যদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ। ইতি মুণ্ডকোপনিষদে ১ম মুণ্ডকে ১ম খণ্ডে ৬ষ্ঠ শ্রুতি॥

যিনি পরাবিদ্যার বিষয় অক্ষর-ব্রহ্ম তিনি অদৃশ্য, (সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য), অগ্রাহ্য (কর্ম্মেন্দ্রি-য়ের অবিষয়), অগোত্র (অনন্বয়-), অবর্ণ (শুক্লাদিবর্ণরহিত), চক্ষুঃ শ্রোত্র, পাণি, পাদ-রহিত, নিত্য, বিভু (ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত প্রাণিভেদে যিনি অভেদেবর্ত্তমান), সর্ব্বগত (সর্ব্বব্যাপী), সুসূক্ষ্ম, ও অব্যয় (অঙ্গহীন ও গুণহীন জন্য অঙ্গাপচয় ও গুণাপচয় লক্ষণশূন্য। যিনি এবম্ভূত লক্ষণ ভূতযোনি (সর্ব্বভূতের কারণ), ধীরেরা তাঁহাকে সর্ব্বতঃ আত্মভূত-রূপে দর্শন করেন।

(৪) অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্য-মব্যপদেশ্যমেকাত্মপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং

শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ। ইতি মাণ্ডুক্যোপনিষদে ৭ম শ্রুতি॥

অদৃষ্ট, 'অব্যবহার্য্য' (লক্ষণ নাম, নির্দ্দেশ, বিশেষণশূন্য অনন্থমেয়) অতএব অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য। একমাত্র আত্মপ্রত্যয়সার (এক মাত্র আত্মজ্ঞানই যাঁহার প্রমাণ, অর্থাৎ আত্মজ্ঞপুরুষ স্বীয় আত্মারূপে যাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন সেই বিজ্ঞেয় আত্মা একমাত্র আত্ম-প্রত্যয়সার। 'প্রপঞ্চোপশম' (জাগ্রত, স্বপ্ন সুষুপ্তি, স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণের ধর্ম্ম যাঁহাতে নাই), শান্ত, শিব, অদ্বৈত, তুরীয়। তিনি আত্মা, তিনি বিজ্ঞেয়॥

(৫) অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথারসন্নিত্যমগন্ধবচ্চযৎ।
অনাদ্যনন্তম্মহতঃপরংধ্রুবং
নিচায্যতং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥

তিনি অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয় অরস নিত্য অগন্ধ। অর্থাৎ তাঁহার জ্ঞান অতি সূক্ষ্ম। তিনি অনাদি, অনন্ত, মহত্তত্ত্বের অতীত, ধ্রুব (কূটস্থ)। এবম্ভূত ব্রাহ্মাত্মাকে জানিয়া মর্ত্ত্যমনুষ্য, অবিদ্যা কামকর্ম্মলক্ষণ মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হন॥

ইতি কাঠকে তৃতীয়বল্লী ১৫ শ্রুতি॥

(৬) অন্যত্রধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্ম-
দন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চভব্যাচ্চ
* * * * ॥

ইতি কাঠকে ২য়া বল্লী ১৪ শ্রুতি॥

যিনি শাস্ত্রীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান, তাহার ফল এবং তাঁহার কারক হইতে পৃথক। তথা অধর্ম্ম হইতে পৃথক। যিনি কৃত যে সৃষ্টিকার্য্য তাহা হইতে স্বতন্ত্র। অকৃত অর্থাৎ সৃষ্টির কারণ-বীজ প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে যিনি পরিচ্ছিন্ন নহেন। তিনি ঈদৃশ সর্ব্বব্যবহারগোচরাতীত।

(৭) নতত্রচক্ষুর্গচ্ছতি নবাগ্‌গচ্ছতি নো মনো ন বিদ্মো ন বিজানীমো যথৈতদনুশিষ্যাদন্য দেবতদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি। ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যেনস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে॥

ইতি তলবকারোপনিষদে ৩য় শ্রুতি॥

ব্রহ্ম, "শ্রোত্রস্যশ্রোত্রং" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে শ্রোত্রাদিরও আত্মভূত, অতএব সেই ব্রহ্মের প্রতি চক্ষুঃ, বাক্য ও মনের গম্যত্ব নাই এপ্রযুক্ত তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি না এবং শিষ্যকে যে প্রকারে ব্রহ্মোপদেশ করিতে হয় তাহাও জানি না "অন্যদেবতদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি"। "পৃথগেব তৎবিদিতাৎ সর্ব্ব-মেব ব্যাকৃত, তদ্বিদিতমেব তস্মাৎ অন্যৎ এব ইত্যর্থঃ"। তিনি, এই ব্যাকৃত সৃষ্টিতে যত বিদিত পদার্থ আছে, সে সমস্ত হইতে অন্য। "বিদিতংহি নাম যৎ বিদিক্রিয়য়া অতিশয়েন আপ্তং"। 'বিদিক্রিয়া" শব্দের অর্থ জানারূপ ক্রিয়া বা জ্ঞানক্রিয়া। জ্ঞানক্রিয়া মনোবৃত্তির ক্রিয়ামাত্র। এই ক্রিয়া দ্বারা যাহা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানগোচর হয় তাহার নাম "বিদিত"। ব্রহ্ম তাদৃশ বিদিক্রিয়ার কর্ম্মভূত নহেন। অর্থাৎ ক্রিয়ালক্ষণ জ্ঞানের বিষয়ীভূত নহেন। তাদৃশ জ্ঞানক্রিয়ার বিষয়ীভূত সমস্ত জ্ঞাতপদার্থ হইতে তিনি "অন্য" স্বতন্ত্র। "অথোঅপি অবিদিতাৎ বিদিত-বিপরীতাৎ অব্যাকৃতাৎ ব্যাকৃতস্যবীজাৎ অধি" অতঃপর তিনি ব্যাকৃত কিনা নামরূপে প্রকটিত সৃষ্টির অব্যক্ত বীজস্বরূপিণী অবিদিত

প্রকৃতির অতিক্রান্ত। ইহা পূর্ব্ব পূর্ব্ব আচার্য্যগণের নিকট হইতে আমরা শুনিয়াছি—যাঁহারা আমাদিগকে সেই ব্রহ্মবিষয়ে কহিয়াছেন। "ব্রহ্মচ এবং আচার্য্যোপদেশ পরম্পরাধিগন্তব্যং, নতর্কতঃ, প্রবচন, মেধা, বহুশ্রুত্য, তপো, যজ্ঞাদিভ্যশ্চ ইত্যেবং," সাক্ষাৎ অপরোক্ষ স্বয়ম্প্রকাশ জ্ঞানস্বরূপ সকলের আত্মাস্বরূপ ব্রহ্মসম্বন্ধে এই আচার্য্যোপদেশ গুরুশিষ্য পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, ইহা বেদবাক্য সুতরাং অনাদিতত্ত্ব। এই পরমোপাদেয় গম্ভীরতত্ত্ব ঐরূপ প্রণালীতেই বুঝিতে হইবে। কিন্তু তর্কদ্বারা, বক্তৃতাদ্বারা, মেধা (গ্রন্থার্থ ধারণাশক্তি) দ্বারা, বহুশ্রবণ দ্বারা, তপস্যা দ্বারা এবং যজ্ঞাদি দ্বারা নহে।

(৮) যন্মনসা নমনুতে যেনাহুর্ম্মনোমতং।
তদেবব্রহ্মত্বংবিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে॥
তলবকারোপনিষদে ৫ম শ্রুতি॥

ব্রহ্মবিদেরা কহিয়াছেন মনের অবভাসক যে ব্রহ্মচৈতন্যজ্যোতিকে মন মনন করিতে অক্ষম, কিন্তু যে ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা মনরূপচৈতন্য দীপ্তিলাভ করে এবং যিনি মনের প্রত্যেক মননকে জানেন, সেই প্রত্যক্‌চেতয়িতা মনের আত্মাকে তুমি ব্রহ্ম বলিয়া জান। তিনি ব্রহ্ম নহেন যাঁহাকে উপাধিভেদবিশিষ্ট করিয়া লোকে উপাসনা করে। মননরূপক্রিয়া দ্বারা (অর্থাৎ মনগড়া) যে উপাসনা রচিত, তাহা ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। তাহা ব্রহ্মেতে উপাধি কল্পনা করে কিন্তু তিনি উপাধিকল্পনা শূন্য। অতএব ব্রহ্ম ক্রিয়ালক্ষণা উপাসনার অবিষয়। (শঙ্কর) "উপাস্তিক্রিয়া কর্ম্মত্ব প্রতিষেধোপি ভবতি"। এই জন্য তাঁহাতে উপাসনা-ক্রিয়া পতিষিদ্ধ হইয়াছে।

(৯) অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমস্নেহমচ্ছায়মতমোঽবায়্বনাকাশমসঙ্গমরসমগন্ধমচক্ষুষ্কমশ্রোত্রমবাগমনোঽতেজস্কমপ্রাণমমুখমমাত্রম্॥
গার্গীব্রাহ্মণে॥

তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, তিনি অলোহিত, অস্নেহ, অচ্ছায়, অতমঃ, অবায়ু, অনাকাশ, অসঙ্গ, অরস, অগন্ধ, অচক্ষু, অকর্ণ, অবাক্, অমন, অপ্রাণ, অমুখ, এবং অমাত্র॥ ব্রাঃ ধঃ॥

(১০) তদ্বা এতদক্ষর-গার্গ্যদৃষ্টং দ্রষ্টৃশ্রুতং শ্রোত্রমতং মন্তৃবিজ্ঞাতম্বিজ্ঞাত্রে তস্মিন্নুখল্বক্ষরেগার্গ্যাকাশওতশ্চপ্রোতশ্চ॥ ঐ॥

হে গার্গি! এই অবিনাশী পুরুষকে কেহ দর্শন করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই দর্শন করেন, কেহ তাঁহাকে শ্রুতিগোচর করে নাই, কিন্তু তিনি সকলই শ্রবণ করেন, কেহ তাঁহাকে মনন করিতে সমর্থ হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলকেই মনন করেন, কেহ তাঁহাকে জ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু তিনি সকলই জানেন। হে গার্গি! আকাশ এই পরমেশ্বরেতে ওতপ্রোত হইয়া আছে। ব্রাঃ বঃ॥

(১১) যত্রনান্যৎপশ্যতি নান্যচ্ছৃণোতি
নান্যদ্বিজানাতি সভূমা।
ভূমৈবসুখং তদমৃতং ভূমা-
ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি॥

(ছান্দোগ্যোপনিষদে শনৎকুমার নারদ-সংবাদে ৭।১৩-১৪॥)

যথায় কেহ অন্য কিছু দেখে না, কিছু শুনে না, কিছুই জানে না তাহাই ভূমা আদ্যন্তশূন্য দ্বৈতশূন্য। ভূমাই সুখ, অমৃত। অতএব সেই ভূমা পরমাত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করিবেক।

(১২) ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।
সত্যমেকং পরংব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখীভবেৎ॥
বিহায়নামরূপাণি নিত্যেব্রহ্মণি নিষ্কলে।
পরিনিশ্চিত তত্ত্বো যঃ সমুক্তঃ কর্ম্মবন্ধনাৎ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ১৪শ উল্লাসে॥

ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত জগৎ মায়াতে কল্পিত। কেবল একমাত্র পরব্রহ্ম সত্য। তাঁহাকে জানিয়া সুখী হইবেক। নিত্য ও নিষ্কল ব্রহ্মেতে নাম রূপের আরোপ করিবে না। যে ব্যক্তি সেই তত্ত্ব জানেন তিনি কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্ত।

(১৩) অদ্বৈতং হি শিবং প্রোক্তং
ক্রিয়ায়া সর্ব্ববর্জ্জিতং।
গুরুবক্ত্রেণ লভ্যেত
নান্যথাগমকোটিভিঃ॥
( কুলার্ণবে ৫। ১। ১০৮।

শিবোক্ত অদ্বৈততত্ত্ব যাহা ( অর্থাৎ মহেশ্বরের কথিত যে অদ্বৈতব্রহ্মজ্ঞান ) তাহা ক্রিয়াবিবর্জ্জিত। তাহা গুরুমুখে লাভ হয়। নচেৎ কোটি কোটি আগম হইতেও লব্ধ হয় না।

৯০। এই কয়েকটি শ্রুতি এবং তন্ত্রবচন হইতে পরব্রহ্মের লক্ষণ কিরূপ তাহা জানা যাইতেছে। সে সমস্ত, প্রাকৃতিক সর্ব্বগুণের সর্ব্বধর্ম্মের ও সর্ব্বলক্ষণের নিষেধবাচী ; অর্থাৎ নির্গুণ, নিরুপাধিক, ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, কালত্রয়ের অতিক্রান্ত, মনোবুদ্ধি ও বাক্যের অগোচর, ইন্দ্রিয় প্রাণাদিবৃত্তির অগ্রাহ্য এবং তর্ক, শ্রুতি, মেধা, ধ্যান, ধারণা এবং উপাসনারূপ ক্রিয়ার অবিষয়।

## (৩) উপাসনার তাৎপর্য্য।
### সাধারণ লক্ষণ।

৯১। এইক্ষণে উপাসনার তাৎপর্য্য কি, লক্ষণ কি এবং মর্ম্ম কি ক্রমে তাহাই বলা যাইতেছে এবং কোনরূপ উপাসনা যথোক্ত-লক্ষণ ব্রহ্মেতে সংলগ্ন হইতে পারে কিনা তাহাও উক্ত হইতেছে।

৯২। হিন্দু সমাজে সন্ধ্যাবন্দনা, দেব-দেবীর পূজা, যজ্ঞ ও ব্রতাদি যে সমস্ত ক্রিয়া সমন্ত্রকরূপে, এবং যথাবিধি নৈবেদ্যাদি ও হোমের সহিত অনুষ্ঠিত হয়, সেই সব অনুষ্ঠানকে লোকে পূজা, অর্চ্চনা, যজ্ঞ ও উপাসনা বলিয়া বুঝেন। তদ্ভিন্ন কোন মূর্ত্তিহীন দেবতার যে উপাসনা হইতে পারে, অথবা মন্ত্রহীন, ধ্যানহীন বিধিহীন ও দ্রব্যহীনরূপে কোনরূপ পূজা অর্চ্চনা বা উপাসনা হইতে পারে তাহা তাঁহারা মানেন না। কেননা সেরূপ অনুষ্ঠান ভারতীয় সামাজিক ধর্ম্মের অপরিচিত। অতএব হিন্দু সমাজের সিদ্ধান্ত এই যে, নিরাকার ঈশ্বরের উপাসনা হয় না এবং তাদৃশ উপাসনার কোন স্থাপিত প্রণালী এ সমাজে নাই। সামাজিক ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করিলে এ সিদ্ধান্তকে আমরা অমূলক বলিতে পারি না।

৯৩। পক্ষান্তরে আমি বেদান্ত ও তন্ত্র-শাস্ত্রের অসিদ্ধান্তাংশগ্রাহী অনেক গৃহস্থ ও জনকতক বিরক্ত মহাত্মাকে দেখিয়াছি যাঁহারা আমাকে কহিয়াছেন যে, পরব্রহ্মের উপাসনা নাই। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মই মানবের ও সর্ব্বজীবের আত্মা। অতএব কে কাহার উপাসনা করিবে? ধর্ম্মাধর্ম্ম পাপপুণ্য স্বর্গ নরক সমস্তই মিথ্যা। ঐ প্রকার মতস্থ কতিপয় গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী দেখিয়াছি যাঁহারা অত্যন্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অনাচারী তাঁহারা কহেন যে, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্যে আত্মা নির্লিপ্ত

৯৪। অনেক বেদান্তবিৎ ব্রাহ্মণপণ্ডিতে বলেন যে, উপাসনা মাত্রেই সগুণ, অতএব পরব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে না; কেননা তিনি নির্গুণ। তাঁহারা সকলেই হিন্দুধর্ম্ম-বিহিত নিত্যকর্ম্ম এবং দেবদেবীর অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। বহুদিন পূর্ব্বে আমি কয়েকজন বেদান্ত শাস্ত্রের মহাপণ্ডিত এবং কয়েকজন বেদান্তের অনুরাগী বিষয়কর্ম্মী ভদ্রলোককে দেখিয়াছি। তাঁহারা ঐরূপ মত ও অনুষ্ঠান সত্ত্বেও "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতি পাঠ দ্বারা কিম্বা ও মন্ত্রলক্ষণবিরহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতেন এবং সর্ব্বতোভাবে সদাচারী ছিলেন। কেবল অধ্যাপনা বা তর্ককালে নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনা স্বীকার করিতেন না

৯৫। যাহাহউক, উপাসনা শব্দের যেরূপ তাৎপর্য্য কর্ম্মকাণ্ডের অধিকারে প্রচলিত আছে তাহা পরব্রহ্মেতে সংলগ্ন হইতে পারে না। ঈশোপনিষদে অবিদ্যা ও বিদ্যার, অসম্ভূতি ও কার্য্যব্রহ্মস্বরূপ হিরণ্যগর্ভবোধক সম্ভূতির, এবং মুণ্ডকোপনিষদে তপস্যা ও হিরণ্যগর্ভসেবারূপ যে সমস্ত উপাসনার উল্লেখ আছে তাহার কোনরূপ উপাসনা নিরঞ্জন ব্রহ্মেতে উপন্যস্ত হইতে পারে না। উক্ত শাস্ত্রদ্বয় দৃষ্টি করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহার অতীত দেশে স্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মবিদ্যা সমস্ত কর্ম্মকাণ্ড ও তপস্যার অতীত এবং সে সমস্ত সাধনের কোন লক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞান সাধনে অপেক্ষিত নহে।

৯৬। কঠোপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্বকে ধর্ম্মাধর্ম্ম, কৃতাকৃত, ভূতভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ের অতিক্রান্ত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অতএব কোনরূপ ধর্ম্মক্রিয়া ও লোকব্যবহার-সিদ্ধ উপায়দ্বারা তাঁহার উপাসনা অসম্ভব। ব্রহ্মতত্ত্বের অনুশীলনরূপ যে সাধনা, তাহা কোন সামাজিক, মানসিক, কর্ত্রাত্মক বা আশ্রম-ধর্ম্ম নহে। ব্রহ্মজ্ঞান সর্ব্বপ্রকার সংসার-ধর্ম্মের অতীত। সুতরাং তাহার আলোচনা ও বিচার এবং তল্লাভার্থ ব্রহ্মোপাসনা কোন উপাসক সম্প্রদায়ের উপাসনা পদ্ধতির অনুরূপ নহে। তদ্রূপ কোনপ্রকার উপাসনার সম্পূর্ণ বা আংশিক লক্ষণ দ্বারা বিজ্ঞেয় পরমাত্মার উপাসনা বিন্যস্ত হইতে পারে না। অতএব সাধারণ লোকের ধারণাও এই যে নিরাকার, নির্গুণ ও নিরঞ্জন ব্রহ্মের উপাসনা নাই।

৯৭। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ব্রহ্মোপাসনার যে পদ্ধতি আছে তাহা নিরাকার, নির্গুণ ও নিরঞ্জন ব্রহ্মোদ্দেশে উপদিষ্ট হইলেও ক্রম বিহিত ক্রিয়ামাত্র। তাহা মন্ত্রসমবায়ী; অঙ্গ ন্যাস, প্রাণায়াম গন্ধ, পুষ্প, বস্ত্রালঙ্কার নৈবেদ্য জপ, স্তব কবচ প্রভৃতি ক্রিয়াসমবায়ী উপকরণবিশিষ্ট। সুতরাং তাহাকে পর ব্রহ্মের জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যক্ষ উপাসনা বলা যাইতে পারে না। তাহা একপ্রকার কর্ম্মযোগ মাত্র এবং পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে তাহা ধৃত হইয়াছে। স্থূল কথা এই যে, সর্ব্বপ্রকার মন্ত্রসমবায়ী, উপকরণবতী, ক্রিয়ালক্ষণা ও ক্রমবিহিতপদ্ধতিপর উপাসনা হইতে ব্রহ্মজ্ঞান ও জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যক্ষ ব্রহ্মোপাসনা স্বতন্ত্রতর। এমন কি, অসমর্থপক্ষে, নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বের পরোক্ষানুশীলনযুক্ত নির্গুণোপাসনাও তাহা হইতে স্বতন্ত্র প্রকার সাধন। ইহা পঞ্চদশীতে ধ্যানদীপে উক্ত হইয়াছে।

# সংস্কৃত ভাষাই সমগ্র আর্য্যভাষার আদি জননী।

( ১ )

কেন আমরা সংস্কৃত ভাষাকে দুগ্ধ ও গ্রীক লাটিন ভাষাকে দধি বা ঘোল বলিতে অভিলাষী, সংস্কৃতের কচিৎ বিকার কচিৎ বা বিকারের বিকারেই যে উক্ত ভাষাসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে, উদাহৃত শব্দকদম্বকের মধ্যে যে একের জন্যত্ব ও অপরের জনকত্বভাব জীবন্ত ও জলন্ত ভাবেই বিদ্যমান, তৎ প্রদর্শনার্থ আমরা ভাষার বিকারবিষয়ক কতিপয় সূত্র বা Law এর কথা বলিব। ভাষার বিকারে বকার অ, ও, উ প্রভৃতি হইয়া থাকে, যেমন বলি—অলি, দেব—দেঅ, দেবতা—দেওতা, বা দেওই; শিব—শিউ, দেবালয়—দেউল, দীপাবলী—দেওয়ালী প্রভৃতি। কিন্তু ভাষার বিকারে অকার কখনই বকারে পরিণত হয় না। সুতরাং গ্রীক ভাষার Pan প্রভৃতি ছয়টি শব্দ যে আমাদের পবন প্রভৃতি ছয়টি শব্দের বিকারপ্রভব, তাহা সর্ব্বথাই স্বীকার্য্য। দেবরকে বাঙ্গলায় দেওর বলিয়া থাকে, আর গ্রীশ-দেশে বলে Daer ( দেয়ার ), সুতরাং আমাদের দেবর যাইয়াই যে এথেন্সে Daer সাজিয়া বসিয়াছে ইহা ধ্রুবই। ভাষার বিকারে দ—ড-ও হইয়া থাকে। যেমন দগর—ডগর। দর ( ভয় )—ডর। দাড়িম্ব—ডালিম। ঐকারণেই ভারতের দ্রু প্রভৃতি গ্রীশে যাইয়া Dru প্রভৃতির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাই ভারতের দ্বারসন্ততি "দোর" সাহেবদের দোরে যাইয়া Door হইয়া বসিয়াছে।

ভাষার বিকারে প, ব, ভ ও ব—ফ হইয়া থাকে। তাই শ্রীহট্টের লোকেরা পাণকে বলেন ফান। আর চীনের লোকেরা আমাদের বেস্মকে বলেন Fan। ইংরাজ আমাদের ব্যজনকে করিয়াছেন Fan, আর আমাদের পবনস্ যাইয়া টাইবরতীরে Favonus মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। ভাষার বিকারে অ—কখন ও এবং কখন উ হইয়া থাকে। তাই সাধারণতঃ গ্রীক্ শব্দ os ও লাটিন শব্দ us ভাগান্ত, সুতরাং উহাকে তোমরা জীবান্তর মনে করিও না। ঐ যে তোমরা লাটিন ভাষায় Filius ও Filia কথা দুইটি দেখিতেছ, উহা আমাদের ভারতের বালক ও বালিকা, ভারতীরই দগ্ধদেহ। এবং আমাদের ভ্রাতরঃই গ্রীশে যাইয়া Phratria ও রোমে Frater মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। ঐরূপ আমাদের ভারস্ গ্রীশে যইয়া হইয়াছে Phoros, আর ভামিনী যাইয়া লাটিনে হইয়াছে Femina ও Femella, কালে এই Femellaই ইউরোপের অন্যত্র Female প্রসব করিয়া এখন আসল সাজিয়া বসিয়াছে। ঐরূপ আমাদের ভূ—লাটিনে Fuio গ্রীশে Phuo, এবং আমাদের আপ্নোৎ, আপ্নোতি, ভট ও ভাণ্ড যাইয়া বিলাতে found, find, fought, ও fund মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। বিলাতী feign ও আমাদের ভাণের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে?

ভাষার বিকারে প, ফ ব, ভ ও শষস, হ হইয়া থাকে। তাই ময়মনসিংহের লোকেরা ফিরকে বলে হির (পুনরায়), আর আমরা সংস্কৃত ভবতি ও অভবংকে করিয়া লইয়াছি — হোতা, হোদি, হয় ও হইল। এবং ঐরূপ কারণেই আমাদের বীরঃ, গ্রীশে যাইয়া হইয়াছে Heros ও পাথার হইয়াছে Heydor। পাথার কে? সে আমাদের জগদম্বা গীর্ব্বাণবাণীর নাতিনীবিশেষ। তাহার মা এর নাম পাথস্। এই পাথারই পাথারে পড়িয়া লঙ্কায় যাইয়া হইয়াছে "ওয়াথুরা" ও বিলাতে যাইয়া হইয়াছে Water ও Wasser প্রভৃতি। আর আমাদের স্বাদু ও স্বপনস্ প্রভৃতিই যে গ্রীশের Hedu ও Hupnos প্রভৃতির জনয়িতা, তাহাও বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না।

ভাষার বিকারে যে কোন বিসর্গ র হইয়া থাকে। তাই আমাদের পাথস্ বা পাথঃ হইয়াছে পাথার, আর বাতাঃ বাতার হইয়া শেষে বাদলের জন্মদান করিয়াছে। বাতাস কথাটিও এই বাতাঃ হইতে সঞ্জাত। এবং বিলাতী Weather ও Air কথাও আমাদের এই বাতাঃ হইতে সমাগত। এবং আমাদের মঙ্গাঃ ও আরঃ যেমন মাঙ্গর্ ও আরর্ হইয়া শেষে মঙ্গলিয়া ও আরালে পরিণত হইয়াছে, তদ্রূপ আমাদের মহাস্তঃ ও হংসাঃ প্রথমে মহাস্তর ও হংসার হইয়া শেষে লাটিনে Magister ও Anser কথার জন্মদান করিয়াছে।

বলিবে হ—জ হইল কেন? ভাষার বিকারে হ—জ হইয়া থাকে। তাই আমাদের অহম্—জেন্দায় অজেম্ হইয়া মলোপে গ্রীক ও লাটিন ভাষার Egoর দেহ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছে। আর তোমরা যদি একটু বেশী সাহসী হইয়া বলিতে সাহস কর, তাহা হইলে ইহাও বলিতে পার যে, আমাদের মৃচ্ছকটিক নাটকের শকারমুখবিনির্গত "হগে"ই গ্রীক লাটিনের Egoর জনক পিতা। সুতরাং আমাদেরই অহংত্বং বিকৃত হইয়া বিলাতী Egoisum এর প্রাদুর্ভাব ঘটাইয়াছে।

ঐ যে তোমরা লাটিনে Signum ও ইংরেজীতে Sign দেখিতে পাইয়া থাক উহারাও আমাদের চিহ্নম্ ও চিহ্নের চিহ্ন বিশেষ। চিহ্ন—চিহ্ন্। হ্কারের উচ্চারণ হয় না, তাই বাঙ্গলা ভাষা উহাকে বিদায় দিয়া গড়িয়া লইলেন চিন বা চিনা। লাটিনেরা চিহ্নম্ কে চিজ্‌নম করিয়া বানাইলেন Signum, আর চিহ্ন্ হইতে ইংরেজ গড়িলেন Sign. চিহ্ন্ শব্দের হকারের উচ্চারণ হয় না? বিলাতী Sign কথার gও তজ্জন্য silent G বলিয়া সংজ্ঞিত।

পূর্ব্বকালে লোকেরা গৃহাভাবে গর্ত্তে বাস করিতেন, তাই নিঘণ্টুতে "গর্ত্ত" কথাটি গৃহপর্য্যায়ে গৃহীত। বিলাতে উহা ঐ অর্থে ব্যবহৃত না হইলেও উহাকে তাঁহারা ছাড়িয়া যান নাই। লাটিনে উহার নাম Crypta, গ্রীকে Crypto ও ইংরেজীতে Grotto।

ভাষার বিকারে ত—ট, ড ও ল হইয়া থাকে। তাই কর্ত্তরী—কাটারি, কর্ত্তন—কাটন। আর তটাক ও তড়াগ—তলাও। এবং ঐ একই কারণে পোত (পুত্র)—পোলা, পোতী—পুরী বা পুলে বা পিলে। তামিল ভাষায় যে মেয়েকে পিলৈ বলিয়া থাকে, বলা বাহুল্য উহাও উক্ত পোতীরই পুতী ভিন্ন

আর কিছুই নহে। এই পোতই পশ্চিমবঙ্গে পো ও পূর্ব্ববঙ্গ বরিশালাদি স্থানে পোওয়া ও বিক্রমপুরে পোলারূপে বিরাজমান। আর গ্রীশের Polos,লাটিনের Pullus ও Puella উক্ত পোত ও পোতীরই কাচ্চা বাচ্চা-বিশেষ মাত্র।

ভাষার বিকারে ভ—হ হইয়া থাকে। তাই আমাদের ভবতি ও ভবামি বাঙ্গলায় হইয়াছে হয় ও হব, গথিক ভাষায় হইয়াছে Habaip ও Haba ( হব ), আর লাটিনে যাইয়া হইয়াছে Habet ও Habes। ঐরূপ আমাদের ভবন্তঃ ও ভবামঃ গথিকে হইয়াছে Habant ও Habam ( হবাম ), আর লাটিনে হইয়াছে Habent ও Habemus। আর ময়মনসিংহের লোকেরা ভবামঃ কে করিয়া লইয়াছে হবাম বা হইবাম। এখন যদি তোমরা ইহাতেও বলিতে চাহ যে, গ্রীক ও লাটিন প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃতের বিকার নহে, কিন্তু উহারাও এক একটি স্বতন্ত্র স্বয়ম্ভু ভাষা, তাহা হইলে আমরাও বলিব আমাদের বাঙ্গলা, মাগধী মহারাষ্ট্রী, শৌরসেনী ও পালী প্রভৃতি ভাষাও সংস্কৃতের কোন তোয়াক্কা রাখে না, উহারাও এক একটি ভূঁইফোড় স্বয়ম্ভু ভাষা।

কেন মুইর প্রভৃতি মনীষিগণ আমাদের ভারতের সংস্কৃতকে তাঁহাদের সমগ্র ভাষার মাতা বলিতে এত নারাজ? তাঁহারা যদি জানিতেন যে, তাঁহারা আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ভারতের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী, তাহা হইলে তাঁহারা ঐরূপ কুসংস্কারের দাস হইতেন না। মুইর বিশদাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন যে—

But it cannot be shown either that the Greeks or Romans were descended from the Indians, or in any way received their languages from Hindustan. Page 270.

কিন্তু আমারা "ইউরোপীয়গণ ভারতসন্তান" এই প্রবন্ধে দেখাইব যে,কেবল গ্রীক ও রোমকগণ নহে, পরন্তু সমগ্র ইউরোপবাসীই ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান,* এবং এই প্রবন্ধে দেখাইব যে, ভারতের সংস্কৃত ভাষার বিকারেই গ্রীক ও লাটিন প্রভৃতি সমগ্র ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। মুইর মহোদয় তলাইয়া দেখেন নাই বলিয়াই ঐরূপ বৃথা আপত্তির উত্থাপন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদিগেরই স্বদেশবাসী মহামতি Pococke সাহেব গ্রীকগণকে ভারতসন্তান বলিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সঙ্কোচের সমাশ্রয় করেন নাই। তিনি তাঁহার India in Greece নামক গ্রন্থের একত্র বলিয়াছেন যে—

"The case may be stated as follows:—

The picture is Indian,

The curtain is Grecian,

And the curtain is now withdrawn".

First Introduction page 8.

অর্থাৎ গ্রীকগণের ছবি ভারতীয়, বহিরাবরণ কেবল গ্রীশীয়। কিন্তু সে বহিরাবরণও সম্প্রতি উন্মোচিত হইয়াছে। অর্থাৎ গ্রীকগণ যে ভারতের পূর্ব্বাধিবাসী, তাহা আমরা এক্ষণে জানিতে পারিয়াছি। ফলতঃ যাঁহারা ভারতীয় ক্ষত্রিয় যবন ( Ionian ) ও ভারতীয় কম্বোজ ক্ষত্রিয়ের সমবায়সমুত্থ জাতিবিশেষ, যাঁহারা খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে বৈদিক পবন প্রভৃতি, এমন কি গণে-

শের (Janus) পর্য্যন্ত উপাসক ছিলেন তাঁহাদিগকে ভিন্নভাষাভাষী ভিন্নগোত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা অবিচার ভিন্ন আর কিছুই নহে। মহামতি পোকক স্থলান্তরে বলিতেছেন যে—

Apply this to Greece: what is it that strikes the literary student so forcibly as this identity of structure, of vocables, and inflective power, in the Greek and Sanskrit languages? Every day adds fresh conviction—produces fresh demonstration, of this undeniable fact. The Greek language is a derivation from the Sanskrit. Page 18.

পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের সূত্রপ্রণয়ন-দোষেও যে তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার মাতৃত্ব অনুভব করিতে পারেন নাই, তৎপ্রদর্শনার্থ আমরা আরও দুইটি বিষয়ের অবতারণা করিব।

উহার একটি বিষয় এইরূপ যে, ভাষার বিকারকালে মূলভাষার বহুবচনান্ত শব্দ বিসর্গ লোপে অপভ্রষ্ট ভাষার একবচনের শব্দে পরিণত হইয়া থাকে। পরে উহার উত্তর আবার বহুবচনের বিভক্তি যোজিত হয়। যেমন—

| সংস্কৃত | গ্রীক | লাটিন | ইংরাজী |
|---|---|---|---|
| পিতরঃ | Pater | Pater | Father |
| মাতরঃ | Meter | Mater | Mother |
| ভ্রাতরঃ | Phratria | Frater | Brother |
| বোঢারঃ | … | .. | Bearer |
| হন্তারঃ | … | .. | Hunter |
| কর্ত্তারঃ | . | … | Creator |
| দাতারঃ | Dotor | Dater | … |
| সন্তঃ | … | Sunctus | Saint |
| কীড়ন্তঃ | . | … | Current |

এই Father ও Mother প্রভৃতি শব্দের উত্তর আবার বহুবচনান্ত (অস্) প্রযুক্ত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এই রূপ কোন সূত্রের প্রণয়ন করেন নাই এবং সংস্কৃত বহুবচনান্ত পদই যে বিসর্গলোপে তাঁহাদের একবচনের শব্দ গড়াইয়া দিয়াছে, তাহাও ভাবিয়া দেখেন নাই, দেখিলে তাঁহারা উদ্‌ভ্রান্ত হইতেন না। ফলতঃ যে কোন অপভ্রষ্ট ভাষার ইহাই প্রকৃতি। আমাদিগের দেশের বাঙ্গালা প্রভৃতি অপভ্রষ্ট ভাষাতেও উক্ত ক্রম প্রবর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

| সংস্কৃত। | বাঙ্গালা। |
|---|---|
| ভর্ত্তারঃ | ভাতার |
| মহান্তঃ | মহন্ত |
| ভাগ্যবন্তঃ | ভাগ্যবন্ত |
| বর্দ্ধমন্তঃ | বাড়ন্ত |
| চলন্তঃ | চলন্ত |
| স্ফুটন্তঃ | ফুটন্ত |

ঐ কারণেই আমাদের ভরন্তঃ (Present Participle. Plu) পদ লাটিনে যাইয়া Ferens, গ্রীকে Pheron ও জেন্দায় Barans মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। আমাদের ঘুমন্ত, জাগন্ত ও ফলন্ত প্রভৃতি বাঙ্গলা কথা গুলিও ঐরূপে সংস্কৃত বহুবচন হইতে অপভ্রষ্ট। সুতরাং যদি বাঙ্গলা ভাষাকে তোমরা সংস্কৃতপ্রভব বলিতে চাহ, তাহা হইলে তোমাদিগকে গ্রীক লাটিন ভাষাকেও সংস্কৃতপ্রভব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বাঙ্গলা প্রভৃতি ভাষা যে ভাবে সংস্কৃতের বিকার

হইতে প্রসূত, গ্রীক ও লাটিন ভাষাও ঠিক সেই ভাবেই সংস্কৃতের বিকার হইতে সমাগত। এক্ষণে আমরা সামাজিকগণকে আরও একটি কথা তলাইয়া দেখিতে বলিব। সংস্কৃত ভাষায় পা ধাতু পিতৃ, পিতা-পিতরৌ; মাতৃ-মাতা-মাতরৌ; ভ্রাতৃ-ভ্রাতা ভ্রাতরৌ; হন্তৃ, হন্তা-হন্তারৌ ও সৎ সন্-সন্তৌ প্রভৃতি শব্দ ও শব্দরূপসকল রহিয়াছে, পক্ষান্তরে গ্রীক ও লাটিন প্রভৃতি ভাষাতে উহার চিহ্ন মাত্রও বিদ্যমান নাই। ইহাতেও সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, কোন ভাষা প্রকৃতই প্রকৃতি বা নিদান। বলিবে যে সংস্কৃত ভাষাতেও ত কতকগুলি ধাতু ও শব্দের অভাব রহিয়াছে? হাঁ English Accidence গ্রন্থের প্রণেতা মারীচ ও মুইর মহোদয় ঐ ভাবের অনেক কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার মূলে কোন সত্য বা নিদান বিনিহিত নাই। মারীচ বলিতেছেন যে -আশিয়াটিক কোন ভাষাতেই অর (ar), মী (me), মল (ml) ও সী (se) ধাতু দেখা যায় না—

The Asiatic group is wanting in many roots which are common to all the European languages—ar (to plough), me (to mow), ml (to grind), se (to sow).

Page 10

কিন্তু মারীচ সাহেব এশিয়ার কোন ভাষার সহিত সুপরিচিত থাকিলে কখনই মুখ হইতে এরূপ অমূলক কথা বাহির হইতে দিতেন না। আমরা এসিয়ার অন্য ভাষার কোন তত্ত্ব অবগত নহি, কিন্তু এক সংস্কৃত ভাষাতেই উহাদের প্রত্যেকটিরই সত্তা মূলভাবে বিদ্যমান দেখিতে পাইয়া থাকি। সংস্কৃত ভাষায় অর, মল্ ও সী ধাতু নাই, থাকিতেও পারে না? আছে। উহাদের বাবাপ ঋ, মৃদ্ ও সৃ বা সূ ধাতু। আর বিলাতি me ধাতুও আমাদের (মীঙ্ গী বধে) মী ধাতুর প্রকারান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ঋ—ঋচ্ছতি ক্ষেত্রং অর্থাঃ কৃষকঃ।

মী—মীয়তে মীনাতি মীনীতে (হস্তি) সর্পম্

মৃদ্—মৃদ্নাতি মর্দ্দয়তি বা গোধূমং।

সৃ,সূ—সূতে সর্বতি বা পুত্রং জননী।

আমাদের বাঙ্গলা ভাষাতেও ধর, কর, মার, কাট, ও মল প্রভৃতি বহু ধাতু আছে, যাহা সংস্কৃতে পাওয়া যায় না। পাওয়া যাইতে পারেও না, কেননা এই সকল ধাতুও বিলাতি অর্ প্রভৃতি ধাতুর ন্যায়-অপভ্রষ্ট বস্তু। পক্ষান্তরে সংস্কৃতে ধৃ, কৃ, মৃ বা মারি ও মৃদ ধাতু বর্ত্তমান। ধান মলে ও কাণ মলে প্রভৃতি ধাতুরূপও ঐ কারণে সংস্কৃতে দেখিতে পওয়ার কথা নহে। সুতরাং মারীচের কথা অলীক হইতেছে। মুইর মহোদয় তাঁহার Sanskrit Text book গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের একত্র বলিতেছেন যে—

It is further the opinion of distinguished comparative philologists, that Latin and Greek have preserved some forms of inflection, which are more ancient than those preserved in Sanskrit, and represent more exactly the original forms of the supposed parent language. For instance, the Latin has preserved the nominative of the

present participle ending in ens, such as ferens ( carrying ), while Sanskrit has only the form in at, bharat for example, which seems to have been originally bharans or bharant. Page 271.

অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষাতে বহু ধাতু ও ধাতুরূপ ও শব্দরূপের অভাব, যাহা গ্রীক ও লাটিনে বর্ত্তমান, অথচ যাহা অনুমিত মাতৃ-ভাষাতে রহিয়াছে। যেমন লাটিন ভাষার Ferens, এই বর্ত্তমানকালীন ক্রিয়াবাচক বিশেষণ পদটি, যাহার অর্থ, যে বহন করিতেছে, ইহা সংস্কৃত ভাষায় দেখা যায় না। অবশ্য সংস্কৃত ভাষায় অংভাগান্ত একটি ভরং কথা আছে, কিন্তু এটি মৌলিক ভরন্স্ বা ভরন্ত্ কথার বিকৃতি মাত্র।

আমরা মুইর মহোদয়ের এ কথায় হাস্য না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহারা কল্পনার রাজ্যে যে একটা মাতৃভাষার স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন, উহার শব্দ বা ধাতুরূপের দেখা তাঁহারা কোথায় পাইলেন ? আর সংস্কৃত ভাষাতে যে ভরং ভিন্ন আর কোন রূপ নাই তাহাই বা তিনি বলিতেছেন কি প্রকারে ? তিনিই কি তাঁহার গ্রন্থের ২৫০ পৃষ্ঠাতে ( অবশ্য সংস্কৃতজ্ঞ কোন পণ্ডিতের সাহায্যে ) ভরন্ প্রভৃতি সংস্কৃতপদের অধ্যাহার করিয়া তাঁহার নিজের উক্তির জবাব নিজেই দেন নাই ?

| সংস্কৃত | জেন্দা |
|---|---|
| Bharan | Barans |
| Bharontam | Barentem |
| গ্রীক | লাটিন |
| Pheron | Ferens |
| Pheranta | Ferentem |

বেশ দেখা যাইতেছে যে, ভৃ ধাতুর উত্তর শতৃ প্রত্যয় করিয়া যে ভরৎ প্রাতিপদিক হইয়া থাকে, তাহার উত্তর সি বিভক্তি করিয়াই উক্ত Bharan (ভরন ) পদ বিরচিত হইয়াছে। উক্ত ভরৎ শব্দই প্রথমার বহু বচনে যে ভরন্তস পদ হইয়া থাকে, উহারই তকার লোপে জেন্দা ও লাটিনের Barans ও Ferens খাড়া হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের এই Ferens এর নিদান কোন কল্পিত মাতৃ-ভাষার Bharat or Bharans নহে, পরন্তু আমাদের ভরন্তঃ পদ। আর গ্রীক ভাষার এই Pheron পদও আমাদের ভরন্ পদের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। পৃথিবীর কোন ভাষাতেই originally Bharans ( ভরন্স ) or bharant (ভরন্ত) বলিয়া কোন শব্দ বা পদ বিদ্যমান নাই। ভরন্ত কথাটি ভরন্তঃ পদের বিসর্গ লোপপ্রসূত বিকৃত পদ মাত্র। আর যে আকাশকুসুম ভাষাকে মুইর supposed মাতৃভাষা বলিয়া সূচিত করিতেছেন, সেই ভাষার একটা original ফরম দেখাইয়া দিলেই ত পারিতেন ! শিরো-নাস্তি শিরোব্যথা ! মুইর মহোদয় আমাদের সংস্কৃত ভাষাকে কাঙ্গাল বানাইবার জন্য পরেই বলিতেছেন যে—

Thus the Sanskrit word tara, "a star" seems to have been originally stara, a form which has been preserved in the Greek aster and astron, and in the Latin astrum as well as in the Zend stare, and the Persian Sitarah. Page 271.

কিন্তু বলা বাহুল্য মুইরের এ কথার মূলেও কোন সত্য বিনিহিত নাই। সংস্কৃত ভাষায় যেমন নক্ষত্রার্থবাচী তারা, তার, তারকা ও তারক, এই চারিটী স্বতন্ত্র ও স্বাধীন শব্দ রহিয়াছে, তদ্রূপ উক্ত ভাষাতে নক্ষত্রার্থবাচী একটি স্তৃ শব্দও রহিয়াছে। উহাই বিভক্তিযোগে

স্তা, স্তারৌ ও স্তারঃ

রূপ ধারণ করিয়া থাকে। যে প্রকার সংস্কৃত পিতরঃ মাতরঃ প্রভৃতি বহুবচনান্ত পদের বিসর্গলোপে গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় Pater প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্রূপ সংস্কৃত এই "স্তারঃ" পদের বিসর্গলোপে যে "স্তার" ভাগ ছিল, তাহারই বিকারে star, aster, astrum, stare ও sitarah প্রভৃতির দেহ প্রতিষ্ঠা ঘটিয়াছে। তলাইয়া দেখিলে মুইরের এ প্রমাদও ঘটিত না। আমরা আমাদের উক্তির সমর্থন জন্য এখানে কতকগুলি প্রমাণের অবতারণা করিব।

নক্ষত্র মৃক্ষ‍ ভ তারা
তারকাপ্যুড়ু বা স্ত্রিয়াং। অমর
নক্ষত্রে চাক্ষিমধ্যে চ
তারা স্যাৎ তার ইত্যপি। ব্যাড়ি।
নক্ষত্রে নেত্রমধ্যে চ
তারকং তারকাপি চ।
বো পালিত দ্বিত্রে দেবৌমি
পুরাণ সাধু বিধুর
ছায়ৈঃ স্থিতং তারকৈঃ। শাশ্বত।

বেশ বুঝা গেল, আমাদিগের লৌকিক সাহিত্যে নক্ষত্র বুঝাইতে, তার তারক, তারা ও তারকা, এই শব্দচতুষ্টয়ের প্রচলন ছিল। ইহারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও স্বয়ম্ভূ। অপর, আমাদের বৈদিক সাহিত্যে যে "স্তৃ" শব্দটি ছিল ও আছে, তৎপ্রমাণার্থও আমরা নিম্নে কতকগুলি ঋকের সমাহার করিতেছি।

১। পশ্যন্তো দ্যামিব স্তৃভিঃ। ৩-৭সূ-৩ম।
তত্র সায়ণভাষ্যম—
স্তৃভির্নক্ষত্রৈঃ পরিবৃতাং দ্যামিব পশ্যন্তঃ।

২। পিপেশ নাকং স্তৃভিঃ। ৫-১৬১সূ-১ম।
তত্র সায়ণভাষ্যম্—
নাকো দ্যুলোকঃ তং স্তৃভি নক্ষত্রৈর্যুক্তং অকরোৎ।

৩। যে দিব্যা ইব স্তৃভিঃ। ১১-১৬৬সূ-১ম
তত্র সায়ণভাষ্যম্—
দিব্যা দিবি ভবা দেবা স্তৃভিরিব। স্তৃভিরিতি নক্ষত্রনাম।

৪। দ্যৌন স্তৃভি শ্চিতয়ৎ। ৫-২সূ-২ম।
তত্র সায়ণভাষ্যম্—
দ্যৌ দ্যুলোকঃ অন্তরিক্ষং স্তৃভিঃ নক্ষত্রৈরিব ব্যাপ্নোতি।

৫। কেচিৎ উস্রা ইব স্তৃভিঃ। ১-৮৭সূ-১ম
মহামতি মোক্ষমূলর ইহার এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন।—Like the heavens with the stars.

সুতরাং মুইর মহাশয় সংস্কৃত ভাষাতে যে "স্তারঃ"এর অভাব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা কতদূর সত্য, তাহা প্রবীণেরা ভাবিয়া দেখুন। পক্ষান্তরে Benfey সাহেব তাঁহার গ্রন্থের একত্র বলিয়াছেন যে—In the new edition of his comp. Grammar. Par 49, Bopp gives the Sanskrit word as staras ( nom pl ) in the vedic dialect.

মুইর মহোদয় ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া বলিলেন যে, এই যে সংস্কৃত ভাষায় ভগ্নার্থ

একটি ভঞ্জধাতু আছে, উহা একটি বিকৃত ধাতু। পূর্ব্বে আদত অবস্থায় উহাতে একটী র (r) ছিল, সেইটি যাইয়া উহা গঠিত হইয়াছে। কিন্তু পক্ষান্তরে লাটিন ও গ্রীক প্রভৃতি ভাষায় তাহা অদ্যাপি পূর্ব্বাবস্থায় রহিয়াছে। যেমন লাটিনের Frango ও গ্রীক ভাষার Fregnumi.

Again, it seems probable that the Sanskrit root bhanj, "to break", may have been originally bhranj, with an r, which has been preserved in the Latin frango, and the Greek regnumi or fregnumi. Page 271.

বলা বাহুল্য একথার মূলেও কোন সত্য বিনিহিত নাই। ফলতঃ ভাষার বিকারকালে অপভ্রষ্ট ভাষাতে কাচৎ বর্ণের আগম, বর্ণবিপর্য্যয়, বর্ণের বিকার ও বর্ণের লোপ হইয়া থাকে। এখানে একটি রকারের আগম ও ভকার ফকারে বিকৃত হইয়া লাটিন ও গ্রীকের ধাতু গঠিত হইয়াছে। অপিচ গ্রীকের Fregnumi যেন একটি আখ্যাতিক পদই. উহা সংস্কৃত "ভঞ্জুঃ" হইতে রূপান্তরিত মাত্র। যাহা হউক ইহার সমর্থন জন্য আমরা কতকগুলি দৃষ্টান্তের প্রদর্শন করিতেছি।

দান—Doron (গ্রীক), Donum (দানম্) লাটিন; ভেক—"Frog (ইং)।

ঘাস—Grass (ইং). Gras—(জর্ম্মাণ), অগ্রেসর—Aggressor (ইং)

মুখুয্যা—Mukerji, চাটুয্যা-Chaterji.

এখন সামাজিকগণ ভাবিয়া দেখুন সংস্কৃত দান ও লাটিন Donum যখন রকার শূন্য, তখন গ্রীক ভাষার Doronএ যে একটি রকারের আগম ঘটিয়াছে, তাহা ধ্রুব কি না। ভেক ও Frog এর অবস্থাও তাহাই। যদি আমাদের গ্রাস হইতে বিলাতের Grass বিরচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও উহাতে একটি স (s) কারের আগম বৃথাই হইয়াছে তাহা স্বীকার্য্য। আর যদি উহা আমাদের ঘাসের বিকৃতি হয়, তাহা হইলেও রকারের আগম স্বীকার করিতে হইবে। অগ্রেসর ও Aggressor—একই কথা। কিন্তু ইহাতেও অকারণ একটি g ও s এর আগম হইয়াছে। তার পর আমাদের মুখোপাধ্যায়ের বিকৃতি মুখুয্যা ও চট্টোপাধ্যায়ের বিকৃতি চাটুয্যাতে রকারের গন্ধ মাত্রও নাই, কিন্তু তাহাতেও সাহেবেরা ভক্ষ্যে লবণ মিশ্রণের ন্যায় একটি একটি রকার যোগ করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং মা জগদম্বা ভিখারিণী কি বৈলাতিকেরা Beggar তাহা দশজনে বিচার করিয়া বলুন। মুইর ইহার পরও কাখোমালিক বুদ্ধি সমাশ্রয় করিয়া বলিতেছেন যে—

And the later forms of the preposition sub and super, (corresponding to the Greek hupo and huper), appear to be more ancient than the Sanskrit forms upa and upari. Paze 171.

বলা বাহুল্য মুইরের এ কথাতেও আস্থা প্রদর্শনের কোন হেতু দেখিতে পাওয়া যায় না। অবশ্য আপাততঃ ইহাই বোধ হয় যে লাটিনের স (s)—হ হইয়া গ্রীকের hupo প্রভৃতি হইয়াছে, তৎপর হকার—অকারে পরিণত হইয়া সংস্কৃতের উপ ও উপরি খাড়া হইয়াছে।

কিন্তু তাহা নহে। এখানেও একটি হকারের আগমদ্বারা এই সকল অপভ্রষ্ট পদের মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। জেন্দ ভাষাতেও s বা h এর সংযোগ মাত্র নাই, উহাতেও উপৈরি কথা রহিয়াছে। ফলতঃ ভারতের লোক পারস্যে যাইয়া উপরিকে করিয়াছেন "উপৈরি" ও তাঁহারাই গ্রীশে যাইয়া উহাকে করিয়াছেন huper, পরে hupo ও huper এর বিকার sub ও super খাড়া হইয়াছে। ইংরেজীতে upper দেখিলেও উহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হইয়া থাকে। আমরা কতকগুলি গ্রীক শব্দের সমাহার করিয়া আমাদিগের উক্তির সমর্থন করিব।

| সংস্কৃত | গ্রীক |
|---|---|
| একতর | Hekteros |
| আপ্নোমি | Hapto |
| অস্মাকং | Hemon |
| যাজ্য | Hageos |
| নবন | Henna |
| অন্যতর | Heteros |
| অস্মভ্যং | Hemin |
| অস্মান্ | Hemos |
| যতঃ | Hothen |
| নবমঃ | Hennatos |

কিন্তু পক্ষান্তরে দেখ লাটিনে আমাদের অন্যতর—Alter, ইংরেজীতে Another, নবন—Novem ও Nine, নবমঃ—Nomus ও Ninth রূপে বিরাজমান। সুতরাং যে কারণে উদাহৃত শব্দ সমূহে অকারণ হকারের আগম ঘটিয়াছে. তাদৃশ নানাকারণে উপ ও উপরি তে হকারাগমে hupo ও huper হইয়াছিল। ফলতঃ অপভ্রষ্ট ভাষার প্রকৃতি এইরূপই। তাই ময়মনসিংহের লোকেরা আমাদের উল্লুককে হুল্লুক বলিয়া থাকেন। বলিতে পার hupoর h কি প্রকারে S হইল। হকারেরর বিকারে জ হয় এবং জকারের বিকারে স হইয়া থাকে। যেমন পারদ—পারজ—পারস—পারস্য। কম্বোজ—হম্বোজ—হনোজ—হলোজ—হলোস-হেলাস। ইলাবৃতম্—ইলাহিতম ( ব—হ )—ইলাজিতম্ হলাসিঅম্—Elysium ও Elysiun। ঐরূপ উপ—hupo—supo—sub প্রভৃতি হইয়াছে। বৈলাতিক ভাষাতত্ত্ববিদ্গণের Law বা সূত্রপণয়নের দোষেই এই সকল বিভ্রাট ঘটিয়াছে। তাঁহারা যদি জানিতেন যে ভারত হইতেই তাঁহারা ইউরোপে গিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহারা এই সূত্র রচনা করিতেন না যে. তৃতীয় পুরুষ বর্ত্তমানকালীন এক বচনের ক্রিয়াতে একটী S হইয়া থাকে। যেমন comes, loves প্রভৃতি। বস্তুতঃ উহা আমাদের তি বিভক্তির তকারজ চমাত্র। যেমন —

| | | |
|---|---|---|
| নৃত্যতি | | নাচিছে |
| গায়তি | | গাইচে |
| সঃ | কুত্র | যাতি |
| সে | কোটি | যাউচি |
| সঃ | কিং | খাদতি |
| সে | কি | খাউচি |

ঐরূপ—"কঃ তত্র ক্রামতি" যাইয়া বিলাতে Who comes there হইয়াছে। ভাষার বিকারে ক—হ. হ—হু ( who )। তত্র—ততর. ততর—দতর—দঅর ( একটা ত—দ. অন্য ত—অ ),—ক্রামতি—ক্রামচি (ত—চ)। কাঁমচি—কামচ্—comes। ঐরূপ সম্বন্ধ

বুঝাইতে সাহেবেরা যে 'S ও বহুবচন বুঝাইতে S ব্যবহার করিয়া থাকেন, উহাও আমাদেরই ঙস্ ও জস্ বিভক্তির বিপরিণতি মাত্র। ঙসের অসের অ লুপ্ত হইয়া যে (২) লুপ্ত অকারের চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, বিলাতে তাহাই ( , ) apostrophe বলিয়া কথিত। যাহা হউক, গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষা সংস্কৃতের বিকারপ্রভব বটে কিনা, তাহা এক্ষণে প্রবীণেরা ভাবিয়া বলুন।

আমরা এইখানেই গ্রীক ও ল্যাটিনের পালা শেষ করিয়া এক্ষণে শাকসন ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার কথা বলিব। মহামতি মোক্ষমূলর তাঁহার Chips from a German workshop নামক গ্রন্থের প্রথমখণ্ডের ১৫৫ পৃষ্ঠাতে বলিয়াছেন যে, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার নিদান শাকসন ও ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষা ও গথিক প্রভৃতি ভাষার নিদান সেই আদি জন্মভূমির কোন প্রাচীনতম ভাষা, যাহা হইতে সংস্কৃতও জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আমরা যখন সংস্কৃতের পূর্ব্বে অন্য কোন যে ভাষা ছিল, তাহার কোন প্রমাণ বেদাদিতে দেখিতে পাই না, এবং যখন ইহাও দেখিতে পাই যে আমাদের চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় যবন, কম্বোজ, কিরাত এবং বৈবস্বত মনুর পুত্র নরিষ্যন্ত রাজার সন্তান, শকস্থনুগণ ও ভারতীয় শর্ম্মনগণদ্বারা ইউরোপের সমুদায় জাতি গঠিত, তখন আমরা তাঁহাদের ভাষাসমূহকেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমাদের ভারতীয় সংস্কৃতের বিকারসমূখ বলিয়াই মনে করিতে অধিকারী। ভবিষ্য পুরাণ বলিতেছেন যে—

তালজঙ্ঘৈ র্হৈহয়ৈশ্চ
তুরুষ্কৈর্যবনৈঃ শকৈঃ।
উপোষিত মিতাত্রৈব
ব্রাহ্মণত্ব মভীপ্সুভিঃ॥

সগরসন্তাড়িত তুরুষ্ক গত তালজঙ্ঘ হৈহয়, যবন ও শকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ তথায় যাইয়াও ব্রাহ্মণ্যলাভের জন্য উপবাসব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদও বলিতেছেন যে—

যৎ শকা বাচ মারুহন্ অন্তরিক্ষম্।
৪র্থ খণ্ড-১৩৪ পৃষ্ঠা।

অপোগণ্ডান,পারস্য ও তুরষ্ক লইয়া অন্তরিক্ষ বা ভুবর্লোক পরিগণিত। কালে আরবও স্থলে পরিণত হইলে উহাও লগ্ন বলিয়া অন্তরিক্ষের অন্তর্গত হইয়া যায়। তাই বেদ বলিতেছেন যে, শকেরা ভাষা লইয়া অন্তরিক্ষে গমন করিয়াছিলেন। আমরা ইহা শকস্থনুগণের তুরুষ্কে গমন মনে করিয়া লইতে চাহি। তাঁহারা ও তাঁহাদের গুরুপুরোহিত শর্ম্মণেরা তুরুষ্কে আর্য্যমানব বা আরমাণী জাতির জন্মদান করিয়া ইউরোপে যাইয়া প্রথমে শর্ম্মেসিয়া ও সিদিয়া নামে দুইটি জনপদের প্রতিষ্ঠা করেন, পরে আরও উত্তর পশ্চিমে যাইয়া জর্ম্মাণী ও শাকসন জনপদের প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনারা জর্ম্মাণ ও শাকসন জাতিতে পরিণত হয়েন। টিউটন জাতির নিদানও আমাদের বৈদিক দ্যুত্তাম ও কেল্ট জাতির নিদানও আমাদের কিরাতগণ, তাই জর্ম্মাণভাষা সংস্কৃতবহুল ও শাকসন ভাষা সংস্কৃত ও শাকারীভাষাবহুল। শকেরা ভারতে সংস্কৃতপ্রভব শাকারী ভাষার ব্যবহার করিতেন। যদুক্তং সাহিত্যদর্পণে—

শকারাণাং শকাদীনাং
শাকারীং সম্প্রযোজয়েৎ।
৩৮৭ পৃষ্ঠা।

এই জর্ম্মাণ ও শকস্নুগণের সমবায়ে ইংরেজ ও ব্রাত্যক্ষত্রিয় কিরাতগণের বিকারে ফ্রেঞ্চ ও আইরিস প্রভৃতি জাতি গঠিত, সুতরাং তাঁহাদিগের ভাষাকদম্বকও যে আমাদের সংস্কৃত ভাষার বিকারপ্রভব হইবে, ইহা বেদবাদবৎ ধ্রুবই। মহামতি পোককও বলিতেছেন যে শাকসন জাতি ও শাকসন ভাষাই ইংরেজ প্রভৃতি জাতি ও ইংরেজি ভাষার নিদান—"Amidst the numerous dialects which compose the former, the Saxon has left by far the strongest impression upon our native tongue. The simple reduction independent of History, is clear ;—that people once speaking the Saxon language lived in this island ; it is then equally clear, that these were Saxons.

Page-18.

আমরা একটি সুনু শব্দ লইয়া আমাদের উক্তির সমর্থন করিব।

"সুনুঃ পুত্রে হনুজেঽর্কে চ"। মেদিনী.

উহার অর্থ পুত্র, ছোট ভাই ও সূর্য্য। বৈলাতিকেরাও উহাকে উক্ত উভয় অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন।

| ভাষার নাম | পুত্রার্থ | সূর্য্যার্থ |
|---|---|---|
| সংস্কৃত | সুনু | সুনু (সূনু |
| এঙ্গলো শাকসন | Sunu | Sunne |
| গথিক ও লিথুনিয়ান | Sunus; | Sunua, Sunno |
| ডচ্ | Zeen | Zon |
| সুইডিশ্ | Son | Sol |
| ডেনিশ্ | Son | Soel, Sol |
| শ্লাভনিক | Syn | |

এখন বিচার্য্য ইহাই যে, উঁহারা আমাদের সুনু কাটিয়া Son ও Sun বানাইয়া লইয়াছেন, না আমরা উঁহাদের Sunu ও Sunne যোড়া দিয়া আমাদের সুনু গড়িয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু জ্ঞান ও জনের স্রোতঃ যখন সূর্য্যোদয়ের ন্যায় পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমেই প্রবাহিত হইয়াছিল, তখন আমাদের অনুকূলে নিষ্পত্তি হওয়াই যেন সমধিক সমীচীন। আমরা পূর্ব্বে গথিক ভাষার দুই একটি ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিয়া দেখাইয়াছি উহা আমাদের বাঙ্গালার প্রায় কাছাকাছি। এক্ষণে কতিপয় ইংরেজী শব্দ বিন্যস্ত করিয়া উহারাও যে সংস্কৃতপ্রভব, তাহা দেখাইব।

| সংস্কৃত | ইংরেজী |
|---|---|
| ব্যবহার | Behaviour |
| চরিত্র (চরিত্তর) | Character |
| চর্চ্চা | Search |
| অন্তঃ প্রবেশন | Interpolation |
| প্রজনিতারঃ ( বৈদিক ) | Progenitor |
| নেতার | Leader |
| বোঢারঃ | Bearer |
| রূঢ়িমন্তঃ | Rudiment |
| দূর তিষ্ঠন্তঃ | Distant |
| কপোলচল | Colloquial |
| অর্ব্বাচীন | Urchin |
| আবসথ | Abode |
| পরতর | Further |
| তাবকীন | Thine |
| বিটা | Bat |

| সংস্কৃত | ইংরেজী |
| --- | --- |
| শ্বেত | White |
| অর্থ | Worth |
| আধ্যা | Idea |
| লোভনীয় | Lovely |
| ভবন্স্ | House |
| প্রতিবৃত্ত | Revert |
| অবস্ত | Bad |
| তর্ক | Talk |
| সাধু | Sage |
| বুধ | Wise |
| পরদেশ | Paradise |
| পুরঃশিরঃ | Forehead |
| ধ্বনি, ধ্বান | Tone |
| স্বনিত | Sound |
| পথ্য, পিতু | Food |
| কোশ | Cash |
| পত্তন | Town |
| গৃহস্থ | Guest |
| স্বেদ | Sweat |
| স্বাদু | Sweet |
| দীনার | Dollar |
| মামকীন | Mine |
| বর্ত্তুল | Ball |
| শর্ম্ম | Home |
| কর্পট | Cloth |
| বদর | Berry |
| লোভ | Love |
| সমিতি | Committee |
| | Senate |
| দুষ্পাচ্যতা | Dyspepsia |
| সেমুষী | Sense |
| অধম | Dam |
| বিমান | Balloon |

ইহা হইতেই সকলে অনুমান করিয়া লইবেন, গ্রীক, লাটিন, জেন্দা, আরবি, হিব্রু, জর্ম্মাণ, শাকসন ও ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার জননী আমাদের সংস্কৃতই বটে কি না।

পূর্ব্বে প্রত্যেক জাতিই যাযাবর ছিলেন, উষ্ট্রই তাঁহাদিগের একমাত্র অবলম্বন ছিল, তাই দেখা যায় উষ্ট্রবাচক সেই একটি ক্রমেল শব্দই বিকৃত হইয়া আসিয়া ও ইউরোপের ভাষায় যাইয়া আসন পরিগ্রহ করিয়াছে।

সংস্কৃত—ক্রমেল; —গ্রীক—Kemelos; —লাটিন—Camelus, হিব্রু—Gamal;—আরবী—Gimel বা Jimel;—এঙ্গলো শাকসন Camell;—প্রাচীন ফ্রান্স, Camel ও Chamel; উত্তর ফ্রান্স, Chamen;—জর্ম্মাণী—Camell;—স্পেন, Camells; পর্ত্তুগাল, Camels;—ইটালী Camello; আর ইংরেজী ভাষায় উহা Camel মূর্ত্তিতে বিরাজমান। অবশ্য জগতের আদি প্রাচীনতম দুইটি প্রত্যেকের মধ্যে প্রাচীনত্বে ভারতবর্ষ দ্বিতীয়, কিন্তু সংস্কৃত ভাষা স্বর্গে ও ভারতে তুল্যভাবে জগতের আদি মাতৃভাষারূপে গণনীয়া ও সপর্য্যার্হা। সেই সংস্কৃত ভাষার বিকারেই যে জগতের সমগ্র ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে দ্বিধামাত্র নাই। ফলতঃ যখন এক দিন সমগ্র জগতের ভাষা সংস্কৃত ছিল, তখন উহারই বিকারে যে জগতের অন্যান্য অর্ব্বাচীন ভাষার উৎপত্তি হইবে, তাহা যেন সম্পূর্ণই অবশ্যম্ভাবী। অশেষ-

ভাষাতত্ত্ববিৎ ভট্ট মোক্ষমূলারের প্রসন্নমনেও একদিন এই সত্যের স্ফুরণ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার Science of Language নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের একত্র বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে—

But why, it may naturally be asked, why should the discovery of Sanskrit bring so complete a change in the classificatory study of languages? If Sanskrit had been the primitive language of mankind, or at least the parent of Greek, Latin, and German, we might understand that it should have led to quite a new classification of these languages.

তবে কি সংস্কৃত ভাষা একদিন সমগ্র জগতের আদিম ভাষা ছিল? অথবা অন্ততঃ উহা গ্রীক, লাটিন ও জর্ম্মাণ ভাষার মাতৃস্থানীয়? কিন্তু, হইলে কি হয়, পরক্ষণেই এ বিদ্যুল্লেখা তাঁহার হৃদয়াকাশে আর কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ করিল না। দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় উহা তাঁহার হৃদয়ে বিলীন হইয়া গেল। তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন—Sanskrit, as we saw before, could not be called their parent, but only their eldest sister.

অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা, অন্যান্য ভাষার মাতৃস্থানীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না, তবে উহাদের জ্যেষ্ঠা ভগিনী মাত্র। কিন্তু পক্ষান্তরে তাঁহার সমধর্ম্মা সমকর্ম্মা স্বদেশবাসী মহামতি Hammer সাহেব প্রসাদপ্রসন্নচিত্তেই বলিতে বাধ্য হইলেন যে—

So far as the etymological investigation of the Sanskrit has hitherto afforded satisfactory results, it may certainly be considered as the parent stock of all the known languages.

ভাষাতত্ত্বের আলোচনা ও গবেষণা দ্বারা ইহা নিশ্চিতরূপেই স্থিরীকৃত হইয়াছে যে সংস্কৃত ভাষাই জগতের পরিচিত সমুদায় ভাষার মাতৃস্বরূপা। মোক্ষমূলরেরও প্রাণের কথা ইহাই, তথাপি কেন তিনি কোন যুক্তি বা হেতু প্রদর্শন না করিয়াই আপনার মতের প্রত্যাহার করিলেন? অখৃষ্টান ও অশ্বেতকায় ভারতবাসীকে এতদূর উপরে তুলিয়া দিব? যেন এই ভাবই তাঁহাকে সত্য হইতে দূরে লইয়া গেল। কিন্তু তাঁহারা বলুন, আর নাই বলুন, স্বীকার করিতে অগ্রসর হউন আর নাই হউন, একদিন এমন দিন আসিবে, যে দিন সভ্যজগতের সমগ্র নরনারী একতানহৃদয়ে সমস্বরে ভারতবর্ষকে জ্ঞান ও ধর্ম্মের নিদানভূমি ও সংস্কৃত ভাষাকে জগতের সমগ্র আর্য্য ও অনার্য্যভাষার আদি জননী বলিয়া স্বীকার করিতে আর এমন শিরঃকণ্ডূয়ন করিবেন না। ফলতঃ পূর্ব্বে যে সংস্কৃত ভাষা মানবের কথোপকথন ভাষা ছিল, এবং উহাই যে আদি ভাষা, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। আমরা বাইবেল দ্বারাও এ কথার আংশিক সমর্থন করিতে চেষ্টা পাইব। বাইবেল বলিতেছেন যে—

And the whole earth was one language, and of one speech 2. And it came to pass, as they journeyed

from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and dwelt there. Genesis, chapter II.

রামায়ণও বলিতেছেন যে—

অমরেন্দ্র ময়া বুদ্ধ্যা
প্রজাঃ সৃষ্টা স্তথা প্রভো।
একবর্ণাঃ সমাভাষা
একরূপাশ্চ সর্ব্বশঃ॥

১৯-৩০স-উত্তর কাণ্ড।

হে অমরেন্দ্র, আমি বুদ্ধিপূর্ব্বক একরূপ প্রজা সকল সৃষ্টি করিয়াছি, যাহাদের ভাষা এক, বর্ণ এক ও রূপ এক। ঋগ্বেদও বলিতেছেন যে—

দেবীং বাচমজনয়ন্ত দেবাঃ,
তাং বিশ্বরূপাঃ পশবো বদন্তি।

১১-৮৯স্-৮ম।

অর্থাৎ দেবতারা গীর্ব্বাণবাণী সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। পূর্ব্বে পৃথিবীর সকল মানুষ উক্ত সংস্কৃত ভাষাতেই কথোপকথন করিত। হনুমান চিন্তা করিতে করিতে বলিতেছিলেন যে—

অহং হ্যতিতনু শ্চৈব
বানরশ্চ বিশেষতঃ।
তস্মাৎ বক্ষ্যামহং বাক্যং
মনুষ্য ইব সংস্কৃতম্॥

১৭-৩০-সর্গ—সুন্দর কাণ্ড।

আমি বানরজাতীয় ভিন্নভাষাভাষী লোক, তাহাতে সীতার সম্পূর্ণ অপরিচিত, অতএব আমি সীতার সহিত মনুষ্যের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় কথা বলিব।

অতএব বেশ বুঝা গেল যে সংস্কৃত একদিন মানুষের কপোলচল ভাষা ছিল। এবং উহাই মানুষের আদি ভাষা। দুর্গাচার্য্য ও সায়ণ ঋগ্বেদের উল্লিখিত মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া স্পষ্টতই বলিয়াছেন যে—"তৎ পূর্ব্বকাং বাক্ প্রবৃত্তেঃ"—অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার সৃষ্টি হইতেই জগতে ভাষার আরম্ভ হইয়াছিল, তৎপূর্ব্বে জগতে ভাষার প্রচলন ছিল না। তবে সংস্কৃতভাষার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই উহা অপভ্রষ্ট হইতে আরব্ধ হইয়াছিল। কালে কেবল ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাই সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতেছিলেন। যথা—

সাহিত্যদর্পণম্—

পুরুষাণা মনীচানা সংস্কৃতং সংস্কৃতাত্মনাং।

৩৮৭ পৃষ্ঠা।

রামায়ণপাঠেও জানা যায় যে কালে সংস্কৃত কেবল ব্রাহ্মণদিগের ভাষায় পরিণত হইয়াছিল।

ধারয়ন ব্রাহ্মণরূপম্ ইল্বলঃ সংস্কৃতং বদন্।
আমন্ত্রয়ত বিপ্রান স শ্রাদ্ধমুদ্দিশ্য নির্ঘৃণঃ॥

নির্দয় ইল্বলাসুর কৃত্রিম শ্রাদ্ধের আয়োজন করিয়া ব্রাহ্মণরূপ ধারণ পূর্ব্বক সংস্কৃত বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিত। সুতরাং যখন জগতের আদি কপোলচল ভাষা সংস্কৃত ছিল তখন উহারই বিকারে যে জগতের গ্রীক, লাটিন, জেন্দা, জর্ম্মাণ, শাক্সন ইংরেজী আরবী, হিব্রু ও বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হইবে, তাহা ধ্রুবই। অপিচ সেই সংস্কৃত ভাষা যে ক্রমে অপভ্রষ্ট হইয়া অন্যান্য ভাষার উৎপাদন করিতেছিল, তাহা বেদও পরিজ্ঞাত ছিলেন। ঋগ্বেদ বিশদাক্ষরেই বলিয়া গিয়াছেন—

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি
তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মনীষিণঃ।

গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি,
তুরীয়ং বাচং মনুষ্যা বদন্তি॥
৪৫—১৬৪সূ—১ম

অর্থাৎ কালক্রমে মূল সংস্কৃত ও অপভ্রষ্ট লইয়া ভাষা সমুদায়ে চারিটি হইল। মনীষী ব্রাহ্মণগণ এই চারিটি ভাষাই জানিতেন। উহার মধ্যে তিনটি পর্ব্বতগুহায় নিহিত ছিল। অর্থাৎ পার্ব্বত্য অসভ্যজাতিরা উহাতেই কথা কহিত, আর মনুষ্য বা আর্য্যজাতি চতুর্থভাষা সংস্কৃতে কথোপকথন করিতেন। বলিতে পার যে ঐ গীর্ব্বাণবাণীই আদি ভাষা, গ্রীক, লাটিন, জেন্দা ও সংস্কৃত তাহার কন্যা এবং এই তুরীয় বাচংই সেই গীর্ব্বাণবাণী, পরন্তু সংস্কৃত নহে। কিন্তু তাহা নহে। ঋষিরাই বলিয়া গিয়াছেন—

সংস্কৃতং দেবতাবাণী
কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ। কাব্যচন্দ্রিকা।
সংস্কৃতং স্বর্গিণাং ভাষা
শব্দশাস্ত্রেষু নিশ্চিতা।
বাগ্‌ভটালঙ্কার।

সুতরাং সংস্কৃত ও গীর্ব্বাণবাণী একই এবং তাহা হইলেই সংস্কৃতভাষাই যে জগতের আদি ভাষা, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে। কেনেরি দ্বীপের লোকেরা শীশ দিয়া কথা কহে, যেহেতু তাহারা স্বর্গে ভাষা সৃষ্টির পূর্ব্বেই স্বর্গ ত্যাগ করিয়াছিল। গগররা পুরোহিতকে "দেউসী" বলিয়া থাকেন, উহাও আমাদের দেবোপাসক বাক্যেরই অপভ্রংশ। সুতরাং কি আর্য্যভাষা, কি অনার্য্যভাষা, সমুদয়ই সংস্কৃতমূলক। কাব্যাদর্শও বলিয়াছেন যে—

তদেব বাঙ্ময়ং ভূয়ঃ
সংস্কৃতং প্রাকৃতং তথা।
অপভ্রংশশ্চ মিশ্রঞ্চে-
ত্যাহুরাপ্তাশ্চতুর্বিধম্॥৩২
সংস্কৃতং নাম দৈবী বাক্
অন্বাখ্যাতা মহর্ষিভিঃ।
তদ্ভবস্তৎসমোদেশী
অনেকঃ প্রাকৃতক্রমঃ॥৩৩
৩০-৩১ পৃষ্ঠা।

ইতিপূর্ব্বে বেদ বলিয়াছেন যে সংস্কৃত ও প্রাকৃত লইয়া ভাষা সমুদায় চারিটি। দণ্ডীও তাহাই বলিতেছেন যে, আপ্ত, বা বৈদিক ঋষিরা সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও মিশ্রভেদে ভাষাকে চারিপ্রকার বলিয়া গণনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে সংস্কৃত ভাষাই দৈবীবাক্ গীর্ব্বাণবাণী, আর উহার অপভ্রংশপ্রভব ভাষার নামই প্রাকৃত। প্রকৃতিঃ সংস্কৃতং তদ্ভবং প্রাকৃতম্। উহা তদ্ভব, তৎসম ও দেশীয় (প্রাদেশিক) প্রভৃতিভেদে বহুধা বিভক্ত। কাহার কাহারও মতে প্রাকৃত ভাষা দ্বিবিধ। যথা—

আর্ষোত্থং আর্ষতুল্যঞ্চ
প্রাকৃতং দ্বিবিধং বিদুঃ।

আর্ষ বা ঋষিপ্রোক্ত সংস্কৃতভাষাপ্রভব ভাষার নাম আর্ষোত্থক তদ্ভব। আর যাহা তদ্ভব হইয়াও কতকাংশে সংস্কৃতবহুল, তাহার নাম তৎসম।

| | | |
|---|---|---|
| অঙ্কং সমাধত্তে | . | সংস্কৃত |
| অঙ্ক কষিতেছে | ... | তৎসম |
| আঁক কষিতেছে | .. | তদ্ভব। |

এই জন্য আমরা সংস্কৃত ও প্রাকৃতবহুল গ্রীক, লাটিন, জেন্দা ও বাঙ্গলা, মাগধী, শৌরসেনী এবং মহারাষ্ট্র প্রভৃতি ভাষাকেই তৎসমভাষা বলিতে অভিলাষী। আর পালী প্রভৃতি

প্রাকৃতাত্মকভাষা সমূহই তত্ত্বসংজ্ঞাভাক্। সংস্কৃতভাষা যে বৈদিকযুগেই অপভ্রষ্ট হইতে আরদ্ধ হইয়াছিল, তাহা অপভ্রষ্ট পদবহুল মন্ত্র-পাঠেই সপ্রমাণ হইয়া থাকে। অথর্ব্ববেদও প্রাকৃতভাষার অস্তিত্বসম্বন্ধে কতক আভাস প্রদান করিয়াছেন। যথা—

বিভেদং বলং নুনুদে বিবাচঃ।

৫৮৭পৃ ৪র্থ খণ্ড।

তত্র সায়ণাচার্য্য :—ইন্দ্রঃ বলং এতন্নামান-মসুরং বিভেদ অদারয়ং। বিবাচঃ বিরুদ্ধা প্রতিকূলা ( বিরুদ্ধা বাক্ যেষাং তে বিবাচঃ তানপি নুনুদে দরং নিরাচকার।

যাহা হউক যখন কোন দেশের কোন শাস্ত্রদ্বারাই ইহা জানা যায় না যে সংস্কৃত-ভাষার পূর্ব্বে আরও একটি ভাষার সৃষ্টি ও প্রচলন হইয়াছিল, তখন আমরা উহাকেই আর্য্য অনার্য্য সকল ভাষার আদি মাতা বলিতে অধিকারী। বলিতে পার, তবে উহার নাম সংস্কৃত হইল কেন? যাহা অসংস্কৃত ছিল, সেই ভাষাকেই ত আদি বলিয়া মনে করা কর্ত্তব্য? হাঁ, আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি যে কোন অসংস্কৃত ব্যত্যয়বহুল বিমিশ্র-ভাষাই সংস্কার প্রাপ্ত হইয়া সংস্কৃতনামের বিষয়ীভূত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি সেই অসংস্কৃতভাষাকে তোমরা সংস্কৃতের মাতৃভূতা কোন স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পার না। প্রত্যেক ব্যক্তিই জগতে শৈশব, বাল্য, কৌমার, কৈশোর, যৌবন ও প্রৌঢ়ের ভিতর দিয়া শেষে বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়া থাকে। তখন তাহার আকার প্রকারও পূর্ব্ববৎ থাকে না। কিন্তু তথাপি কি তোমরা সেই বৃদ্ধকে সেই একই ব্যক্তি বলিয়া জান না?

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ
সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং
ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয় এবহি॥ স্মৃতিঃ।

ব্রাহ্মণসন্তান রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করিয়া থাকিলেন শূদ্র রামচন্দ্র, সাবিত্রীগ্রহণ ও উপ-নয়নসংস্কারগ্রহণের পর তিনি হইয়া থাকেন দ্বিজ রামচন্দ্র। তৎপরে বিদ্যাভ্যাসদ্বারা তিনি বিপ্র রামচন্দ্র হইয়া শেষে শ্রোত্রিয়ে পরিণত হইয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাকে যদি তোমরা সংস্কারপ্রাপ্তির পর শ্যামচন্দ্র বলিয়া না জান, তাহা হইলে সংস্কারপ্রাপ্ত সংস্কৃত ভাষাকে তোমরা কি প্রকারে গীর্ব্বাণবাণী হইতে স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করিতে পার? কিরূপে ভাষার সংস্কার হইয়াছিল?

সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো
যত্র ধীরা মনসা বাচ মক্রত।

১—৭১সূ—১০ম।

যে প্রকার লোকে চালনীদ্বারা ছাঁকিয়া ছাতু পরিষ্কৃত করে, তদ্রূপ ধীরগণ মনে মনে উপায় কল্পনা করিয়া ভাষার সংস্কার বিধান করিয়াছেন। উক্তঞ্চ—

বাগ্ বৈ পরাচী অব্যাকৃতা অবদৎ
তে দেবা অব্রুবন্ ইমাং নো বাচং ব্যাকুরু।
তামিন্দ্রো মধ্যতো অবক্রম্য ব্যাকরোৎ
তস্মাদিয়ং ব্যাকৃতা বাগুদ্যতে। শ্রুতিঃ।

অর্থাৎ পূর্ব্বে ভাষা ব্যাকরণের নিয়মবদ্ধ ছিল না, লোকেরা যাহা তাহা বলিতেন। দেবতারা দেখিলেন যে, তাহাতে কাজ ভাল হইতেছে না, তজ্জন্য তাঁহারা ইন্দ্রকে ব্যাকরণ রচনা করিতে বলিলেন। তৎপর ইন্দ্র ব্যাক-রণ রচনা করিয়া ভাষাকে শৃঙ্খলিত করিলে

লোকেরা তাহাতে কথোপকথন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে চন্দ্র ও শিব স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যাকরণ রচনা করিয়া ভাষাকে সংযত করিয়াছিলেন। সেই সংযত ভাষার নামই সংস্কৃত ভাষা। সুতরাং উহা ও গীর্ব্বাণবাণী স্বতন্ত্র পদার্থ হইতেছে না। অতএব সংস্কৃতই যে জগতের আদি ভাষা এবং উহার বিকারেই যে জগতের সমুদায় আর্য্যভাষার উৎপত্তি হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই।

এখন দেখিতে হইবে, পাশ্চাত্য মনীষিগণ ও আমাদিগের মধ্যে মতগত প্রভেদ কি? তাঁহারাও বলিতেছেন যে, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন, জেন্দা, গথিক ও জার্ম্মাণ প্রভৃতি ভাষাতে প্রচুর ও প্রভূত সমতা বিদ্যমান ও এই সকল ভাষা একমূলজ; আমরাও তাহাই বলিতে ও মানিয়া লইতে নতকন্ধর। কিন্তু তাঁহারা যে সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষার আর একটি মাতৃভাষার পরিকল্পনা করিয়া থাকেন, তাহার কোন প্রমাণ পরিদৃষ্ট না হওয়ায়, এবং গ্রীক, লাটিন প্রভৃতি ভাষা যে সংস্কৃত ভাষা হইতেই সমুদ্ভূত, তাহার প্রচুর ও অপর্য্যাপ্ত প্রমাণ দেখিতে পাওয়ায় আমরা সংস্কৃত ভাষাকেই সকল ভাষার আদি জননী বলিতে লব্ধপ্রসর। শাস্ত্র বলিতেছেন, পূর্ব্বে মানুষের ভাষা এক ছিল। শাস্ত্রই বলিতেছেন, সেই ভাষার নামই সংস্কৃত ভাষা, এবং উক্ত সংস্কৃত ভাষা জগতের সমুদায় নরনারীর কথোপকথন ভাষা ছিল। সুতরাং সেই সংস্কৃত ভাষাভাষী লোকদিগের অনন্তরবংশ্য আমরা যে, হয় সেই সংস্কৃত, না হয় উহার অপভ্রংশপ্রভব কোন ভাষার ব্যবহার করিব, ইহা ধ্রুবই। ফলতঃ যাঁহারা সংস্কৃত ভাষার দেশ হইতে (স্বর্গই হউক আর ভারতই হউক) অন্য দেশে গমন করিয়াছিলেন তাঁহারা তাঁহাদিগের পৈতৃক সভ্যতা, ভব্যতা, সদাচার ও জ্ঞান লইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে পৈতৃক ভাষাও লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে কোন দ্বিধাই নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের বর্ত্তমান ভাষাকদম্বক যে সেই সংস্কৃতমূলক বা সংস্কৃতপ্রভব, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব সংস্কৃতই যে জগতের সমুদায় আর্য্যভাষার আদি জননী তাহা প্রতীত হইতেছে।

---

# ধর্ম্মদাস-বিয়োগে।

স্বর্গ সুষমা চাঁদিনী কিরণে সুপ্ত
শান্তি—কত শান্তি ঐ নীল আকাশে ব্যাপ্ত
তথে ছাঁকা ধরণী শান্ত তপস্যাময়
ঘুমায়েছে প্রকৃতি উদ্বেগবিন্দুশূন্য

এস শান্তি—এস সুখ,
জ্বলে গেল পোড়াবুক—
থাম—চুপ্—ঐ যাঃ, কি যেন কি হয়ে গেল
কেবলি অস্থি ঐ শ্মশানের নীল আলো
পরাণ চমকি দিছে—এ করেছে ভাল—
ওগো নিষ্ঠুর—এ তুমি এ করেছো ভাল।

হাসিছে কুসুম পত্রআবরণমুক্ত
চুমিছে পবন সুখিত পুলকযুক্ত
ক্ষুদ্র দেববালা যেন মঙ্গল বিবিক্ত
ঝরিছে শিশির-সুধা নিশাতনু সিক্ত
শোভিছে স্নিগ্ধ শান্তি
দূর হও পোড়া ভ্রান্তি
থাম—চুপ্—যেন কত কি যে হাহাকার
হৃদয় চাপিয়া করে সব ছারখার
বড় জ্বালা বড় দুঃখ—এ করেছো ভাল
ওগো নিষ্ঠুর—এ তুমি এ করেছো ভাল।

মন্দানিল চঞ্চল সারানিশি ব্যাকুল
আকাশের ফুল সনে কও কি নিঝুম?
নিশিতানে ঝিল্লী গায় হাসাইয়া ফুল
আর তুমি ভেঙ্গে দাও তটিনীর ঘুম
জগতের দুঃখ তন্ত্রী বাজে না কি প্রাণে
কর্ম্মস্রোতে ভোল কি গো সে দুঃখেরি তানে?
তবে এসো তুমি কর্ম্ম
জাগুক হৃদয়ে ধর্ম্ম
থাম—চুপ্—না আর না নিষ্ঠুরের স্মৃতি
মুছে যাও তুমি—কিন্তু ধীরে ধীরে অতি
শান্তি দাও পরমেশ, ঘুচাও হুতাশ—
তথাপি তথাপি ধীরে ধীরে ধর্ম্মদাস।

———

# প্রকৃতির শিল্পশালা।

শিল্পাগার বলিলেই শিল্পীর কথা মনে হয়, আর মনে হয় একটা ছোট কি বড় রকমের কারখানা। হয়ত তাহার মধ্যে কর্ম্মকার কি সুত্রধর কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া কাষ্ঠ কি ধাতু পদার্থ কাটিতেছে, গলাইতেছে, গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে। আমরা কেবল কর্ম্মকার কি সূত্রকারকেই শিল্পী বলিয়া জানি তাহা নহে, আরও শিল্পী আছে। ইহারা সকলেই মনুষ্য-শিল্পী। আজ আমরা মনুষ্য শিল্পীর কথা বলিব না। প্রকৃতি-শিল্পীর কথাই আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়। মনুষ্য শিল্পীর মান সম্ভ্রম মানুষের হাতে, কিন্তু প্রকৃতি শিল্পী সকলের পূজ্য। প্রকৃতিকে লক্ষ্য করিয়া মানুষ কেন সকল মানুষ-শিল্পীর সম্মান করে না তাহা বুঝিতে পারি না। যদি সম্মান করিত তাহা হইলে আমাদের উন্নতির পথও এত সঙ্কুচিত হইত না। প্রকৃতি আমাদের আরাধ্যা, আমাদের অনুকরণীয়া। প্রকৃতির যাহা কার্য্য মানুষ সে কার্য্য করিলে মানুষ তাহাকে কেন সম্মান করে না? মানুষের স্বার্থপরতাই তাহার কারণ। যেদিন আমরা সেই স্বার্থ-পরতা পরিত্যাগ করিয়া মানুষকে সমাদর করিতে শিখিব সেই দিন আমাদের জাতীয় জীবনের নূতন দিন উপস্থিত হইবে। সেই দিন বুঝিব আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে চলিলাম। যাউক, সে সব কথার সময় ইহা নহে।

প্রকৃতির শিল্পাগারের শিল্পী কি? আমরা যে সব শিল্পীর কথা বলিলাম তাহাদের কোন্ জন প্রকৃতির শিল্পাগারের শিল্পী? শিল্পাগারে কতরকম পদার্থ দেখিতে পাই। কোথাও দেখি হু হু শব্দে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, তাহার উত্তাপে তাহাতে যাহা ফেলিয়া দেওয়া যাইতেছে তাহাই গলিয়া যাইতেছে। কোথাও দীপ্তিমান উত্তপ্ত লৌহখণ্ড, আঘাততাড়িত হইয়া চতুর্দ্দিকে শত শত অগ্নিকণা বিকীর্ণ করত উল্কাবলি পরিশোভিত আকাশ মণ্ডলের অনুকরণ করিতেছে। কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠখণ্ড খণ্ডিত বিখণ্ডিত হইয়া নয়ন-প্রীতিকর পদার্থনিচয়ে পরিণত হইতেছে। যেখানেই দেখি সেই খানেই উপাদান পদার্থ শিল্পীর কার্য্য কুশলতায় কত শত অভিনব সন্নিবেশে কত শত সুন্দর সুন্দর আকার ধারণ করতঃ পদার্থান্তরে পরিণত হইতেছে। এক বস্তুদ্বারা অপর বস্তু গঠিত হইতেছে। কিন্তু কোথাও এমন দেখি নাই যেখানে শিল্পী নিজ-শক্তি প্রভাবে উপাদান পদর্থ সৃষ্টি করিল, অশরীরী শূন্য হইতে শরীরবিশিষ্ট পদার্থ আবির্ভূত করিল। শিল্পীর উপাদান চাই, উপাদান সাহায্যে বুদ্ধিবলে সে নূতন পদার্থ গঠিত করিয়া দিবে। ছোট ছোট ইটগুলি লইয়া সে এমন করিয়া সাজাইয়া সুন্দর সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিবে যে দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হইবে। অট্টালিকার জন্য

ইষ্টক চাই। বিনা ইষ্টকে অট্টালিকা হইবে না। আবার ইষ্টকের জন্য মৃত্তিকা চাই, বিনা মৃত্তিকায় ইষ্টক হইবে না। কিন্তু মৃত্তিকা সৃষ্টি করার শক্তি শিল্পীর নাই। সূত্রধর কাষ্ঠ হইতে সমুদ্রগামী জাহাজ নির্ম্মাণ করিবে, কিন্তু কাষ্ঠ সৃষ্টি করিবার তাহার শক্তি নাই। কর্ম্মকার লৌহ অবলম্বনে কামান প্রস্তুত করিবে, কিন্তু লৌহ প্রস্তুত করিবার শক্তি তাহার নাই। কাষ্ঠ, মৃত্তিকা, লৌহ মনুষ্যের বস্তুনির্ম্মাণস্পৃহা চরিতার্থ করিবার জন্যই যেন অনন্তকাল ধরিয়া পৃথিবী-গর্ভে অধিষ্ঠান করিতেছে। কিন্তু কাষ্ঠ লৌহ মৃত্তিকাও ক্ষুদ্রাবয়ব পদার্থ নিচয়ের সন্নিবেশে আকারবিশিষ্ট হইতেছে। অট্টালিকা সম্বন্ধে যেরূপ, ইষ্টক কাষ্ঠাদি সম্বন্ধেও ঐ সব ক্ষুদ্রাবয়ব পদার্থও তাহাই। কাষ্ঠ মৃত্তিকা লৌহাদিও শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচায়ক। কোন্ মনুষ্য-শিল্পী এমন আছে যে নিজ নৈপুণ্যবলে এমন পদার্থ গড়াইতে পারে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যেদিকে চাই প্রকৃতির শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া চমৎকৃত হই। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র নগণ্য পদার্থ হইতে আরম্ভ করিয়া বৃহৎ বৃহৎ পদার্থ পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে প্রকৃতি আপনার শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিতেছে।

আকাশে জ্যোতিষ্কমণ্ডলী একটি একটি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হীরকখণ্ড। পরিষ্কার রজনীতে আকাশমণ্ডলের মাধুরির কে অনুকরণ করিতে পারে? প্রকৃতি কেমন সুন্দর ভাবে একটি একটি চন্দ্র লইয়া একটি একটি পৃথিবীর চারিদিকে সাজাইয়া দিয়াছে, কেমন সুন্দর ভাবে একটি একটি পৃথিবী লইয়া একটি একটি সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে বসাইয়া দিয়াছে। শুদ্ধ কি তাহাই? চন্দ্র পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এক একটি সূর্য্যের কতগুলি পৃথিবী, কতগুলি চন্দ্র। অথচ কোন গোলযোগ নাই, এক পৃথিবী আর এক পৃথিবীর উপরে আসিয়া পড়িতেছে না, এক চন্দ্র আর এক চন্দ্রের পথ রোধ করিতেছে না। সকলে নিজ নিজ কক্ষে নিজ নিজ দায়িত্ব নিজ নিজ স্কন্ধে লইয়া নির্ণিমেষ গতিতে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। আবার সূর্য্যই কি এক? আকাশময় সূর্য্য। আকাশে যতগুলি নক্ষত্র আছে, প্রত্যেকটি এক একটি সূর্য্য। প্রত্যেক সূর্য্যই আমাদের সূর্য্যের ন্যায় গ্রহ উপগ্রহাদিতে পরিশোভিত। অথচ প্রত্যেক সূর্য্যই গতিবিশিষ্ট। কিন্তু সকলগুলি এমন সুন্দর নিয়মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত যে কেহই কাহারও প্রতিবন্ধক হইতেছে না। আকাশপটে প্রকৃতির শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত ও বিস্মিত হই। এখানেও প্রকৃতি একটি একটি দ্রব্য লইয়া কেমন সুন্দর ভাবে আকাশ গড়িয়াছে, আবার সেই একটি একটি দ্রব্যেতে যে কত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম উপাদান পদার্থ আছে, তাহা কে গণনা করিবে? কিন্তু মনুষ্যের শিল্পের সঙ্গে প্রকৃতির শিল্পের অনেক প্রভেদ। মনুষ্য উপাদান পদার্থের সাহায্যে গড়িয়া থাকে, প্রকৃতি উপাদান পদার্থও গড়িয়া লয়। আবার গঠিত পদার্থ সম্বন্ধেও প্রকৃতির সহিত মনুষ্য-শিল্পের তুলনা হয় না। মনুষ্য নগণ্য, প্রকৃতি মহীয়সী।

এক একটি নক্ষত্র লইয়া হয়ত এক একটি জগৎ। হউক আর নাই হউক, আমাদের সূর্য্যকে লইয়া সৌরজগৎ। এই জগতের

প্রত্যেক সামগ্রী কেমন সুন্দর সুশৃঙ্খলায় পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ। যে শিল্পী সূর্য্যকে কেন্দ্রস্থ রাখিয়া তাহার চতুষ্পার্শে গ্রহগণকে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করাইতেছে, সে সামান্য শিল্পী নহে। সময়পরিমাপক ঘটিকা যন্ত্রকে সময়ে সময়ে চালিত করিতে হয়, সৌরজগৎ যন্ত্র, একবার মাত্র পরিচালিত হইয়াছে, কত-কাল ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে এবং কতকাল ধরিয়া চলিবে আমরা মনেও তাহা আনিতে পারি না। এ যন্ত্রের চাবি নাই, যন্ত্র আপনার শক্তিবলে আপনিই চলিতেছে। ঘটিকা যন্ত্রের অংশগুলি পরস্পরকে স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে, সৌরজগৎ-যন্ত্রের অংশগুলি পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন। পরস্পরের মধ্যে বহু যোজন বিস্তৃত অবকাশ রহিয়াছে। অবকাশই সৌরজগৎ পরিচালনের অন্যতম কারণ। যদি গ্রহগণের মধ্যে ব্যবধান না থাকিত, তাহা হইলে কি সৌরজগৎ এমন সুনিয়মে পরি-চালিত হইত? তাহা হইলে গ্রহগণ পরস্পর মিলিত হইয়া যাইত এবং সমস্ত গ্রহই সূর্য্যে আসিয়া পতিত হইত। আকাশের ভিতর দিয়া যে কি এক অচিন্তনীয় শক্তি গ্রহগণকে নিজ নিজ কক্ষে স্থির রাখিয়াছে, আমরা তাহার ধারণা করিতেই অক্ষম। ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা প্রত্যেক ঘটনারই যে কেবল একটা কারণ স্থির করিয়া দিই, তাহা নহে, কারণের নাম করণও করিয়া থাকি। যে শক্তির দ্বারা গ্রহ-গণ পরিচালিত হইতেছে Newton তাহার নাম দিয়াছেন মাধ্যাকর্ষণ, আর মাধ্যাকর্ষণকেই আমরা গতির কারণ বলিয়া থাকি। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ আকর্ষণরূপ কার্য্যের নামমাত্র, উহা কারণ নহে। কারণ আমরা কাহাকে বলি? যখন দুইটি ঘটনা পরস্পর এইরূপ সম্বন্ধ থাকে যে, একটির উদয়ে অপরটি সংঘটিত হইবে, তখন পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাটি কারণ এবং পরবর্ত্তীটি তাহার কার্য্য। এখানে মাধ্যাকর্ষণ ও গ্রহগণের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের আকর্ষণ ত একই পদার্থ, একটি অপরটির পূর্ব্বগামী নহে। সুতরাং প্রকৃতি কি প্রকার সূত্র দ্বারা গ্রহগণকে সূর্য্যের সঙ্গে আবদ্ধ করিয়াছে এবং কেমন করিয়া সৌরজগতের সুশৃঙ্খলা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে তাহা আমরা একে-বারেই বুঝিতে অক্ষম। আমরা গতির নিয়ম মাত্র অবগত আছি। সেই নিয়ম অনুসারে বলিতে পারি, যদি কোন কারণে পৃথিবীর নিজ কক্ষের গতির রোধ হয় তাহা হইলে দ্রুত হইতে দ্রুততর গতিতে সে সূর্য্যের অভিমুখী হইতে থাকিবে। যতই সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইবে ততই গতির বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। দূরত্বের যতই হ্রাস হইবে গতির মাত্রা সেই দূরত্বের বর্গানুপাতে বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। অবশেষে পৃথিবী সূর্য্যে আসিয়া পতিত হইবে। এখানে আসিয়া পৃথিবীর গতির অবসান হইবে বটে, কিন্তু উহার পরিবর্ত্তে অগ্নির সৃষ্টি হইবে। এই অগ্নির ভীষণত্ব মনুষ্য গণনা করিয়া স্থির করি-য়াছে। বিজ্ঞানবিৎ Helmholtz এবং Thomson গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে আমাদের পৃথিবী যত বড়, ঠিক তত বড় পাঁচ সহস্র মৃদঙ্গার গোলকের স্তূপ যদি একেবারে প্রজ্বলিত করা যায় তাহা হইলে তাহাতে যে অগ্নির উৎপত্তি হইবে, সূর্য্যে পৃথিবী আসিয়া পড়িলে ঠিক সেইরূপ অগ্নির উৎপত্তি হইবে।

যাহা হউক, আকর্ষণ বিশ্বসৃষ্টির একটি প্রধান উপকরণ। বড়তে বড়তে ছোটতে

ছোটতে প্রত্যেক পদার্থের প্রত্যেকের সহিত আকর্ষণ আছে। সৌরজগৎ বৃহৎ ব্যাপার। আকর্ষণই এই জগৎ পরিচালনের মূল, এখানে গ্রহে গ্রহে আকর্ষণ, গ্রহে সূর্য্যে আকর্ষণ, বড়র সহিত বড়র আকর্ষণ। বড় ছাড়িয়া দিয়া যদি ক্ষুদ্রের দিকে দেখা যায় তাহা হইলে সেখানেও ক্ষুদ্রের সহিত ক্ষুদ্রের আকর্ষণ। আমরা রাসায়নিক সম্বন্ধ ( chemical affinity ) বলিলে বুঝি ক্ষুদ্রের সহিত ক্ষুদ্রের আকর্ষণ। যদি উদজান ও অম্লজান ( hydrogen and oxygen ) বাষ্পদ্বয়কে একত্র করিয়া উত্তাপ সংযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে উহারা পরস্পর মিলিত হইয়া জলের উৎপত্তি করে। এ মিলনের একটু বিশেষত্ব আছে। বাষ্পদ্বয়ের পরমাণু সকল বাষ্পশরীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিভিন্ন প্রকার মিলন সম্পন্ন করে। অর্থাৎ অম্লজান বাষ্পপরমাণু উদজান বাষ্পের পরমাণুর সহিত মিলিত হয়। পরমাণুতে পরমাণুতে মিলন। বাষ্পশরীরে বাষ্পশরীরে মিলন নহে। মিলনের অন্যতম পরিণতি অগ্নি। অর্থাৎ বাষ্পদ্বয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় মিলিত হইয়া জল সৃষ্টি করিলে, ভীষণ তাপের আবির্ভাব হয়। বৈজ্ঞানিকেরা এ তাপের পরিমাণ স্থির করিয়াছেন। আমরা দুই রকমে তাপের উগ্রতা স্থির করিতে পারি। তাপপরিমাপক যন্ত্র Thermometer দ্বারা কত ডিগ্রি তাপ হইয়াছে তাহা স্থির করা, অথবা যে উত্তাপের উৎপত্তি হইল তাহা দ্বারা কি পরিমাণ জল কত ডিগ্রি উত্তপ্ত হইল তাহা জানা। প্রথমোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা জানা গিয়াছে যে উদজান ও অম্লজানের রাসায়নিক মিলনোদ্ভূত উত্তাপের পরিমাণ ২৫০০০° ডিগ্রি। দ্বিতীয় প্রকার প্রক্রিয়ায় দ্বারা সেই উত্তাপের যে জ্ঞান জন্মিতে পারে তাহা নিম্নলিখিত উপায়ে বুঝা যাইতে পারে। কোন গতিশীল পদার্থের হঠাৎ গতিরোধ হইলে উত্তাপ জন্মিয়া থাকে। কোন দ্রব্য যদি উচ্চ হইতে মৃত্তিকায় আসিয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাতে উত্তাপের উৎপত্তি হয়। যে দ্রব্য যত গুরু সে দ্রব্যে তত অধিক উত্তাপ জন্মিবে, আর যে দ্রব্য যত অধিক উর্দ্ধ হইতে পড়িবে তাহাতেও তত অধিক উত্তাপ জন্মিবে। সুতরাং অত্যধিক গুরুদ্রব্য অতি উচ্চ স্থান হইতে নিপতিত হইলে অনেক বেশী উত্তাপ জন্মিবে ইহা সহজেই অনুমেয়। এক্ষণে সেই উত্তপ্ত দ্রব্যের উত্তাপের দ্বারা যদি জল উত্তপ্ত করা যায় তাহা হইলে জলের পরিমাণ ও উত্তাপের ডিগ্রি দ্বারা উত্তাপের পরিমাণের একটা জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। জানা গিয়াছে যে যদি ৫২৫ মন ভারি কোন দ্রব্য ১০০০ ফুট উচ্চ স্থান হইতে পৃথিবীতে আসিয়া পড়ে তাহা হইলে তাহাতে যে পরিমাণ তাপের উদ্ভব হইবে, আদসের অম্লজানবাষ্প এক সের উদজান বাষ্পের সহিত মিলিত হইয়া জলের উৎপত্তি করিলে ঠিক সেই পরিমাণ উত্তাপের উদ্ভব হইবে। কি কারণে এত অধিক উত্তাপের সৃষ্টি হয় বৈজ্ঞানিকেরা তাহা অনুমান করিয়াছেন। এ বিষয়ে সকলে একমত নহেন; কেহ কেহ অনুমান করেন যে বাষ্পশরীরান্তর্গত পরমাণুসকল ভীষণ বেগবিশিষ্ট। দুই বিভিন্ন প্রকারের বাষ্প যখন রাসায়নিক শক্তিপ্রভাবে মিলিত হইতে থাকে তখন পরস্পরের পরমাণুগুলি পরস্পরের উপর সবেগে নিপতিত হয়। মাধ্যাকর্ষণই তাহার কারণ। মাধ্যাকর্ষণের নিয়মবলে পরমাণুগুলি যতই পরস্পরের

নিকটবর্ত্তী হয়, ততই তাহাদের গতি বর্গানুপাতে বেগবতী হইতে থাকে। সুতরাং পরমাণুগুলির সংঘর্ষ অত্যন্ত বেগের সহিতই হইয়া থাকে। সেই জন্যই উত্তাপের সৃষ্টি। কোন কোন বিজ্ঞানবিৎ রাসায়নিক আকর্ষণকে মাধ্যাকর্ষণ হইতে পৃথক্‌ভাবে বুঝিয়া থাকেন। তাঁহাদের ভিন্ন প্রকার মতের কারণ এই যে, একই প্রকার পরমাণুর মধ্যে রাসায়নিক আকর্ষণ নাই। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন-প্রকার পরমাণুগণ পরস্পরের অতি সান্নিধ্যবশতঃ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, পরস্পরের ব্যবধান একটু অধিক হইলে সে আকর্ষণ প্রকাশ পায় না। মাধ্যাকর্ষণ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় উভয় প্রকার পদার্থেই দৃষ্ট হয় এবং উহার শক্তি প্রকাশের জন্য দূরতার কোন নির্দ্দিষ্টতা নাই। সূর্য্যের আকর্ষণ শক্তি পৃথিবীতে আসিয়া পড়িতেছে, পৃথিবীর শক্তি চন্দ্রে যাইতেছে ইত্যাদি। তাঁহারা বলেন, রাসয়নিক আকর্ষণ ও মাধ্যাকর্ষণ স্বতন্ত্র, এক জাতীয় পদার্থ নহে। বিশ্বসংসারের কার্য্য-প্রণালী এতই অদ্ভুত যে তাহার নিগূঢ়তত্ত্ব অনুশীলন করিবারও সামর্থ্য আমাদের নাই।

বড় বড় বিষয় যাউক, প্রকৃতির শিল্পশালার একটি সাধারণ ঘটনা লইয়া দেখি। আকাশ ( এখানে আকাশ শব্দে Sky বুঝিতে হইবে, Ether নহে ) আমাদের পরিচিত বস্তু। কিন্তু কি লইয়া আকাশ? গ্রহ নক্ষত্রাদি বাদ দিলেও আকাশ থাকে। আকাশের রং নীল। সুনির্ম্মল রজনীতে আকাশের নীলিমা দেখিয়া জীবনে মোহিত হন নাই এমন ভাবুক বিরল। সুবিস্তৃত বিশ্বরাজ্যের যতদূর নেত্রগোচর হয় ততদূরই নির্ম্মল নীল আকাশ। আকাশে নীল রং কে মাখাইল, আর কোন্ পদার্থের উপরই বা নীলের আভা মাখান হইয়াছে? প্রকৃতির শিল্পশালার কি অনির্ব্বচনীয় বিকাশ, কি মনোমুগ্ধকর ইন্দ্রজাল। যেখানে পদার্থ নাই সেখানে সম্পদ, যাহা অদৃশ্য তাহা দৃষ্টির গোচরীভূত। অথচ আকাশের নীলিমার বাস্তব অস্তিত্ব নাই। ব্যোমযান সাহায্যে যদি অতি উৰ্দ্ধদেশে গমন করা যায় তাহা হইলে নীল নভস্থলের পরিবর্ত্তে মসীময় আকাশ দৃষ্ট হয়। নিরবচ্ছিন্ন তিমির সাগরের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ক্ষীণ আলোকোদ্গম অন্ধকারের ভীষণত্ব সূচিত করিয়া দেয়। ইহা দেখিয়া আমরা কোন সাহসে বলিব, আকাশের রং নীল। তবে কোথা হইতে এ নীল বর্ণের আবির্ভাব হইল? এ প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে উহাই একটি স্বতন্ত্র বিষয় হইয়া পড়ে। তবে স্থূল স্থূল দুই একটি কথা না বলাও সঙ্গত নয়। সেই জন্য সংক্ষেপে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে এখানে চেষ্টা করিতেছি।

আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে নীল আকাশ দেখি, উৰ্দ্ধদেশ হইতে আকাশ দেখা যায় না। তৎপরিবর্ত্তে কেবল তিমিরাচ্ছন্ন প্রদেশ দৃষ্ট হয়। নীল আকাশের উৎপত্তির কারণ পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশস্থিত বায়ুস্তর এবং তাহাতে যে সকল পদার্থ মিশ্রিত বা ভাসমান আছে তাহারা। কেবল বায়ু নীল আকাশের কারণ নয়। তাহা যদি হইত তাহা হইলে ব্যোমযান সাহায্যে উৰ্দ্ধতম দেশে আমরা যাইয়াও নীল আকাশ দেখিতে পাইতাম। যত উর্দ্ধেই আমরা যাই না কেন, একেবারে বায়ুশূন্য প্রদেশে আমরা কখনই যাই নাই বা যাইতে

পারি না। তবে সেই সকল প্রদেশে বায়ুস্তর লঘু। সুতরাং বায়ু কারণ হইলে উৰ্দ্ধদেশেও আকাশের নীলিমার অভাব হইত না। পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ হইতে ঊর্দ্ধদিকে বায়ুস্তর ক্রমশঃ লঘু হইতে লঘুতর হইয়া রহিয়াছে। ঘনীভূত বায়ু নানাবিধ পদার্থ বহন করিতে সক্ষম। সেইজন্য পৃথিবীর পৃষ্ঠের উপর যে বায়ুস্তর রহিয়াছে তাহাতে মেঘাভ্যন্তরস্থিত অতি সূক্ষ্ম জলবিম্ব অঙ্গারক ও অন্যান্য বাষ্প এবং কঠিন পদার্থের সূক্ষ্ম কণা সকল সর্ব্বদাই মিশ্রিত ও ভাসমান আছে। উর্দ্ধ প্রদেশে বায়ুস্তরের লঘুতা হেতু এই সকল পদার্থ তাহাতে সম্যক্‌রূপে ভাসমান থাকিতে পারে না। এই সকল সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলবিম্ব এবং কঠিন পদার্থের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা সকল নীল আকাশ সৃষ্টির কারণ। সূর্য্যরশ্মি এই সমস্ত অতিসূক্ষ্ম জলবিম্ব বা কঠিন কণায় প্রতিফলিত হইয়া নীল আকাশ উৎপন্ন করে। সূর্য্যরশ্মি রামধনুস্থিত লোহিত, পীত, নীল ইত্যাদি সাতটি বর্ণের সমষ্টি। অবস্থাবিশেষে সাতটি বর্ণকেই পৃথক্ করা যাইতে পারে। যখন সাতটি বর্ণ একত্রীভূত হয় তখন তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পাইয়া শ্বেতবর্ণের উদ্ভব হয়। ঝাড়ের গায়ে যে সকল ত্রিশির কাচকলস দোদুল্যমান থাকে তাহার একটি লইয়া যদি তাহার মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মি প্রেরণ করা যায় এবং যদি কলসের অপর পারে একটি পর্দ্দায় সেই রশ্মিপাত করা যায় তাহা হইলে আর আমরা পূর্ব্বের ন্যায় শ্বেতরশ্মি দেখিতে পাইব না, তাহার পরিবর্ত্তে আমরা সেই রশ্মিকে সপ্তবর্ণে বিভক্ত দেখিব। খণ্ডিত সূর্য্যরশ্মির বিভিন্ন স্থানে পাত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ আমাদের নয়নগোচর হইয়া থাকে। যদি কাচ কলসের নিকটে এক খানি কাগজ রাখা যায় এবং তাহাতে এমন ভাবে একটি ছিদ্র করা যায় যে কেবল মাত্র একটি বর্ণের রশ্মি তাহার ভিতর দিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সাতটি বর্ণের পরিবর্ত্তে কেবল একটি বর্ণের রশ্মিই পর্দ্দায় পতিত হইবে। এইরূপে আমরা খণ্ডিত সূর্য্যরশ্মিতে এক হইতে সাতটি পর্য্যন্ত বর্ণ দেখিতে পাইতে পারি। তবে রশ্মিগুলি পর্দ্দায় পতিত হইয়া আমাদের দৃষ্টিগোচর কেমন করিয়া হয়? আলোকরশ্মি কোন পদার্থে পতিত হইলে তিন প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রথম, উহা পদার্থ ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে, কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থেই উহার সম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে কাচ প্রভৃতি স্বচ্ছ পদার্থের বিপরীত দিকে অবস্থিত থাকিলে আলোকরশ্মি অবলোকন করা যায়। দ্বিতীয়তঃ যে পদার্থে আলোকরশ্মি পতিত হইবে তাহাতে উহা প্রতিফলিত হইয়া আলোক পদার্থের অভিমুখী হইয়া থাকে। রৌপ্যের ন্যায় মসৃণ ও চাকচিক্যশালী পদার্থে ইহা সম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে দর্শককে রৌপ্য প্রভৃতি আবরণের সম্মুখভাগেই থাকিতে হয়। তৃতীয়তঃ দ্রব্যবিশেষে আলোক পতিত হইয়া তাহাতেই থাকিয়া যায়। যেমন মসী কয়লা ইত্যাদি এইরূপ পদার্থে আলোক পতিত হইলে, উহা প্রতিফলিতও হয় না, বা ঐ পদার্থকে ভেদ করিয়া চলিয়াও যায় না। সুতরাং সেরূপ পদার্থে নিপতিত হওয়ার পর ঐ আলোক আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এক্ষণে কাচকলস দ্বারা বিভক্ত আলোকরশ্মি দূরস্থ পর্দ্দায় পতিত হইয়া প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া আমরা সেই আলোক-

দেখিতে পাই। পদার্থনিচয়ের দর্শন এই প্রতিবিম্বিত আলোক হইতে হইয়া থাকে। যে বর্ণের রশ্মি কোন পদার্থ শরীর হইতে প্রতিবিম্বিত হইবে, পদার্থও সেই বর্ণবিশিষ্ট হইবে। বর্ণদ্বারা আমাদের পদার্থের দর্শনজ্ঞান জন্মিয়া থাকে। যদি বাস্তবিকও কোন পদার্থ না থাকে অথচ কোন অজানিত কারণবশতঃ কোন প্রকারের আলোকরশ্মি আমাদের নেত্রে পতিত হয়, তাহা হইলে আলোকরশ্মির বিশেষত্ব অনুসারে আমাদের বর্ণবিশেষের জ্ঞান ত হইবেই, তদ্ব্যতীত আলোকরশ্মির ব্যাপকতা অনুসারে সেই বর্ণবিশিষ্ট আকারযুক্ত স্থানেরও জ্ঞান জন্মাইবে। আকাশের জ্ঞান আমাদের এইরূপেই হইয়া থাকে। বায়ুস্তরে যে সমস্ত সূক্ষ্ম কণা ও বিম্বের অস্তিত্বের কথা বলিয়াছি সূর্য্যরশ্মি কিয়ৎপরিমাণে তাহাতে আসিয়া পড়ে। অবশিষ্ট অংশ অপ্রতিহত অবস্থায় কণা ও বিম্বগণের অন্তরাল দিয়া পৃথিবীপৃষ্ঠে আসিয়া পড়ে। যে সমস্ত রশ্মি সূক্ষ্ম কণায় আসিয়া পড়ে, তাহাদের গতি সম্যক্ প্রতিহত হওয়ায় বর্ণবিশেষ উহাতে প্রতিফলিত হয়। এখানে দুই একটি অন্য কথা বলার প্রয়োজন। তাহা না হইলে বক্তব্য বিষয় স্পষ্টীকৃত হইবে না। আলোক জড় পদার্থ নহে। দীপ্তিময় পদার্থান্তরস্থ অণুসকলের কম্পনে আলোকের উৎপত্তি। অণুসকলের কম্পনের জন্য etherএ তরঙ্গ জন্মিয়া থাকে। যেমন জলাশয়ে একটি ঢিল নিক্ষেপ করিলে জলমধ্যে তরঙ্গের পর তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং উৎপত্তিস্থান হইতে তরঙ্গগুলি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে; ether তরঙ্গ সেইরূপ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত এবং উত্তরোত্তর অগ্রসর হইতে থাকে। এই ether-তরঙ্গ চক্ষুর অভ্যন্তরে নিপতিত হইয়া দর্শন জ্ঞান জন্মায়। ether বিশ্বব্যাপী অদৃশ্য পদার্থ। ইহা সকল স্থানেই আছে, কঠিন পদার্থের মধ্যেও ইহা আছে। ether-তরঙ্গের আয়তনভেদে আলোকরশ্মির বর্ণভেদ ঘটিয়া থাকে। ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ হইতে নীল ও Violet বর্ণের উৎপত্তি এবং বৃহদায়তন তরঙ্গ হইতে লোহিত বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এস্থলে পূর্ব্বোল্লিখিত জলাশয়ের কথা পুনরায় উত্থাপন করা প্রয়োজন। মনে করা যাউক জলাশয়ের কোন স্থানে একখণ্ড ক্ষুদ্র প্রস্তর অল্পমাত্র উত্থিত হইয়া রহিয়াছে। জলাশয়ের বড় বড় তরঙ্গগুলি এই প্রস্তরখণ্ডের উপর দিয়া অব্যাহতভাবে চলিয়া যাইতে পারে, ক্ষুদ্র তরঙ্গ ইহার উপরে উঠিতে পারে না, কিন্তু ইহার শরীরে আসিয়া পতিত হয় এবং তদ্দ্বারা প্রতিফলিত হইয়া ভিন্ন দিগভিমুখী হয়। বায়ুস্তরে ভাসমান বিম্ব ও কণাদ্বিতে আহত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ether তরঙ্গগুলি প্রতিফলিত হয়, কিন্তু বৃহৎ বৃহৎ তরঙ্গগুলি সে সব বাধা অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়। নীলালোক, ক্ষুদ্র তরঙ্গজনিত। সুতরাং প্রতিফলিত ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি চক্ষুর অভ্যন্তরে আসিয়া নীল বর্ণের জ্ঞান জন্মায়। এইরূপে আকাশের প্রত্যেক স্থান হইতে ক্ষুদ্র তরঙ্গসমূহ প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চক্ষুতে আসিয়া পড়ে। সেই জন্য আকাশের প্রত্যেক স্থানই নীলবর্ণের বলিয়া মনে হয়। আমরা মনে করি আকাশ তরল পদার্থ বিশেষ, তাহার গাত্রে নীল রং মাখান রহিয়াছে। বস্তুতঃ তাহা ঠিক নহে। আকাশ বলিয়া কোন পদার্থ নাই, স্থানবিশেষে আকাশ নীল, বা কাল।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম আকাশ সৃষ্টির তাহাই ঠিক কারণ কি না একথা সহজেই মনে উঠিয়া থাকে। মনে হইতে পারে উহা একটি সম্ভবযোগ্য কারণ, কিন্তু বাস্তবিক অন্য প্রকার ঘটনা হওয়াও সম্ভব। কিন্তু ইহার উত্তরে এই বলা যাইতে পারে যে বৈজ্ঞানিকেরা কোন একটি কল্পনা করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন না। বাস্তবিকই, কল্পনা ঠিক কি না জানিবার জন্য সেই কল্পনাকে পরীক্ষাধীনে আনিয়া থাকেন। আকাশের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কল্পনা করা হইয়াছে, পরীক্ষাদ্বারা যদি সেরূপ আকাশের উৎপত্তি দেখাইতে পারা যায় তবে কল্পনাও সত্য হইবে। অধ্যাপক Tyndal কৃত্রিম আকাশ উৎপন্ন করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বাষ্প লইয়া পরীক্ষা করেন। অবশ্য বাষ্পীয় পদার্থ এরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত যে আলোকসংস্পর্শে উহাতে পদার্থান্তরের সৃষ্টি হয় এবং তন্নিবন্ধন ঐ বাষ্পে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থকণা ভাসমান হইতে থাকে। অধ্যাপক Tyndal এইরূপ কোন বাষ্প একটি লম্বা কাচের নলে রাখিয়া তাহার মধ্য দিয়া বৈদ্যুতালোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাষ্পে যেমন পদার্থবিম্বের উদ্গম হইল অমনি সেখানে নীল মেঘের আবির্ভাব হইল। কাচ নলের যতটুকু স্থান একসময়ে দৃষ্ট হইল ততটুকু স্থানেই নীল মেঘ বা আকাশ। অধ্যাপক Tyndal ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। যতবারই তিনি পরীক্ষা করিয়াছেন ততবারই তিনি একরূপ ফলই পাইয়াছেন। অধ্যাপক Tyndal এর পরীক্ষায় যেমন ক্ষুদ্র আকাশের উদ্গম, প্রকৃতিরও সেইরূপ আচরণদ্বারা গগনব্যাপী আকাশের উৎপত্তি। যে শিল্পী এমন জিনিষ সৃষ্টি করিতে পারেন তাঁহার শিল্পশালা যে কেমন, একবার মনে ভাবিয়া দেখুন। বাস্তবিকই আকাশ সৃষ্টি প্রকৃতির শিল্প চাতুর্য্যের অন্যতম পরিচয় মাত্র। কোন পদার্থের গাত্রে রং মাখান নাই অথচ কেমন কৌশলে জড়পদার্থ ও আলোক শক্তির সমাবেশে উদ্ভূত কেমন সুন্দর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমণ্ডল ঘেরা যবনিকার কারুকার্য্য।

বাস্তবিক আকাশ কি যবনিকা? আকাশের অপর পারে কি আছে? আকাশ কি এক জগৎকে অন্য জগৎ হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছে? তবে কি জগতের পর জগৎ আছে? কে বলিয়া দিবে আছে, কে বলিয়া দিবে নাই? যদি থাকে তবে সে কিরূপ জগৎ? আমাদের নাক্ষত্রিক জগৎ যেমন সে সকল জগতও কি তেমনি? না সে জগতে নক্ষত্র নাই, পৃথিবী নাই, চন্দ্র সূর্য্য নাই? সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতি লইয়া যে জগৎ তাহাই নাক্ষত্রিক জগৎ, যতদূর লইয়া নক্ষত্রের রাজ্য ততদূরই নাক্ষত্রিক জগৎ। আমরা নাক্ষত্রিক জগতের অন্তর্ভূত। এই নাক্ষত্রিক জগতের কি একটা সীমা আছে, না নাক্ষত্রিক জগৎ অনন্ত স্থানব্যাপী। যদি অনন্ত স্থানব্যাপী হইত তাহা হইলে আকাশপটের প্রত্যেক স্থান হইতে নক্ষত্রালোক দৃষ্টিগোচর হইত। কারণ আকাশ অনন্ত আর অনন্ত আকাশে নক্ষত্রও অনন্ত। তবে হইতে পারে আকাশে যেমন নক্ষত্রের ন্যায় জ্বলন্ত পদার্থ রহিয়াছে তেমনি আবার চন্দ্রের ন্যায় শীতল অপ্রজ্বলিত পদার্থও অনেক আছে। কত শত নক্ষত্র এইরূপ দীপ্তিহীন পদার্থের পশ্চাদ্ভাগে রহিয়াছে, সেই জন্য তাহারা দৃষ্টিগোচর হয় না এবং সেই

সেই নক্ষত্রদ্বারা অধিকৃত স্থান সকলও অন্ধকারময় ও নক্ষত্রশূন্য দেখায়। কিন্তু এরূপ অনুমানের বিরুদ্ধে পণ্ডিতেরা বলেন যে উপরি উক্ত কারণে স্থানবিশেষে আকাশ নক্ষত্রশূন্য দৃষ্ট হইবে সত্য বটে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তিজনিত ক্রিয়ার কোনরূপ বাধা জন্মাইতে পারে না। যদি দীপ্ত ও অদীপ্ত পদার্থ অনন্ত স্থান অধিকার করিয়া থাকে তাহা হইলে তজ্জনিত মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কার্য্যফলে সৌরজগতের অবস্থান অন্যরূপ হইয়া যাইত। সুতরাং ইহা হইতে অনুমান হইতে পারে যে নাক্ষত্রিক জগৎ অসীম। আর জড় পদার্থ লইয়াই যে নাক্ষত্রিক জগং ইহা কল্পনা করারও বিশেষ কারণ নাই। নাক্ষত্রিক জগতে জড় পদার্থশূন্য প্রদেশও আছে। অতএব ইহা অনুমেয় যে নাক্ষত্রিক জগৎ দুই প্রকার প্রদেশ লইয়া গঠিত। প্রথম জড় পদার্থযুক্ত প্রদেশ, দ্বিতীয় জড় পদার্থশূন্য প্রদেশ। তবে ইহাও হইতে পারে যে গ্রহনক্ষত্রাদি পরিশোভিত দৃশ্যমান জগৎ পদার্থশূন্য অদৃশ্যমান প্রদেশদ্বারা সমাচ্ছাদিত। যেমন করিয়াই অনুমান করা যাউক না, নাক্ষত্রিক জগং অনন্ত নহে, উহার একটি সীমা আছে। এ সীমা অতিক্রম করিলে কি পাওয়া যায়? কেবল অনন্ত শূন্য, না জড় পদার্থযুক্ত প্রদেশ ও শূন্য প্রদেশ একটির পর একটি অনন্তের অভিমুখে চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অনুমান এই শেষোক্ত অনুমানের অনুকূল। মানিয়াই লইলাম সসীম নাক্ষত্রিক ব্রহ্মাণ্ডের অপর পারে অন্যরূপ ব্রহ্মাণ্ড আছে। তাহার আকার কিরূপ, প্রকৃতির শিল্প চাতুর্য্য তাহাতে কিরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, সে বিশ্ব আমাদের বিশ্ব অপেক্ষা সুন্দর কি কদাকার, সে রাজ্যে জীবের অধিকার আছে কি না; যদি থাকে তবে তাহারা আমাদের অপেক্ষা উন্নত কি অবনত, এসব প্রশ্নের মীমাংসা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে ব্রহ্মাণ্ডের পর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি প্রকৃতির শিল্পাগারেই সম্ভব। এ শিল্পাগারের সকল দিক দেখিবার শক্তি মানুষের এখনও হয় নাই।

প্রকৃতির শিল্পশালায় আমরা কোন পদার্থেরই অপব্যবহার দেখিতে পাই না। প্রকৃতি অতি সরলভাবে এবং সোজা পথে নিজ গন্তব্য পথে গমন করিয়া থাকে, এবং নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য যে শক্তি ও বস্তুর প্রয়োজন হইয়া থাকে তাহাও যথাসম্ভব পরিমিত। এ বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে হইলে আমাদের পার্থিব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেই চলিবে। পৃথিবী ছাড়িয়া আকাশ কি অন্য কোথাও যাইবার প্রয়োজন নাই। উত্তাপ একটি শক্তি এবং আলোক আর একটি শক্তি। আমরা আলোক উৎপন্ন করিতে গেলে উত্তাপও উৎপন্ন করিয়া থাকি। বিনা উত্তাপে আলোকের উৎপত্তি আমরা একরূপ অসম্ভব মনে করি। রাত্রির অন্ধকার নিবারণ করিবার জন্য আলোকের প্রয়োজন। আমরা নানাবিধ উপায়ে সে আলোকের উৎপাদন করিয়া থাকি। স্নেহমূলক, বর্ত্তিমূলক বাষ্প (gas) মূলক, বা বৈদ্যুতিক, পদার্থভেদে আলোকের উদ্ভাবন নানা প্রকারে হইয়া থাকে। কিন্তু যে প্রকারের আলোকই হউক না, উত্তাপ বিহীন আলোক ইহার কোনটিই নয়। এবং আলোকের তীব্রতা অনুসারে উত্তাপের আধিক্যই হইয়া থাকে। যেখানে কেবল আলোক প্রয়োজন, সেখানে উত্তাপের

অপব্যবহার হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতি আমাদিগকে উত্তাপবিহীন আলোক দেখাইয়া দিতেছেন। জ্যোৎস্নাপোকা এ বিষয়ে প্রকৃতির শিল্পচাতুর্য্যের উৎকৃষ্টতা সপ্রমাণ করিতেছে। সমুদ্রগর্ভে অনেক জৈবিক পদার্থ আছে যাহা অন্ধকারে প্রদীপ্ত হয়, কিন্তু তাহা হইতে উত্তাপের উদ্গম হয় না। জ্যোৎস্না-পোকা এবং সামুদ্রিক জীববিশেষ এই আলোক উৎপন্ন করিবার জন্য যে ব্যয় স্বীকার করে তাহা এত সামান্য যে তাহার সহিত তুলনায় আমাদের প্রদীপের ব্যয়কে অত্যন্ত অধিক বলিয়া মনে হইবে।

বৃক্ষের পত্র দিবসে সূর্য্যালোকে অঙ্গারক বাষ্প আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং পাদমূলদ্বারা পৃথিবী হইতে রস গ্রহণ করে। বৃক্ষাভ্যন্তরে এই দুই পদার্থের অর্থাৎ অঙ্গারক বাষ্প এবং জলের সংমিশ্রনে formaldehide নামক এক পদার্থের উৎপত্তি হয় এবং এই formaldehide নামক পদার্থ হইতে শর্করার উৎপত্তি হয়। শর্করা বৃক্ষের ভাণ্ডারগৃহে রক্ষিত হইতে পারে না বলিয়া উহা শ্বেতসারে (starch) পরিণত হয়। শ্বেতসারই (starch) আবশ্যক মত বৃক্ষকে খাদ্য যোগাইয়া থাকে। সেই জন্যই বৃক্ষের ভাণ্ডারে শ্বেতসার (starch) সঞ্চিত হইয়া থাকে। শর্করা কি (starch) প্রস্তুত করিবার জন্য বৃক্ষের অসম্ভব রকম যত্ন কি চেষ্টা করিতে হয় না, উহা বৃক্ষের পক্ষে সহজসাধ্য। মানুষ শর্করা প্রস্তুত করিতে পারে। আমি ইক্ষু প্রভৃতি জাত শর্করার কথা বলিতেছি না। কারণ উহা মানুষে প্রস্তুত করে না। বৃক্ষ হইতে প্রস্তুত করা শর্করা মানুষ বাহির করিয়া লয় মাত্র। আল্‌কাতরা হইতে এক প্রকার শর্করা মানুষ প্রস্তুত করিয়াছে। এই শর্করা প্রস্তুত করিবার জন্য যে ব্যয় হইয়া থাকে এবং যে শক্তির প্রয়োগ এবং অপব্যয় হইয়া থাকে তাহা প্রকৃতির চেষ্টার সহিত তুলনায় অসীম।

প্রকৃতির বিশাল শিল্পশালা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার আমাদের সামর্থ্য নাই। আমরা কতটুকুই বা প্রকৃতির জানি, যাহা জানি তাহাও হয়ত অসম্পূর্ণ। এ পর্য্যন্ত আমরা যে রাজ্য লইয়া ব্যস্ত ছিলাম তাহাত আমাদের অপেক্ষা অনেক দূরের। প্রকৃতির শিল্প নৈপুণ্য দেখিবার জন্য আমাদের অতদূরই বা যাইতে হইবে কেন? আমাদের পৃথিবীতেই যাহা দেখিতে পাই তাহারই ইয়ত্তা কে করে? বর্ত্তমান বিজ্ঞান যে পথে আমাদিগকে লইয়া যাইতে অগ্রসর হইয়াছে সে পথ ধরিয়া গেলে যাহা আমরা দেখিব তাহাই দেখিবার সময় ও শক্তি কোথায়? একদিকে যেমন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থনিচয় বিশ্বম্ভরা প্রকৃতির বিশাল বিশ্বমোহন রূপ দেখাইয়া দিতেছে, অপর দিকে তেমনি অতীন্দ্রিয় পদার্থ সকল তাঁহার অনন্ত শক্তি জ্ঞাপিত করিতেছে। প্রত্যেক পদার্থেই প্রকৃতিদত্ত জীবনীশক্তির বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। নিশ্চল জড়পদার্থ কোনটিই নয়। যাহাকে আমরা জড় পদার্থ বলিয়া মনে করি তাহাও নিশ্চল নয়, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পদার্থও সচল। প্রত্যেক জড় পদার্থ পরমাণুনির্ম্মিত, প্রত্যেক পরমাণু আবার অতি সূক্ষ্ম অণুসমষ্টি। একটি পরমাণুর ভিতরে সহস্র সহস্র অণু (electrons) ক্রীড়া করিতেছে। এই সমস্ত অণু বৈদ্যুতিক পদার্থ। বিদ্যুৎ সমস্ত শক্তির আদি-বৈজ্ঞা-নিক, রাসায়নিক, জৈবনিক সমস্ত শক্তিরই

নিদানীভূত কারণ। আমরা আকাশ (Ether) দ্বারা পরিবেষ্টিত, জড় ও শক্তির আকাশের সহিত যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাও মনুষ্যের জ্ঞাতব্য।

স্থূল চক্ষু যাহা গ্রাহ্য করিতে পারে না, তাহাতেও প্রকৃতির খেলা বিদ্যমান রহিয়াছে। অনুবীক্ষণ যন্ত্র কত অদ্ভুত ব্যাপার আমাদের দৃষ্টিপথে আনিয়া ফেলিয়াছে। স্থূল পদার্থের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা সূক্ষ্ম পদার্থের সৌন্দর্য্য কম নহে। একটি সামান্য মক্ষিকার পাখা আমাদের স্থূল চক্ষে নগণ্য পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাতে কোন সৌন্দর্য্যই আমরা দেখিতে পাই না। কিন্তু অনুবীক্ষণ যন্ত্রের ভিতর দিয়া দেখিলে উহাতে প্রকৃতির নানাবিধ কারিগরি দেখিতে পাই। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে উহা এত সুন্দর দেখায় যে মানব শিল্পীও তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যায়। রেডিয়ম্ (radium) প্রভৃতি পদার্থের আবিষ্কার দ্বারা মানুষ একটি স্বতন্ত্র রাজ্যে নীত হইয়াছে। রেডিয়ম্ একটি অদ্ভুত পদার্থ, ইহার শক্তি অসীম। যাহা মানুষ ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই রেডিয়ম্ তাহা সম্ভব করিয়া দিয়াছে। রেডিয়ম্ হইতে প্রতিনিয়ত শক্তি ব্যয়িত হইতেছে এবং শক্তির ক্ষয়ের জন্য এই ধাতুতে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে এবং প্রত্যেক অবস্থায় উহার পদার্থান্তরে পরিণতি হইতেছে। যে সমস্ত পদার্থ শ্রেণীতে রেডিয়ম্ ধাতুর পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে তাহার মধ্যে শিষক একটি, পরিণামের অবসান হিলিয়ম নামক বায়বীয় পদার্থে। অনবরত রেডিয়ম্ ধাতু হইতে যে শক্তির ক্ষরণ হইতেছে তাহাতে ঐ ধাতুর উত্তাপের আধিক্য সংঘটিত হইয়া থাকে। বস্তুর সাধারণ ধর্ম্ম এই যে, যে সকল পদার্থের সংস্রবে উহা থাকে তাহাদের সহিত উহার তাপের মাত্রা (temperature) সমান থাকে। অর্থাৎ যে ঘরের তাপমাত্রা ৩০° সে ঘরে যে পদার্থ থাকিবে তাহারও তাপমাত্রা ৩০ডিগ্রী হইবে। কিন্তু রেডিয়ম্ ধাতু সম্বন্ধে প্রকৃতির স্বতন্ত্র বিধান। উহার তাপমাত্রা অন্যান্য পদার্থের তাপমাত্রা অপেক্ষা সর্ব্বদা ৪ কি ৫ ডিগ্রী অধিক। অর্থাৎ যখন অন্য পদার্থের তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী তখন রেডিয়মের তাপমাত্রা ৩৪ কি ৩৫ ডিগ্রী। মানবশিল্পী এখন পর্য্যন্ত প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারে নাই। অতি উৎকৃষ্ট বাষ্পীয় যন্ত্র পরিচালনের জন্য যে শক্তি ব্যয় হইয়া থাকে তাহার অধিকাংশই উত্তাপে পরিণত হইয়া যায়, আমাদের কোন কাজেই আসে না, যে টুকু কাজে আসে তাহা প্রযুক্ত শক্তির শতকরা ১৭ কি ১৮ ভাগ হইবে। উত্তাপে জল বাষ্পে পরিণত হয় বাষ্প শক্তি বাষ্পীয় যন্ত্রে নিজ শক্তি পরিচালনা করে। কয়লা প্রজ্জ্বলিত হইয়া উত্তাপের সৃষ্টি করে। সুতরাং উদ্ভূত শক্তি কয়লাতে নিহিত থাকে। কয়লার পরিণামে শক্তির উদয়। বাষ্পীয় যন্ত্র পরিচালনের জন্য যে পরিমানে কয়লার প্রয়োজন হইয়া থাকে তাহাতে যে পরিমাণে শক্তি নিহিত আছে আমরা কেবল তাহার শতকরা ১৭ কি ১৮ ভাগ মাত্র কার্য্যে পরিণত করিতে পারি। বাকি সমস্তই উত্তাপ হইয়া চলিয়া যায়, আমাদের কাজে আসে না। কিন্তু মনুষ্য শরীরকে যদি প্রকৃতি নির্ম্মিত বাষ্পীয় যন্ত্র মনে করা যায় এবং কয়লার পরিবর্ত্তে আহার্য্যকে শক্তির আধার মনে করা যায়, তাহা হইলে মনুষ্য

শরীর যন্ত্র বাষ্পীয় যন্ত্র অপেক্ষা অনেক উন্নত। আহারীয় পদার্থে যে শক্তি নিহিত রহিয়াছে শরীরযন্ত্রস্থ পেশী সকল তাহার শতকরা ২৫ ভাগ কার্য্যে পরিণত করিয়া লয়। বক্রী ৭৫ ভাগ উত্তাপে পরিণত হয়। কিন্তু উত্তাপ বাষ্পীয় যন্ত্রের উত্তাপের ন্যায় অপব্যয়িত হয় না। পেশী সকলকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য সেই উত্তাপের প্রয়োজন। সুতরাং আহারীয় পদার্থের সমস্ত শক্তিই শরীর-যন্ত্রের কাজে লাগিয়া থাকে। প্রকৃতিতে অপব্যয় নাই।

জীবন, প্রকৃতির শিল্পের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পরিচয়। জৈবনিক শক্তি সাহায্যে প্রকৃতি অতি সহজে, অতি সরলভাবে কত গুরুতর কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। লক্ষ লক্ষ সূক্ষ্ম জৈবনিক পদার্থ প্রকৃতির সর্ব্বত্র ভাসমান রহিয়াছে। এই সমস্ত জৈবনিক পদার্থকে বৈজ্ঞানিকেরা Bacteria বলিয়া থাকেন। Bacteriaর মধ্যে কতক গুলি মনুষ্যের অপকারী এবং কতকগুলি অপকারী নহে। ১৫০০ কি ১৬০০ রকমের মধ্যে কেবল ৫০। ৬০ রকম অনিষ্টকারী। অনেক প্রকারের Bacteria অনেক পদার্থে অনেক রকমের বিকার উৎপন্ন করিয়া থাকে। বর্ত্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানে জানা যায় যে কতকগুলি Bacteria পীড়া-বিশেষের নিদানীভূত কারণ। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, Typhoid জ্বর,বসন্ত,কলেরা Tetanus প্রভৃতি পীড়া, Bacteriaর কার্য্য। রোগ উৎপাদক Bacteria আমাদের চারিদিকে বহুল পরিমাণে ব্যাপৃত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি আমাদিগকে সকল সময়ে উপরিউক্ত রোগ সকল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে দেখি না কেন, এরূপ প্রশ্ন সহজেই আমাদের মনে উদয় হইতে পারে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি Bacteria নানাবিধ। কতকগুলি Bacteria এমন আছে যে তাহারা অপর কতকগুলিকে ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। মনুষ্য শরীরে প্রথমোক্ত রকমের Bacteria বিদ্য-মান রহিয়াছে। আমাদের রক্তে দুই প্রকার জীবাণু দৃষ্ট হয়. এক প্রকার জীবাণু Red Corpuscles এবং অন্য প্রকার জীবাণু White Corpuscles নামে অভিহিত। অণুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যে উভয় প্রকার জীবাণুই দৃষ্ট হইয়া থাকে। Red Corpuscles এর সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ইহা রক্তবর্ণ, গোলা-কার ও চেপ্টা, অনেকগুলি একত্রে তাল বাঁধিয়া থাকে। White Corpuscles সংখ্যায় কম একবারে তিন চারিটির অধিক দেখা যায় নাই। ইহা আকারে কিঞ্চিৎ বড় এবং গতিবিশিষ্ট। এই White Corpus-cles গুলিই রোগোৎপাদক Bacteria দিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই উভয় প্রকার Bacteriaর সংগ্রাম অনবরত বিদ্য মান থাকায় আমাদিগকে সদাসর্ব্বদা পীড়া দ্বারা আক্রান্ত থাকিতে হয় না। বর্ত্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানে যে বিশেষ প্রকার অস্ত্র চিকিৎসার (Antiseptic operation) বিধান হইয়াছে তাহা উক্ত অমঙ্গলদায়ক Bacteria দিগকে লক্ষ্য করিয়াই। এই সমস্ত Bacteria দিগকে ছাড়িয়া দিলে আরও অনেক রকমের Bacteria পাওয়া যায় যাহারা নানারকমে মানুষের কাজে আইসে। দুগ্ধের যেরূপ বিকার হইলে দধি মাখন প্রভৃতি হয় তাহা Bacteria কর্ত্তৃকই হইয়া থাকে, খর্জ্জুর রসের বিকারে মদিরা, মদিরার বিকারে

Acetic Acid, Bacteriaর কার্য্য। আমরা যে খাদ্য খাইয়া থাকি তাহার প্রায় সকল গুলিতে অল্পাধিক পরিমাণে Nitrogen (যবক্ষারজান) আছে। যবক্ষারজান শরীর পুষ্টির উপাদান। ভূমিতে যে সার দিবার নিয়ম আছে তাহার উদ্দেশ্য উহাকে যবক্ষারজানযুক্ত করা। সেরূপ ভূমি হইতে বৃক্ষাদি আবশ্যক মত যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে পারে। বায়ুতে যবক্ষারজান আছে। এক প্রকার জীবাণু আছে যাহারা বায়ু হইতে যবক্ষারজান আকর্ষণ করিয়া অন্য পদার্থে আবদ্ধ করিতে পারে। মানুষে এই প্রকারে যবক্ষারজানকে আবদ্ধ করিবার জন্য যথেষ্ট যত্নও করিতেছে। যদি জীবাণুর সাহায্যে আবদ্ধ না করিয়া অন্য প্রকারে এবং রাসায়নিক ক্রিয়াবলে, যবক্ষারজানকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইত তাহা হইলে যে কত অর্থব্যয়, কত পরিশ্রম এবং কত শক্তির ব্যয় ও অপব্যয় করিতে হইত তাহার সীমা নাই। শুদ্ধ এই প্রকারের জীবাণু নহে, অন্য যত প্রকার জীবাণুর বিষয় বর্ণিত হইল তাহারা যে সমস্ত কার্য্য করিতে সক্ষম, মানুষ যথাশক্তি চেষ্টা ও ব্যয় করিয়া তাহার কোন গুলিই কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই।

একটি একটি করিয়া বলিতে গেলে অনন্ত প্রকৃতির কিছুই বলিতে পারা যায় না, অথচ তাহাতে যে সময় ও শক্তির প্রয়োজন তাহা মানুষের নাই। আমরা সেইজন্য আর একটি মাত্র বিষয়ের অবতারণা করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব। প্রকৃতি নিজ শিল্পাগারে যে সকল অত্যাশ্চর্য্য পদার্থ সকল উৎপন্ন করিয়া থাকেন মনুষ্য তাহার কোন কোনটি নিজের শিল্পশালায় প্রকৃতির সাহায্যে গড়াইয়া লয়। মনুষ্য কর্তৃক উৎপন্ন পদার্থ নিচয়ের মধ্যে স্ফটিক (Crystal) একটি। ইংরেজীতে Crystal, Crystalline shape বলিতে যাহা বুঝায় তাহা বুঝাইবার জন্য বিশেষ কোন শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, অন্ততঃ আছে কিনা আমি তাহা জানি না। সেইজন্য স্ফটিক শব্দ ব্যবহার করিলাম। স্ফটিক বলিলে কাচ কি কাচের ন্যায় স্বচ্ছ প্রস্তর বুঝায়, কিন্তু Crystal বলিলে স্বচ্ছ পদার্থ ছাড়া আরও কিছু বুঝায়। Crystal এর নির্দ্দিষ্ট আকার আছে। আকার ত সব পদার্থেরই আছে, কাচেরও আছে, অথচ কাচ Crystal পদবাচ্য নয়। অতি প্রাচীনকালে আকারবিশিষ্ট স্বচ্ছ পদার্থমাত্রকেই Crystal বলিত, পোখরাজ (quartz), হীরক প্রভৃতিকে Crystal বলা হইত, অস্বচ্ছ পদার্থ আকারবিশিষ্ট হইলেও Crystal পদবাচ্য ছিল না। বর্ত্তমান কালে আকারবিশিষ্ট, অথচ প্রকৃতিজাত হইলেই Crystal হইল। মানুষ কাটিয়া ছিলিয়া আকারবিশিষ্ট করিলে কোন দ্রব্য Crystal পদবাচ্য হইবে না। আকারবিশিষ্ট অস্বচ্ছ পদার্থও Crystal পদবাচ্য হইবে। Crystal এর উপরিভাগ সরল মসৃণ আবরণযুক্ত। কোন স্থান গোল বা অমসৃণ নহে। এই সরল মসৃণ ক্ষেত্রাকার আবরণ সকল পরস্পরের সহিত মিলিত। যেখানে দুইটি আবরণের মিল হইয়াছে, সেই খানেই এক সরল রেখার উৎপত্তি। আবরণ সন্ধিস্থলে সরলরেখা ব্যতীত অন্য কোন প্রকার রেখা হইবে না। এইরূপ ধর্ম্মাক্রান্ত স্বাভাবিক পদার্থকে Crystal বলে। আমরা উপযুক্ত ভাষার অভাবে উহাকে স্ফটিক নামে অভিহিত করিব। স্ফটি-

কের রূপ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্ত আমি কয়েকটি স্ফটিক আনিয়াছি। ইহা দেখিলেই বেশ বুঝা যাইবে কিরূপ পদার্থ স্ফটিক শব্দের অন্তর্গত। আপনাদের সম্মুখে যে স্ফটিকগুলি উপস্থিত করা হইল তাহা ৮ টি স্বচ্ছ আবরণ দ্বারা বেষ্টিত। প্রত্যেক আবরণটি সরল এবং মসৃণ। এবং যেখানে দুইটি আবরণ আসিয়া মিলিয়াছে, সেই খানেই একটি সরল রৈখিক পার্শ্বরেখার উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপে ইহাতে আটটি পার্শ্বরেখা হইয়াছে। প্রত্যেক আবরণটি ত্রিকোণাত্মক এবং চারিটি করিয়া আবরণ এক বিন্দুতে মিলিত হইয়াছে। এই রূপে দুইটি বিন্দুর উৎপত্তি হইয়াছে। একটি আর একটির বিপরীত দিকে অবস্থিত। ঠিক মধ্যস্থল একটি চতুর্ভুজ ক্ষেত্র নির্ম্মিত। এই চতুর্ভুজের দুইদিকে ঠিক একই ভাবে আবরণ ক্ষেত্রগুলি সম্প্রসারিত এবং মিলিত হইয়াছে। ইংরেজীতে এইরূপ আকারের নাম octahedron, আমরা ইহার নাম অষ্ট-ত্রৈভুজিক দিলাম। স্ফটিকের আকার নানাবিধ। কোনটি কেবলমাত্র চারিটি ত্রৈভুজিক আবরণবিশিষ্ট, অর্থাৎ ইহার চারিটি পার্শ্ব, প্রত্যেকটি এক একটি ত্রিভুজ এবং ছয়টি পার্শ্বরেখাযুক্ত। মনে করুন যেন একটি ত্রিভুজ ভূমির উপর তিনটি ত্রিভুজ পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইংরেজিতে ইহাকে tetrahedron বলে। আমরা ইহাকে চাতুর্ভুজিক বলিতে পারি। এইরূপে স্ফটিকের নানাবিধ আকার বর্ণনা করা যাইতে পারে। বর্ণনা বাহুল্যে সমস্তগুলির নাম করা গেল না, তবে এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, স্ফটিকের আকার নানাবিধ। প্রাচীনকালে ৫০০ প্রকারের অধিক স্ফটিক জানা ছিল। এই স্ফটিক সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া অদ্যকার প্রস্তাবের উপসংহার করিব। এই স্ফটিকে প্রকৃতির শিল্প-নৈপুণ্য কতদূর প্রকাশ পাইয়াছে আমরা কেবল তাহাই বলিব, অন্য কথা বলিবার বিষয় অদ্যকার নহে।

যে কয়েকটি স্ফটিক আপনাদের সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা আপনাদের সকলেরই পরিচিত। তবে আপনারা চিনিতে পারিয়াছেন কি না জানিনা। বাজারে সদা সর্ব্বদা আমরা উহা যে আকারে দেখিতে পাই এ আকার সেরূপ নহে, সেইজন্যই আপনারা হয়ত উহা চিনিতে পারিতেছেন না। আকার নানাপ্রকারে লুপ্ত হইতে পারে, কিন্তু আস্বাদ লুপ্ত হইবার নহে। যদি নিঃসঙ্কোচে আপনারা উহার স্বাদ গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন উহা কি। উহা আপনাদের চির পরিচিত অতি নগণ্য ফট্‌কিরি। এই স্ফটিকীকৃত ফট্‌কিরিগুলি, বাজারের ফট্‌কিরি হইতে আমাদের কালেজের laboratoryতে প্রস্তুত হইয়াছে। মনে করিবেন না যে আমরা করাত দিয়া কাটিয়া, ছুরি দিয়া চাঁছিয়া, এই গুলিকে আমাদের ইচ্ছামত আকারবিশিষ্ট করিয়াছি। এইগুলি আপনিই আপনার রূপ গ্রহণ করিয়াছে। প্রকৃতির হস্তে আস্তে আস্তে এইগুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। আমরা কেবল প্রকৃতির নিকট জিনিষগুলি আনিয়া ফেলিয়া দিয়াছি, প্রকৃতি সেইগুলি লইয়া কেমন গড়ন গড়িয়াছে। কোনটির প্রতি তাহার অযত্ন নাই, প্রত্যেকটিকেই যেন এক ছাঁচে ঢালিয়াছে, প্রত্যেকটিরই একই রূপ। আমরা যাহা করিয়াছি সঙ্ক্ষেপে যতদূর সম্ভব তাহার বর্ণনা

করিতেছি। বাজার হইতে আধসের ফট্‌কিরি আনিয়া তাহা জলে গুলিলাম। ইংরেজীতে ইহাকে ফটকিরির solution বলে। আমরা অন্য কথার অভাবে উহাকে ফট্‌কিরির পাণা বলিব। এই পাণা প্রস্তুত করার একটু বিশেষত্ব আছে। অবশ্য জলে ফেলিয়া কিয়ৎকাল নাড়িলে ফট্‌কিরি গলিয়া যায় গলিয়া গেলে সেই পাণাতে আরও ফট্‌কিরি নিক্ষেপ করিতে হয়, ইহা গলিলে আরও অধিক ফট্‌কিরি গলাইতে হয়। এই পকারে যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফট্‌কিরি গলিতে থাকিবে, ততক্ষণ ফট্‌কিরি গলাইয়া লইতে হয়, পরিশেষে এমন এক প্রকার অবস্থা আসিবে, যাহার পর আর ফট্‌কিরি গলিবে না। তখন ঐ পাণায় যতই ফট্‌কিরি নিক্ষেপ করা যাউক না, আর উহা গলিবে না, সমস্তই পড়িয়া থাকিবে। এইরূপে পাণা প্রস্তুত হইলে উহাকে ছাঁকিয়া লইয়া পরিষ্কার কাচপাত্রে রাখিয়া দিতে হয়। জলের একটি সাধারণ ধর্ম্ম এই যে,কোন পাত্রে উহাকে রাখিয়া দিলে উহা বাষ্পাকারে উড়িয়া যায়। ফটকিরির পাণা হইতেও জল উড়িয়া যাইবে ক্রমে পাণার পরিমাণ হ্রাস হইতে থাকিবে। সুতরাং সমস্ত ফট্‌কিরি জলীয় অবস্থায় থাকিতে পারিবে না। কতকটা কঠিন অবস্থায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আকারে পতিত হইবে কিন্তু প্রত্যেকটিই আকারবিশিষ্ট হইবে। ইহাদিগের মধ্যে যেটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট আকারবিশিষ্ট হইবে সেইটিকে লইয়া, পাণাকে পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া তাহাতে উহাকে অতি সাবধানে রক্ষা করিতে হইবে। যেমন যেমন পাণার পরিমাণ হ্রাস হইতে থাকিবে তেমনি তেমনি ফট্‌কিরিখণ্ড বর্দ্ধিতায়তন হইতে থাকিবে। পাণার মধ্য হইতে ফট্‌কিরির অণু সকল ফট্‌কিরির গাত্রসংলগ্ন হইবে ; কিন্তু যেখানে সেখানে আসিয়া সংলগ্ন হইবে না, এমন ভাবে সংলগ্ন হইবে যেন ফট্‌কিরি স্ফটিকের আকার প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধ তাহা নহে, অণুগুলি আসিয়া এমন দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন হইবে যে স্ফটিকের উপরিভাগ সমান এবং মসৃণ হইয়া যাইবে। প্রকৃতি আস্তে আস্তে কেমন সুন্দরভাবে অণুগুলিকে লইয়া নিজ নিজ স্থানে উহাদিগকে সজ্জিত করে, কেমন সুস্থির ও সুন্দরভাবে উহাদিগকে আপনাপন স্থানে আবদ্ধ করে। যিনি প্রকৃতির এই ক্রিয়া নিরীক্ষণ করিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন যে, প্রকৃতির কার্য্য নিয়মবহির্ভূত নহে, তাহা যদি হইত তাহা হইলে দিনে দিনে ফট্‌কিরির স্ফটিক যেমন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইত, তেমনি উহার আকারও ভিন্ন প্রকার হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় না। আজ স্ফটিকের যে আকার কালও সেই আকার থাকিবে, তবে আয়তনে বাড়িবে, এই মাত্র। যতগুলি ফট্‌কিরির স্ফটিক প্রস্তুত করা যাইবে ততগুলিই এক আকারবিশিষ্ট হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেকের আকারই octahedron অষ্টত্রৈভুজিক। কখনই এ নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে না। যে ফট্‌কিরির স্ফটিকগুলি আপনারা দেখিতেছেন, তাহা একদিনে প্রস্তুত হয় নাই। এইগুলি প্রস্তুত হইতে এক মাসেরও অধিক সময় লাগিয়াছে। আর নিরুপদ্রবেই যে এগুলি প্রস্তুত হইয়াছে তাহাও নহে। আমরা দেখিলাম, প্রথম কয়েকদিন স্ফটিকগুলি সমানভাবে বাড়িয়াছে। তাহার পর হঠাৎ একদিন আসিয়া দেখি, অনেকগুলিই ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের রূপেরও বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, আর কতকগুলি একেবারেই

অদৃশ্য হইয়াছে। আমরা অনুমান করিলাম যে পূর্ব্বরাত্রিতে একটু গরম হইয়াছিল, পাণার temperatureও গরম হইয়া থাকিবে। সেই-জন্য উহা আরও অধিক ফট্‌কিরি দ্রব করিতে সক্ষম। ফট্‌কিরি স্ফটিকগুলি এই কারণেই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা সেইদিন হইতে সাবধান হইলাম। যাহাতে আর ক্ষতি-গ্রস্ত না হওয়া যায় তাহার চেষ্টা করিলাম। ফট্‌কিরি স্ফটিকগুলিও তাহার পর হইতে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

কেবল যে ফটকিরিই স্ফটিকাকার ধারণ করে তাহা নহে। অনেক পদার্থই এইরূপ আকার ধারণ করিয়া থাকে। এক এক পদার্থের এক একটি রূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। যে পদার্থের যে রূপ সে পদার্থ সেই রূপ ধারণ করিবেই করিবে আর এক প্রকার স্ফটিক আপনাদের সম্মুখে রক্ষা করা হইল। ইহার রূপ অন্য প্রকার। ফটকিরি স্ফটিকের সহিত এ স্ফটিকের তুলনা করা যায় না। ফটকিরি স্ফটিকের উপরিভাগ ত্রৈভুজিক, কিন্তু এই স্ফটিকের উপরিভাগ ত্রৈভুজিক নহে উহা এক একটি চতুর্ভুজ ক্ষেত্র। ইহার বর্ণ নীল। বর্ণ দেখিয়াই বোধ হয় অনুমান করিতে পারিয়াছেন যে ইহাও আপনাদের একটি সুপরিচিত পদার্থ। সাধারণ ভাষায় উহাকে তুতে বলে তুতের যতগুলি স্ফটিক দেখিতেছেন, সবগুলিই এক আকারের। তবে কোনটি ছোট কোনটি বড়। এই বড় স্ফটিকটি আমাদিগকে একটু কষ্ট দিয়াছে। প্রথমতঃ উহা বেশ বড় হইতে লাগিল এবং রূপেও নির্দ্দোষ হইতে লাগিল। এইটিকে এইরূপে রূপগুণশালী হইতে দেখিয়া আমাদের মনে বড় আনন্দ হইল। কিন্তু একদিন হঠাৎ উহা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। আয়তনে অনেক ছোট হইল এবং আকারের অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিল। আমরা কারণ অনুসন্ধান করিয়া কিছুই পাইলাম না। কিছু-দিন পরে শুনিলাম আমাদের laboratoryর একটি বালক ভৃত্য তুতের পাণায় আর একটু জল মিশাইয়া দিয়াছে। কেন যে সে জল মিশাইল বলিতে পারি না। বালকসুলভ চপলতাই এই অনিষ্টের মূল। সেই অবধি আমরা এই স্ফটিকটিকে বাড়াইবার জন্য নানা-রূপ চেষ্টা করিলাম। কোন দিন বাড়ে কোন দিন কমে, শেষ পর্য্যন্ত যাহা আপনারা দেখি-তেছেন তাহাতে উহা দাঁড়াইয়াছে। আয়তনে বাড়িয়াছে বটে কিন্তু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয় নাই।

আর এক রকমের স্ফটিক আজ এখানে আনা হইয়াছে। এটির একটু বিশেষত্ব এই যে ইহার বর্ণে একটু বৈচিত্র্য আছে। উহার উপরিভাগ সাদা কিন্তু অভ্যন্তর ভাগ গাঢ় বেগুণে। এইরূপ তিনটি স্ফটিক এখানে আছে, তিনটিই এক রকমের। রূপে ইহারা ফট্‌কিরি স্ফটিকের ন্যায়। মনে করিবেন না যে আমরা স্ফটিকের মধ্যভাগে কোনরূপে রঙ্গ লাগাইয়া দিয়াছি। ইহাও প্রকৃতির একটি অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয়। অভ্যন্তরে যে বর্ণবিশিষ্ট পদার্থ দেখিতেছেন উহা একটি স্বতন্ত্র স্ফটিক। কিন্তু উহা সাধারণ ফট্‌-কিরির স্ফটিক নহে। ঐ পদার্থের নাম Chrome Alum। Chromium নামে একটি ধাতু আছে। বর্ণযুক্ত স্ফটিকটি ঐ ধাতুর ফট্‌কিরি। সাধারণ ফট্‌কিরিতে Chromium ধাতু নাই, তাহার পরিবর্ত্তে Aluminium ধাতু আছে। Aluminium

ধাতু আপনাদের অপরিচিত নহে। Aluminium ধাতু নির্ম্মিত অনেক দ্রব্য এক্ষণে বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। এক খণ্ড Chrome ফট্‌কিরি সাধারণ ফট্‌কিরির পানায় রাখা হইয়াছিল, তাহাই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া এইরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। সকল রকম ফট্‌কিরির আকার একরূপ। Chrome ফট্‌কিরির গাত্রে সাধারণ ফট্‌কিরির অণুসকল আসিয়া লাগিয়াছে এবং দুই টিতে মিলিয়া এই অভিনব পদার্থের সৃষ্টি হইয়াছে।

তুতের স্ফটিকে এবং ফট্‌কিরির স্ফটিকে প্রকৃতির অনির্ব্বচনীয় শক্তি এবং অতুলনীয় শৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। যেথানে শৃঙ্খলা সেই খানে বুদ্ধিরও পরিচয় পাওয়া যায়। স্ফটিকে প্রকৃতির বুদ্ধিশক্তিরও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কেমন করিয়া আমরা প্রকৃতিকে জ্ঞানশূন্য জড় পদার্থ বলিব? অজ্ঞানের কার্য্যে শৃঙ্খলা কোথায়? যদি পকৃতিকে আমরা জ্ঞানশূন্য মনে করি তাহা হইলে এই স্ফটিক নির্ম্মাণ ব্যাপারেই কোন না কোন স্থলে বিশৃঙ্খলতার পরিচয় পাইতে পারি। কোন না কোন স্থলে স্ফটিকের রূপের অকারণ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাইতে পারি। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি আমাদের সে সন্দেহ নাই।

কোন্ শক্তিবলে অণু সকল স্ফটিকের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং স্ফটিকগাত্রে শৃঙ্খলার সহিত সজ্জিত হইতেছে তাহা আমরা বলিতে পারি না। জীবজগতে আমরা একপ শৃঙ্খলার পরিচয় পাই। সকল মনুষ্যের অবয়ব এক প্রকার। অবশ্য আকারের কিছু কিছু তারতম্য আছে, তাহা হইলেও মনুষ্যের আকার মনুষ্যের ন্যায়, হস্তির আকার হস্তির ন্যায়, কদলী বৃক্ষের আকার কদলী বৃক্ষের ন্যায়। মনুষ্য কখন কদলী বৃক্ষের আকার প্রাপ্ত হয় না, হস্তিও কখন প্রজাপতি হয় না। মনুষ্যবালক ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিন্তু তাহার রূপান্তর হয় না। শরীর গঠনোপযোগী অণুসকল বালকগাত্রে মিলিত হয়, এবং একপ নিয়মে সজ্জিত হয় যে আকারের বৈলক্ষণ্য উপস্থিত করে না। জীবনী শক্তি ইহার কারণ, হয়ত আমরা এ কথা বলিব। স্ফটিক গঠনব্যাপারেও কি জীবনীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়? আমাদের সহজেই মনে হয় রূপসৃষ্টি বিষয়ে জীবনী শক্তির কার্য্য আছে। হয়ত সেই জন্য আমরা বলিব স্ফটিকসৃষ্টি ব্যাপারেও জীবনী শক্তিই কার্য্য করিতেছে, অর্থাৎ স্ফটিকও সজীব। একটু ভাবিয়া দেখিলে আমাদের সে ভ্রমের অপনোদন হইবে। জীবশরীরের বৃদ্ধি অভ্যন্তর ভাগ হইতে বহির্ম্মুখী হইয়া থাকে। জীব আহার গ্রহণ করে। আহারীয় পদার্থ শরীরাভ্যন্তরস্থ যন্ত্রাদি সাহায্যে পরিপাক পাইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন করে। স্ফটিকশরীরের বৃদ্ধি অন্যরূপ। উহা বহির্ভাগ হইতেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। বাহিরের অণুসকল স্ফটিকগাত্রে লগ্ন হয় এবং স্ফটিককে বর্দ্ধিতায়তন করিতে থাকে। ইহার বৃদ্ধি এবং পুষ্টি অভ্যন্তর ভাগ হইতে বহির্ম্মুখী নয়। জীব হইতে স্ফটিকের এই খানেই পৃথকত্ব। এইটি প্রকৃতির Trade Secret। আমরা সেই গুহ্যতত্ত্বের বিষয়টি এখনও জানিতে পারি নাই। এইটি

বলিয়া নয়। সকল বিষয়েই প্রকৃতির হইত আমরাও প্রকৃতির ন্যায় শিল্পী হইতে Trade Secret রহিয়াছে। তাহা যদি না পারিতাম।*

---

# জীবন-পথে।

( ১ )

বড় ব্যথা,—বড় দুঃখ, আদি অন্ত জীবনের,
এ যে বড় কঠিন সংসার ;
ইচ্ছা করে ছুটে যাই, পলাইতে স্থান কোথা ?
চারি দিকে দুঃখ দুর্ণিবার।
শুধু পথ—শুধু পথ, আগে দীর্ঘ চলিয়াছে,
নাহি ছায়া, পিপাসার জল ;
এই কি জীবন-হায়! এই দূর পর্যাটন,
একি শুধু মরীচিকা-ছল!

( ২ )

কোথা শান্তি—কোথা শান্তি, চাহি' এক বিন্দু তার,
ছুটাছুটি করে নরনারী :
পদতলে তপ্ত মরু, জ্বলন্ত আকাশ শিরে,
পিপাসায় নাহি বিন্দু বারি!
এই শুষ্ক অকরুণ— এ নহে ত মাতৃক্রোড়,
এ যে গো, কঠোর নির্ব্বাসন ;
কে দিল নিয়তি এই— এমন নিষ্ঠুর ভাগ্য,
অভিশপ্ত দুর্ব্বহ জীবন।

( ৩ )

কেহ কি দেখিতে নাই ? এ লীলা, যাহার হোক,
সে কি আছে মুদিয়া নয়ন ?
কেহ কি শুনিতে নাই ? থাকে যদি, হাহাকারে
সেকি আছে আবরি শ্রবণ ?

---

* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ বহরমপুর শাখার দ্বিতীয় বর্ষের ৪র্থ মাসিক অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল।

পথে যে দিয়েছে ছাড়ি', সে যে তারি পথ, হায়!
সে কি গো, ভাবে না একবার?
চলিতে অজানা-পথে,— দীর্ণ, বিদ্ধ পদতল,
অবসর নাহি দাঁড়াবার।

( ৪ )

সে কি ফিরা'বে না ঘরে, লইবে না কাছে তার,
দেখিতে পাব না প্রেমমুখ?
এমনি নির্ম্মম হ'বে, বলিতে পাব না তারে,
পেয়েছি জীবনে যত দুখ?
কত সাধ গেছে ভেঙ্গে, কত ফুল ঝরিয়াছে,
কত ফুল ফলে নাই আর;
হৃদয়ের আশাপাত্র ভরিতে পারিনি যাহা,
হ'য়েছে তা' শতধা বিদার।

( ৫ )

একদা নামিবে সন্ধ্যা, নিবিয়া আসিবে আলো,
পাখী যাবে আপন কুলায়ে,
পথিক ফিরিবে ঘরে, জ্বলিবে সন্ধ্যার দীপ,
দীর্ণ বক্ষ পড়িবে লুটায়ে।
তখন কি স্নেহভরে আসিবে না কাছে সেই,
ধূলি হ'তে ল'বে না তুলিয়া?
পেয়েছি যাতনা যত, যতনে করুণাময়ী,
পদ্ম হস্তে দিবে না মুছিয়া?

---

# ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের আইন।

| সাল | নম্বর | বিষয় |
| --- | --- | --- |
| ১৮১৯ | ৮ | পত্তনি তালুক। |

এই আইনের ভূমিকায় লেখা আছে যে পত্তনি তালুক বর্দ্ধমানের রাজা প্রথমে তাঁহার মহালে সৃষ্টি করেন।

এই আইনের মর্ম্ম। মোকররী জমায় ইজারা স্বত্ব দিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত কোনও ভূস্বামী চির-কাল বা কয়েক বৎসরের জন্য ঐরূপ কোনও ইজারা স্বত্ব সৃষ্টি করিলে ঐ স্বত্ব বলবৎ থাকিবে, কিন্তু ভূস্বামীর মহাল বাকি খাজানায় নীলাম

হইলে আইনের বিধান অনুযায়ী রহিত হইবার দায় হইতে মুক্ত না হইলে ঐ স্বত্ব রহিত হইবে। পত্তনি তালুক বন্দোবস্তের সর্ত্তানুযায়ী চিরস্থায়ী হইবে এবং পুরুষানুক্রমে ভোগ করা যাইবে। অন্যান্য স্থাবর সম্পত্তির ন্যায় উহা তালুকদারের ইচ্ছানুযায়ী দান, বিক্রয় বা অন্য প্রকারে হস্তান্তরের যোগ্য, তাহার নিজের দেনার জন্য দায়ী এবং আদালতের পরওয়ানা জারির অধীন। পত্তনি তালুকদার নিজের সুবিধা মত তালুকের জমি পত্তন করিবেন এবং ঐ পত্তন পক্ষগণের, তাহাদের ওয়ারিসানের ও বরাংপাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে বাধ্য হইবে। পত্তনি তালুকের খাজানা বকেয়া পড়িলে জমিদার ঐ পত্তন মান্য করিবেন না। খাজানা বকেয়া পড়িলে পত্তনি তালুক রহিত হইবে না। প্রকাশ্য নীলামে উহা বিক্রয় হইবে এবং বকেয়া খাজানা বাদে উদ্বৃত্ত টাকা পত্তনিদার এই আইনের বিধানানুযায়ী পাইবেন। পত্তনিদার দরপত্তনি দিলে দরপত্তনিদার পত্তনিদারের ন্যায় স্বত্ব পাইবে, ঐরূপ সেপত্তনিদার এবং তাহার নীচের ছেকা। পত্তনিদার হস্তান্তর করিলে জমিদার বা অপর ভূস্বামী ঐ হস্তান্তর রেজেষ্টারি করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না। প্রচলিত প্রথানুযায়ী জমার উপর শতকরা ২৲ টাকা হিসাবে ফি জমিদার বা অপর ভূস্বামী হস্তান্তরের জন্য লইতে পারিবেন। ঐ ফি ১০০৲ টাকার বেশী হইবে না। যাহার নিকট হস্তান্তর করা হইল তাহার নিকট হইতে জমিদার বাৎসরিক জমার অর্দ্ধেক টাকা মূল্যের জামিন লইতে পারিবেন। আদালতের ডিক্রি বা হুকুম অনুযায়ী বিক্রয় হইলেও ঐরূপ নিয়ম খাটিবে। জমিদার বা অপর ভূস্বামীর পাপ্য বকেয়া খাজনার দায়ে নীলাম হইলে, খরিদদার বিনা ফিতে নাম পত্তন ও দখল লইতে পারিবেন, কিন্তু মধ্যস্বত্বের বিশেষ নিয়ম অনুযায়ী তাঁহাকে জামিন দিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত ফি না দিলে ও জামিন যথেষ্ট বলিয়া গ্রাহ্য না হইলে জমিদার বা অপর ভূস্বামী হস্তান্তর লিখিতে অস্বীকার করিবেন। পক্ষের দত্ত জামিন গ্রাহ্য না হইলে, পক্ষ দেওয়ানী আদালতে দরখাস্ত বা সাধারণ মোসন দ্বারা আপিল করিতে পারিবেন এবং জামিন যথেষ্ট বলিয়া মনে করিলে দেওয়ানী আদালত জমিদার বা অপর ভূস্বামীর উপর উহা গ্রহণ করিবার ও অবিলম্বে হস্তান্তর লিখিবার হুকুম দিবেন। কোনও পত্তনি তালুকের ভগ্নাংশ হস্তান্তরের পতি এই নিয়ম বর্ত্তিবে না। ভূস্বামীর অনুমতি ভিন্ন খাজানা ভাগ হইতে পারে না। আদালতের হুকুম অনুযায়ী পত্তনি তালুক বিক্রয় হইলে, যদি খরিদদার বিক্রয়ের ১ মাস মধ্যে নাম পত্তনের ফি না দেয় তবে জমিদার বা অপর ভূস্বামী নিজের ইচ্ছায় সাজোয়াল পাঠাইয়া তালুক আবদ্ধ করিতে ও ফি না দেওয়া পর্য্যন্ত দখলে রাখিতে পারিবেন।

বকেয়া খাজানার দায়ে পত্তনি তালুক বিক্রয় হইলে, জমিদার জামিন চাহিলে ও খরিদদার বিক্রয়ের তারিখ হইতে ১ মাসের মধ্যে তাহা দিতে না পারিলে জমিদার পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঐ তালুক সাজোয়াল দ্বারা আবদ্ধ করিতে ও জামিন না দেওয়া পর্য্যন্ত উহা দখলে রাখিতে পারিবেন। ঐরূপে আবদ্ধ থাকিলে, খাজনা এবং আবদ্ধ করার খরচ বাদে উদ্বৃত্ত টাকা খরিদদার পাইবে। কিন্তু তালুক হইতে প্রাপ্ত টাকা খাজানার কম

হইলে, তালুক ও তালুকদার অবশিষ্ট টাকার জন্য দায়ী হইবে এবং আবদ্ধকারী জমিদার বা অপর ভূস্বামীর দাখিলি হিসাব প্রমাণস্বরূপ গণ্য করিয়া বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য পরওয়ানা জারি করা হইবে। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টে খাজনা দেন এরূপ জমিদার, বকেয়া খাজনার জন্য বিক্রয় হইতে পারিবে এরূপ সর্ত্তে সৃষ্ট মধ্যস্বত্ব নিরূপিত সময়ে বিক্রয় করার জন্য নিম্নলিখিত প্রকারে দরখাস্ত দিতে পারিবেন। এই আইনের পূর্ব্বে প্রচলিত আইন অনুসারে বৎসরের শেষে বিক্রয় হইবার সর্ত্তযুক্ত মধ্যস্বত্বের প্রতিও এই নিয়ম বর্ত্তিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকার মধ্যস্বত্বাধিকারীদিগের নিকট গত বৎসরের জন্য কত টাকা বকেয়া তাহা লিখিয়া জমিদার ১লা বৈশাখ তারিখে কালেক্টরের নিকট দরখাস্ত দিবেন। ঐ দরখাস্ত কাছারির প্রকাশ্য স্থানে লট্‌কান হইবে এবং ঐ সঙ্গে একখানি নোটিশ থাকিবে যে ১লা জ্যৈষ্ঠ তারিখের মধ্যে বকেয়া টাকা না দিলে মধ্যস্বত্ব ঐ তারিখে প্রকাশ্যরূপে বিক্রয় হইবে। ১লা জ্যৈষ্ঠ রবিবার বা ছুটীর দিন হইলে, পরের দিন বিক্রয় হইবে। ঐরূপ নোটিশ জমিদারের নিজের সদর কাছারিতে লট্‌কান হইবে এবং প্রত্যেক মধ্যস্বত্বাধিকারীর জমির উপর কাছারি বা প্রধান নগর বা গ্রামে ঐরূপে জারি করার জন্য জমিদার নোটিশের বা তাহার অংশের নকল পাঠাইবেন। রীতিমত নোটিশ জারি করার জন্য জমিদার স্বয়ং দায়ী হইবেন এবং মফঃস্বলের নোটিশ একজন পিয়ন মধ্যস্বত্বাধিকারী বা তাহার ম্যানেজারের সহিত বা তাহা না পাইলে নিকটে বাসিন্দা ৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির দস্তখত লইয়া জারি করিবে। বৈশাখ মাসের ১৫ই তারিখের পূর্ব্বে নোটিশ জারি হইয়াছে বলিয়া রিটার্ণ দ্বারা জানা গেলে, নির্দ্ধারিত তারিখে বিক্রয় চলিবে। গ্রামস্থ ব্যক্তিগণ দস্তখত দিতে আপত্তি বা অস্বীকার করিলে পিয়ন নিকটস্থ মুন্সিফের কাছারিতে বা মুন্সিফ না থাকিলে নিকটস্থ থানায় যাইয়া নোটিশ জারির বিষয়ে স্বেচ্ছায় প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক উক্তি করিবে এবং মুন্সিফ বা থানার অধ্যক্ষ সেইরূপ করিয়াছে বলিয়া সার্টিফিকেট লিখিয়া দস্তখত ও সিল মোহর করিয়া পিয়নকে দিবেন। আশ্বিন মাসের শেষ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সনের বকেয়া খাজানা উল্লেখ করিয়া জমিদার ১লা কার্ত্তিক তারিখে পূর্ব্বোক্ত প্রকার দরখাস্ত দিতে পারিবেন এবং বকেয়া খাজনা সমুদায় বা বৎসরের প্রথম হইতে কার্ত্তিক মাসের শেষ পর্য্যন্ত মোট টাকার সিকির কম বকেয়া রাখিয়া বক্রী টাকা ১লা অগ্রহায়ণ তারিখের পূর্ব্বে না দেওয়া গেলে ঐ তারিখে মধ্যস্বত্ব বিক্রয় হইবার নোটিশ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তিনি জারি করাইবেন। মধ্যস্বত্ব প্রকাশ্য কাছারিতে বিক্রয় হইবে। যে বেশী ডাকিবে তাহার নিকট বিক্রয় হইবে এবং দেনদার ব্যতীত সকলেই ডাকিতে পারিবে। যে ব্যক্তি টাকা পাইবে ও দেনদারের অধীনস্থ প্রজাগণও ডাকিতে পারিবে। ডাক মঞ্জুর হইলেই খরিদের টাকার শতকরা ১৫ ভাগ দিতে হইবে এবং যে কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে বিক্রয় হইতেছে তিনি ঐ টাকা খরিদদারের হাতে মজুদ আছে বা খরিদদার ২ ঘণ্টা মধ্যে আনিতে পারিবে নিশ্চয় না জানিলে ডাক মঞ্জুর করিবেন না। বিক্রয়ের ২ ঘণ্টা মধ্যে নগদ বা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের

নোটে বা সমমূল্য কোম্পানির কাগজে খরিদের টাকার শতকরা ১৫ ভাগ না দিলে, সম্পত্তি সেই তারিখেই পুনর্ব্বার বিক্রয় করা হইবে এবং খরিদের টাকার অবশিষ্টাংশ অষ্টম দিবসের মধ্যাহ্নের ভিতর না দিলে পর দিবস অর্থাৎ নবম দিবসে সম্পত্তি পুনরায় বিক্রয় হইবে বলিয়া নোটিশ দেওয়া যাইবে। ঐ নোটিশ জেলার সদর ষ্টেসনের বাজারে ঢোল সোহরতে জারি হইবে। নির্দ্ধারিত সময়ে পুনরায় বিক্রয় করিয়া যে টাকা হইবে তাহা প্রথম বিক্রয়ের টাকা অপেক্ষা কম হইলে যত টাকা কম হয় তাহা দেওয়ানী আদালতের ডিক্রিজারির বিধানে প্রথম বিক্রয়ের দিবসে যে ব্যক্তির ডাক মঞ্জুর হইয়াছিল তাহার নিকট আদায় হইবে এবং ঐ ব্যক্তি প্রথম বিক্রয়ের দিবসে শতকরা ১৫ টাকা হিসাবে যে টাকা দাখিল করিয়াছিল তাহা বাজেয়াপ্ত হইবে বিক্রয়ের সময় কাছারিতে পূর্ব্বে যে নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল তাহা তলিয়া লওয়া হইবে এব যেরূপ ভাবে নোটিশে লেখা আছে সেইরূপে মধ্যস্বত্বগুলি পর পর বিক্রয় হইবে। বিক্রয়ের দিন পর্য্যন্ত যত টাকা উসুল হইয়াছে তাহার হিসাব এবং মফঃস্বলে জারি করা নোটীশের রসিদ বা সার্টিফিকেট লইয়া জমিদারের পক্ষে একজন ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবে এবং ঐ হিসাব না দেখিয়া বা ঐ নোটীশের রসিদ না পড়িয়া কোনও মধ্যস্বত্ব বিক্রয় করা হইবে না। ঐ হিসাব দেখা বা রসিদ পড়ার কথা প্রত্যেক মধ্যস্বত্ব বিক্রয়ের একটি পৃথক রোবকারিতে লেখা থাকিবে। ১লা অগ্রহায়ণে বিক্রয় হইলে দেন্দারের কিস্তীবন্দী আনিয়া দেখাইতে হইবে যে বিক্রয়ের তারিখ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সনের মোট প্রাপ্য খাজানার সিকির বেশী বকেয়া আছে। ঐরূপ না দেখাইলে বিক্রয় হইবে না। কাগজপত্র হিসাবাদি যাহা দেখান হইবে, তাহার জন্য জমিদার একাই দায়ী। বাকি খাজানার দায়ে মধ্যস্বত্ব প্রকাশ্যে বিক্রয় হইলে, দেন্দার বা তাহার পক্ষে সৃষ্ট দায় অসিদ্ধ হইবে, তবে যদি দায় সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা জমিদার মধ্যস্বত্বাধিকারীকে মধ্যস্বত্ব সৃষ্টির দলিলে লিখিয়া দিয়া থাকেন তবে ঐ দায় রহিত হইবে না। মধ্যস্বত্বের বিক্রয় দান বা অন্য প্রকারে হস্তান্তর বা বন্ধকাদি ঘটিলে, জমিদার তাহা অমান্য করিয়া খাজানার জন্য মধ্যস্বত্ব দায়ী করিতে পারিবেন, তবে যদি ঐরূপে দায়ী করিতে পারিবেন না বলিয়া জমিদার সুস্পষ্ট অনুমতি দিয়া থাকেন এবং সেই অনুমতি লইয়া হস্তান্তরাদি করা হয় তবে দায়ী করিতে পারিবেন না। বকেয়া খাজনার জন্য তালুক বিক্রয় হইলে, বিশেষ ক্ষমতা না লইয়া যদি কোনও মধ্যস্বত্ব তাঁহার নিজের ও চাষী প্রজাদের মধ্যে দেন্দার সৃষ্টি করিয়া থাকেন তবে ঐ মধ্যস্বত্ব রহিত হইবে। জমিদার ও চাষী প্রজাদের মধ্যে কোনও মধ্যস্বত্ব খরিদ করিয়া খরিদদার খুদকাস্ত রায়ত বা বাসিন্দা এবং পুরুষানুক্রমে চাষী প্রজাকে উচ্ছেদ করিতে পারিবে না এবং আদালতে নালিশ করিয়া যে সময়ে ঐ প্রজার সহিত দেন্দার পক্ষে বন্দোবস্ত করা হয় সেই সময় বেশী নিরিখ লওয়া যাইত এইরূপ দেখাইতে না পারিলে এবং সাবেক বন্দোবস্ত অকপট হইলে তাহা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। বিক্রয় অকপট এবং জেলায় তৎকালীন প্রচলিত নিয়মানুযায়ী হইলে এই আইনের পূর্ব্বে যে সকল তালুক

খিক্রয় হইয়াছে তৎপ্রতি এই আইনের বিধান খাটিবে। তালুকের খরিদদার এবং দেন্দার কর্ত্তৃক সৃষ্ট মধ্যস্বত্বের দখলকারের মধ্যে কোন স্পষ্ট বা অস্পষ্ট চুক্তি বর্ত্তমান আইনদ্বারা রহিত হইবে না। তালুকের বাকি খাজনায় বিক্রয় ছাড়া অন্য প্রকারে তালুক হস্তান্তরিত হইলে, তালুকদার কৃত দায় অসিদ্ধ হইবার পূর্ব্বোক্ত নিয়ম খাটিবে না। জমিদারের বকেয়া খাজনার জন্য পত্তনি বিক্রয়ের নোটীশ জারি হইলে দরপত্তনিদারগণ বা তাহাদের যে কেহ বিক্রয়ের দিন বকেয়া খাজানা আদালতে আমানত করিয়া বিক্রয় বন্ধ করিতে পারিবে অথবা বিক্রয়ের দিন বকেয়া খাজনা পরিশোধ করার জন্য পূর্ব্বেই টাকা আমানত করিতে পারিবে। ঐ আমানত টাকা যথেষ্ট হইলে বিক্রয় বন্ধ করিয়া তাহা হইতে জমিদারের খাজানা দিয়া উদ্বৃত্ত টাকা দরপত্তনিদারকে ফেরৎ দেওয়া যাইবে। ঐ আমানত টাকা দরপত্তনিদারের নিকট হইতে পত্তনীদারের পাপ্য খাজানা হইলে, আমানত করিবার সময় তাহা লিখিয়া দিতে হইবে এবং যে সময়ের বকেয়া খাজনার জন্য পত্তনি বিক্রয় হইবার নোটীশ হইয়াছে সেই সময়ের দরপত্তনিদারের নিকট হইতে প্রাপ্য খাজনার জন্য ঐ আমানত টাকা জমা করা হইবে। যদি দরপত্তনিদারের খাজনা বকেয়া না থাকে তবে ঐ আমানত টাকা পত্তনিদারের পত্তনি বন্ধকে কর্জ্জ লওয়া টাকা বলিয়া গণ্য হইবে এবং দরপত্তনিদার ঐ কর্জ্জ টাকা আদায়ের জন্য পত্তনির দখল লইতে পারিবে। পত্তনি দার দখল লওয়ার তারিখ পর্য্যন্ত শতকরা ১২৲ টাকা হারে সুদসহ ঐ কর্জ্জ টাকা শোধ না দিলে বা রীতিমত মোকর্দ্দমা করিয়া মায় সুদ ঐ কর্জ্জ টাকা পরিশোধ করা হইয়াছে প্রমাণ না করিলে পত্তনি ফিরিয়া পাইবে না। বিক্রয়ের দিন বকেয়া খাজনা দাখিল না করিলে মধ্যস্বত্ব বিক্রয় হইবে। বকেয়া খাজনা না থাকা বা অন্য কারণে জমিদারের বিক্রয় করার ক্ষমতা না থাকায় বিক্রয় অসিদ্ধ হওন সম্বন্ধে কোনও ব্যক্তি আদালতে নালিশ করিতে পারিবে ও যথেষ্ট কারণ দেখাইলে মায় খরচ, ক্ষতিপূরণ ডিক্রী পাইতে পারিবে। জমিদার ও খরিদদার পক্ষ হইবে ও বিক্রয় অসিদ্ধ হইলে যাঁহার প্রার্থনায় বিক্রয় হইয়াছিল তাঁহাকে ঐ খরিদদারকে সমুদয় ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। নোটীশের লিখিত বকেয়া খাজনায় তালুকদারের আপত্তি থাকিলে তিনি নোটীশের মিয়াদের মধ্যে যে কোনও সময়ে সরাসরি তদন্তের পার্থনা করিতে পারিবেন। জমিদারকে কবুলিয়ত এবং অন্য পমাণ যত অল্প সময়ে সম্ভব দাখিল করার জন্য নোটীশ দেওয়া হইবে এবং বিক্রয়ের তারিখের পূর্ব্বেই চূড়ান্ত হুকুম দিবার চেষ্টা করা হইবে। বিক্রয়ের ধার্য্য তারিখে ঐ মোকদ্দমা দায়ের থাকিলে এবং জমিদার বা তাহার উপস্থিত কর্ম্মচারী বকেয়া টাকা যথার্থ বলিয়া প্রকাশ করিলে যদি তালুকদার নগদ বা কোম্পানির কাগজ বা বেঙ্গল ব্যাঙ্কের নোটে ঐ টাকা আমানত না করেন তবে বিক্রয় বন্ধ করা হইবে না এবং সরাসরি তদন্ত চলিবে না। এইরূপ আমানত না করার দরুণ বিক্রয় হইলে বিক্রয় অসিদ্ধকরণ ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে রীতিমত মোকর্দ্দমা করা ভিন্ন দেন্দারের আর কোনও উপায় থাকিবে না। খরিদদার খরিদের টাকা সমুদয় দিলে, যে কর্ম্মচারীগণের তত্ত্বাবধানে বিক্রয় হইয়াছে তাঁহারা খরিদ-

দারকে টাকা প্রাপ্তির একখানি সার্টিফিকেট দিবেন এবং খরিদদার ঐ সার্টিফিকেট লইয়া জমিদারের সেরেস্তায় নিজের নাম পত্তন করা-ইবে এবং জমিদার চাহিলে বাৎসরিক জমার অর্দ্ধাংশ পরিমাণ মূল্যের জামিন দিয়া রীতিমত আমলদস্তক বা দখলনামা এবং রায়ত ও অন্যান্য ব্যক্তির প্রতি এখন হইতে তাহাকে খাজনা দিবার নোটীশ পাইবে। বিক্রীত মধ্যস্বত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কাছারির কাগজ জমিদার খরিদ-দারকে দেখাইতে বাধ্য। যদি নাম পত্তন করিতে জমিদার কোনও রূপে বিলম্ব করেন অথবা জমিদারের চাহনানুযায়ী উপযুক্ত জামিন দেওয়া না দিতে আনা সত্ত্বেও জমিদার দখল দিবার হুকুম দিতে অস্বীকার করেন, তবে খরিদদার আদালতে দরখাস্ত দিবে ও আদালত হইতে দখল প্রাপ্তির হুকুম পাইবে। আদা-লতের ডিক্রী অনুযায়ী যেরূপে দখল দেওয়া হয় সেইরূপে নাজির তাহাকে জমিতে দখল দিবে। জমিদার জামিন অপ্রচুর মনে করিয়া বিলম্ব করিলে পূর্ব্বে যেরূপ লেখা হইয়াছে সেইরূপ দেওয়ানী আদালতে আপীল চলিবে। যদি দেন্দার স্বয়ং বা তাঁহার সৃষ্ট রায়ত ও তাহার মধ্যের কোনও মধ্যস্বত্বের অধিকারী কোনও ব্যক্তি খরিদদারকে বাধা দিতে বা খাজনা আদায় করিতে বিঘ্ন জন্মাইতে চেষ্টা করে তবে খরিদদার তৎক্ষণাৎ দেওয়ানী আদা-লতে দরখাস্ত দ্বারা রাজকীয় কর্ম্মচারীগণের সাহায্য চাহিতে পারিবেন।

ক্রমশঃ।

## গ্রন্থ-সমালোচনা।

খোকাখুকুর খেলা। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রণীত। মূল্য ॥৶০ আনা।

এই রকমের যে কয়খানি পুস্তক দক্ষিণা-রঞ্জন বাবু বাহির করিয়াছেন, সবগুলিই সুন্দর হইয়াছে; এখানিও সুন্দর হইয়াছে। শুধু ছেলেরা কেন, ছেলেদের অবিভাবকেরা পর্য্যন্ত ইহা দেখিয়া প্রীত হইবেন—অন্ততঃ আমরা হইয়াছি। ছেলেদের জন্য লিখিত হইলেও স্থানে স্থানে অতি সুন্দর উপদেশপূর্ণ মর্ম্ম প্রকটিত হইয়াছে। একটু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মস্ত বড় হ'তে হ'লে ভাই, করতে হয় কি ?<br>
আগে ভাল করতে হয় মন প্রাণটি।<br>
মন ভাল শরীর ভাল, খুব লেখ পড়,<br>
তা' হ'লেই বড় হ'লে সবাই হ'বে বড়।

এমন সুন্দর পুস্তক আমরা সকল ছেলের হাতেই দেখিতে ইচ্ছা করি। আনন্দের সঙ্গে শিক্ষা, ইহার অপেক্ষা উচ্চ আদর্শ আর কিছু হইতে পারে না। আশীর্ব্বাদ করি, শ্রীমান দক্ষিণারঞ্জন দীর্ঘজীবী হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের এই অংশের পুষ্টিসাধন করিতে থাকুন।

# উপাসনা।

## ব্রহ্মোপাসনাতত্ত্ব।

( ২ )

( ৪ ) ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে ক্রিয়া-ধর্ম্মসাধনার বহির্ভাগে স্থাপন করিয়াছেন।

৯৮। মহর্ষি ব্যাসদেব স্বীয় ব্রহ্মসূত্র নামক বৈদিক উত্তরমীমাংসাশাস্ত্রে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাকে সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াধর্ম্মী সাধনার বহির্ভাগে স্থাপন করিয়াছেন। মহর্ষি জৈমিনি প্রণীত পূর্ব্বমীমাংসানামক বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডীয় দর্শনের পশ্চাৎ ব্যাসদেবের ব্রহ্মমীমাংসা প্রণীত হয়। ব্রহ্মজিজ্ঞাসার স্বাতন্ত্র্য সংস্থাপনার্থ তাহা হইয়াছিল। তাহাতে ইহাই বুঝা উচিত যে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসাতে বেদস্মৃত্যাগমবিহিত ক্রিয়ার স্থূল সূক্ষ্ম কোন লক্ষণ নাই। কেননা যাহা ক্রিয়া লক্ষণধর্ম্মের অতীত তত্ত্ব তাহারই বিচারার্থে ব্রহ্মসূত্রের অবতারণা হইয়াছিল। কিন্তু যদিও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ক্রিয়ালক্ষণবর্জ্জিত, এবং ধর্ম্ম ক্রিয়ার সহিত তাহার শেষাশেষিত্ব, অধিকৃতাধিকার, অঙ্গাঙ্গীভাব এবং সমুচ্চয় সম্বন্ধ নাই, তথাপি নিষ্কাম ঈশ্বরার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান, যাহা কর্ম্ম-যোগনামে অভিহিত হয়, তদুত্থিত চিত্তশুদ্ধির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সমুৎপন্ন হয়। ঐরূপ চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু এই কথা প্রথম সূত্রেতেই সূত্রকার স্থাপন করিয়াছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"ব্রহ্মই কেবল বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন। সকল বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে হয়। যেহেতু বেদের প্রথমে এবং শেষে আর মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতিপরম্পরায় ব্রহ্মকেই দেখান। যেহেতু শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলে ইতর কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি হয়। পশ্চাৎ জ্ঞানের ইচ্ছা জন্মে।"

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য এ বিষয়ে লেখেন, যথা—

"তস্মাদথশব্দেন যথোক্তসাধন-
সম্পত্ত্যানন্তর্য্যমুপদিশ্যতে।"

অতএব "অথাতোব্রহ্মজিজ্ঞাসা চিত্তশুদ্ধিই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু।" এই সূত্রে যে "অথ" শব্দ আছে তাহার দ্বারা ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে যে সাধন সম্পত্তির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মে। সেই সাধন সম্পত্তি এই চারি প্রকার। তাহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি।

১। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। কোন বস্তু নিত্য কোন বস্তু অনিত্য এই জ্ঞান।

২। ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ। ঐহিক পারলৌকিক ফলভোগে বিরাগ।

৩। শমদমাদিসাধনসম্পৎ। শমদম বিবেক বৈরাগ্য উপার্জ্জন।

৪। মুমুক্ষুত্বং। মুক্তির ইচ্ছা। সর্ব্বপ্রকার কামনা ত্যাগপূর্ব্বক মোক্ষেচ্ছা।

(৫) ধর্ম্মক্রিয়া ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার শঙ্করাচার্য্যের নির্ণীত প্রথম প্রকার পার্থক্য ও চিত্তশুদ্ধি।

১৯। কিন্তু প্রাগুক্ত চারি প্রকারে যে চিত্তশুদ্ধি হয় তাহা ঐহিক বা জন্মান্তরীয় কর্ম্মযোগসম্পাত নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধির ফল কি না, সে কথা এ সূত্রে শঙ্করাচার্য্য লেখেন না। এর নিম্নে দৃষ্ট হইবে, যেন তাঁহার মতে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বেও কেবল বেদান্ত পাঠ দ্বারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মিতে পারে। ফলে ঠিক তাৎপর্য্য তাহা নহে। সে কথা নিম্নে বুঝা যাইবে। সে যাহা হউক, ধর্ম্মক্রিয়া এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা এ উভয়ের মধ্যে যত প্রকার পার্থক্য আছে, তাহা পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যাদিতে প্রদর্শন করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নে একটি মাত্র স্থল উদ্ধৃত করিলাম। অন্যগুলি পরে বলিব।

"ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়াঃ প্রাগপ্যধীত

বেদান্তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপপত্তেঃ।"

যাঁহারা বেদান্ত পড়িয়াছেন, ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অগ্রেও তাঁহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইতে পারে। এই উক্তিটি চিত্তশুদ্ধির হেতুস্বরূপ নিষ্কাম ঈশ্বরারাধনারূপ কর্ম্মযোগের বিরোধার্থ নহে; কেননা পূর্ব্বজন্মে তাদৃশ অনুষ্ঠান দ্বারা সেই সব সাধকের চিত্তশুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহাতেই এজন্মে বহুব্যাপারবিশিষ্ট ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অগ্রেই বৈদান্তিকজ্ঞানালোচনায় ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় মতি উৎপন্ন হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের "ন্যায়ার্জ্জিতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।" এই স্মৃতিবচনের ভাষ্যে বিজ্ঞানেশ্বর লেখেন যে, তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির হেতুস্বরূপ ধর্ম্মজিজ্ঞাসা ও তদুৎপন্ন কর্ম্মসন্ন্যাসের প্রমাণ যদি কাহারো পক্ষে ইহজন্মে না পাওয়া যায়, তবে তাদৃশ স্থলে বুঝিতে হইবে যে, সেরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের কর্ম্মসন্ন্যাসরূপ চিত্তশুদ্ধি 'ভবান্তরে' পূর্ব্বজন্মরূপ সংসারে সমুৎপন্ন হইয়াছে। সেই কারণে বর্ত্তমান জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান প্রতিপাদক শাস্ত্র পাঠে ও ব্রহ্মনিষ্ঠায় প্রথমেই মতি জন্মিয়াছে। বিজ্ঞানেশ্বরের সিদ্ধান্ত যথা—

"ভবান্তরপ্রাগ্‌ভূতপারিব্রজ্য ইত্যবগন্তব্যং।"

১ ক। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য যে "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" শব্দ উল্লেখ করিয়াছেন তাহার অর্থ কর্ম্মাববোধনং বিধিবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের জ্ঞান। তাহা ফলাভিসন্ধিবিশিষ্ট। সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে তাদৃশ ধর্ম্মজ্ঞান অপেক্ষিত বলা ন্যায্য হয় না। তিনি ঠিক বলিয়াছেন।

১খ। তিনি যে কহিয়াছেন, চারি প্রকার সাধন সম্পত্তিরূপ চিত্তশুদ্ধির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মে, সে সাধন কি ধর্ম্মক্রিয়া নহে? উত্তর, তাহাকে ধর্ম্মক্রিয়া বলা উদ্দেশ্য নহে। কেননা তাহা বিধিবিহিত নিষ্কাম মানসক্রিয়া মাত্র তাহা, হয় কর্ম্মযোগজ, না হয় সমাধিযোগজ। তাহা সিদ্ধ হইলে পর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মে। এ জন্মেই হউক বা পূর্ব্ব জন্মেই হউক।

১ গ। অতঃপর তিনি কহেন যে, অধীতবেদান্তব্যক্তির অগ্রেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জন্মে—ধর্ম্মজিজ্ঞাসা হউক বা না হউক। এস্থানে "বেদান্ত অধ্যয়ন" শব্দের অর্থ সমগ্র উপনিষৎ,

মন্ত্রবর্ণ ও ব্রাহ্মণ বর্ণান্তর্গত সমস্ত জ্ঞানকাণ্ডীয়-শ্রুতি এবং ব্রহ্মসূত্র। উপনিষদের পাঠ সম্বন্ধেও কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধির ন্যায় অনুশাসন বাক্যসকল আছে, যথা—

১ ঘ। বেদান্তে পরমং গুহ্যং
পুরাকল্পে প্রচোদিতং।
নাপ্রশান্তায় দাতব্যং
না পুত্রায়াশিষ্যায়া বা পুনঃ॥
শ্বেঃ ৬। ২২।

পরম পুরুষার্থস্বরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান সর্ব্ব উপনিষৎ শাস্ত্রে গুপ্ত আছে। ইহা প্রাচীন বাক্য। গুরুদেব এই ব্রহ্মবিদ্যা প্রশান্তচিত্ত পুত্র কিম্বা শিষ্যকে প্রদান করিবেন। অন্যথা নহে।

১ ঙ। যস্যদেবে পরাভক্তির্যথা
দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ
প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ঐ ঐ ২৩।

পরমেশ্বরে যাঁহার পরাভক্তি, এবং যেমন পরমেশ্বরে সেইরূপ গুরুতে ভক্তি তাঁহার নিকট এই বিদ্যা কহিবে।

১ চ। তস্যৈতপোদমঃ কর্ম্মেতি প্রতিষ্ঠা বেদাঃ সর্ব্বাঙ্গানি সত্যমায়তনং।

উপনিষদের প্রাপ্তির উপায় তমঃ দমঃ এবং অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্ম। উহার আশ্রয় বেদ ও বেদাঙ্গ, আর উহার আয়তন সত্য।

( তলবকার ৩৩ )

১ ছ। তদেতদৃচাভ্যুক্তং ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোত্রিয়াব্রহ্মনিষ্ঠাঃ স্বয়ং জুহ্বতে একর্ষিং শ্রদ্ধয়ন্তঃ তেষামেবৈতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত শিরোব্রতং বিধিবদ্‌যৈস্তুচীর্ণং।

( মুণ্ডকে ৩। ২। ১০ )

"অথ ইদানীং ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদানবিধি উপদর্শনেন উপসংহারঃ ক্রিয়তে। তৎ এতৎ বিদ্যা-সম্প্রদানবিধানং 'ঋচা' মন্ত্রেণ 'অভ্যুক্তং' অভিপ্রকাশিতং। ক্রিয়াবন্তঃ' যথোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান যুক্তাঃ 'শ্রোত্রিয়াঃ ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ' অপরস্মিন্ ব্রহ্মণি অভিযুক্তা পরব্রহ্ম বুভুৎসবঃ 'স্বয়ং একর্ষিং' একর্ষিনামানং অগ্নিং 'জুহ্বতে' জুহ্বতি 'শ্রদ্ধয়ন্তঃ' শ্রদ্দধানাঃ সন্তঃ। তেষা এব এতাং ব্রহ্মবিদ্যাং বদেত বদেৎ ব্রুয়াৎ 'শিরোব্রতং' শিরস্যগ্নি ধারণলক্ষণং যথাথর্ব্বণানাং বেদব্রতং প্রসিদ্ধং যেঃ তু চীর্ণং বিধিবৎ' যথা বিধানং॥ ( উক্ত শ্রুতির সংক্ষেপ শাঙ্করভাষ্য ) ইহার অর্থ।

মুণ্ডকোপনিষদে অপরা ও পরা এই দুই বিদ্যার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে বেদচতুষ্টয় ও তদঙ্গ শিক্ষাকল্প শাস্ত্রাদিবিহিত 'ধর্ম্মাধর্ম্মসাধন ও তৎফলবিষয়া' অপরাবিদ্যা প্রদর্শনান্তে প্রথম মুণ্ডকে দ্বিতীয় খণ্ডে দ্বাদশ শ্রুতি অবধি উপনিষৎ সমাপ্ত পর্য্যন্ত উক্ত সাধ্যসাধনরূপ অপরাবিদ্যাতে বিরক্ত পুরুষদিগের অধিকারার্থ সাধন নিরপেক্ষ পরমাত্মবিদ্যা অর্থাৎ পরাবিদ্যার বিস্তার উপদেশ সমাপ্ত করিয়াছেন।

এইক্ষণে উক্ত ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদানবিধি উপদর্শনদ্বারা শাস্ত্রের উপসংহার করিতেছেন।

এই ব্রহ্মবিদ্যা সম্প্রদানেরবিধান বেদ-মন্ত্রেতে এইরূপ অভিপ্রকাশিত আছে। যাঁহারা ক্রিয়াবান, শ্রোত্রিয়, ব্রহ্মনিষ্ঠ, ( অর্থাৎ অপর ব্রহ্মেতে অভিযুক্ত এবং পরব্রহ্মলাভার্থ সচেষ্ট ) এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক একর্ষিনামক অগ্নিতে ( একর্ষি এক ঋষি অর্থাৎ অগ্নি ) স্বয় হোম করেন, তাঁহাদিগকে এই ব্রহ্মবিদ্যা কহিবেক। যাহা-দের দ্বারা যথা বেদ বিধান অগ্নিধারণ লক্ষণরূপ বেদব্রত আচরিত হইয়াছে। ( যাহা অথর্ব্বণিক-

দিগের প্রসিদ্ধ ব্রত) তাঁহাদিগকে এই পরাবিদ্যা সম্প্রদান করিবেক।

১ জ। উপনিষদের উপরি উক্ত চারিটি অনুশাসন-শ্রুতির প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রশান্তচিত্ত, ভক্তিমান, তপো-দমোদসম্পন্ন, অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মকৃৎ, শ্রোত্রিয়, সগুণব্রহ্মোপাসক, পরব্রহ্ম অন্বেষণমান, অগ্নি-ধারারূপ বেদব্রতী ভিতর ইত্যাদি গুণসক্ত শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবেক অর্থাৎ উপনিষৎ ও ব্রহ্মসূত্রের অধ্যয়ন করাইবেক। "বেদান্ত অধ্যয়ন" শব্দের এই তাৎপর্য্য। যাঁহাদের বেদান্ত অধ্যয়ন আছে তাঁহাদের এতগুলি গুণ তৎপাঠের অধিকার স্থলে বিদ্যমান থাকা চাই।

১ ঝ। এই অধিকার কেবল চিত্তশুদ্ধি-রূপী। উপরি উক্ত গুণসমূহ ফলাভিসন্ধির বাঞ্জক নহে। কিন্তু শঙ্করাচার্য্য যে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার উল্লেখ করিয়াছেন এবং কহিয়াছেন যে তাহার পূর্ব্বেও অধীতবেদান্ত ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইতে পারে সে কথা অন্যায় নহে। কেননা চিত্তশুদ্ধিরূপ উপরি উক্ত গুণগুলি অধিকার স্থলে থাকিলেই বেদান্ত-পাঠে বা বৈদান্তিক জ্ঞান লাভে মাত্র জন্মিবে। পশ্চাৎ তাদৃশ পাঠ ও শ্রবণ হইতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইবে। ইহার দৃষ্টান্ত ব্রহ্মচারী। (পরে দ্রষ্টব্য)

১ ঞ। ঐ সমস্ত গুণ-সাধন "ধর্ম্মজিজ্ঞাসার' অন্তর্গত নহে এবং তাহা "ধর্ম্মানুষ্ঠান' শব্দের বাচ্য নহে। জৈমিনি দর্শনে শ্রুতি স্মৃতিবিহিত যে "ধর্ম্মজিজ্ঞাসা" ও "ধর্ম্মানুষ্ঠান" উক্ত হইয়াছে তাহা কাম্যক্রিয়া মাত্র। তাহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু নহে, অধিকারোৎপাদক নহে এবং অঙ্গ নহে। যাহা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা তাহা কর্ম্ম মাত্র। যাহা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা তাহা জ্ঞান মাত্র। কর্ম্ম আর জ্ঞানে সমুচ্চয় সর্ব্ব-শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

১ ট। ঐ সমস্ত সাধন "অনুশাসনবিধি-বিহিত" ও মানসক্রিয়া হইলেও ফলাভিসন্ধি বর্জ্জিত বিধায় তাহা জ্ঞানের অন্তরঙ্গ। নিবৃত্তি ধর্ম্মের অন্তর্গত। কর্ম্মযোগের মধ্যে পরি-গণিত। অন্যান্য প্রকার কর্ম্মযোগও চিত্তশুদ্ধি-জনক। কর্ম্মযোগ ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অন্তর্গত নহে।

১ ঠ। উপরি উক্ত চিত্তশুদ্ধিজনক নিষ্কাম ধর্ম্ম সকল ইহজন্মে বা পূর্ব্বজন্মে বা পরজন্মে পরিপাকাবস্থা প্রাপ্ত হইলে অধীত বেদান্ত ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়, তাহাতে ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা অপেক্ষিত নহে। তথাপি উক্ত অনুশাসনানুসারে ইহজন্মেও ঐ সমস্ত সাধন আবশ্যক।

১ ড। যদি জিজ্ঞাসা কর তবে কি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু সাধকের ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা অর্থাৎ ধর্ম্মার্থবিধিবিহিত কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান কখনও হয় নাই? একথার উত্তর এই যে অতীত পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্মে তাহা হইয়াছে। তাহার ধারা-বাহিক ফলস্বরূপ জন্মজন্মান্তর পরিভ্রমণ, স্বর্গাদিভোগ সকল হইয়া গিয়াছে। সাধক নিষ্কাম ঈশ্বরার্থ কর্ম্মযোগে উপনীত হইলেই কর্ম্মবন্ধন রহিত হইয়া যায়। সে যোগ ঐহিকেও সাধনীয়।

১ ঢ। হিন্দুধর্ম্মে ও হিন্দুশাস্ত্রে যাঁহাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ আপনাকে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু বলিয়া মনে করেন, তাঁহার নিতান্ত উচিৎ এই গভীর ও

গুরুতর অধিকারতত্ত্বটি চিন্তা করেন, উপরি উক্ত গুণসমূহের ও কর্ম্মযোগের সাধন ত্যাগ না করেন এবং পূর্ব্বজন্মে অধিকার সঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া তাহা সঞ্চয়ে শিথিল যত্ন না হন।

১ খ। মহর্ষি ব্যাসদেব বেদান্তসূত্রে কহিয়াছেন ৩।৪।২৬-২৭। "সর্ব্বাপেক্ষাচ যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ। শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ"।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসার অধিকার সঞ্চয় নিমিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠ উপায়। এবং ব্রহ্মজ্ঞান উৎপত্তি হইলেও শমদমাদির সাধন অবশ্য অনুষ্ঠান করিবেক। অর্থাৎ শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি, শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, সমাধি, বিবেক, বৈরাগ্য ও মুমুক্ষা এই সকল সম্পত্তি সঞ্চয় করিবেক। অবহেলা করিবেন না। ফলাভিসন্ধি ত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বরে যোগস্থ হইয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবেক। এই সমস্ত সাধন দ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধতা রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইবেক। অতএব বেদান্তাধিকরণমালায় সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "যজ্ঞশান্ত্যাদিসাপেক্ষং ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনকালে যজ্ঞাদিকর্ম্ম ও শমদমাদিতপস্যার সাধন অপেক্ষিত। "তস্মাৎ যজ্ঞাদীনি শমদমাদীন চ বিদ্যায়োৎপত্তাবপেক্ষতে"। অতএব যজ্ঞাদি ও শমদমাদি তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তিকালে অপেক্ষিত হয়। অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান, ফলদানকালে ঐ সকল কর্ম্মানপেক্ষ হইলেও, উৎপত্তিকালে, সাধনকালে, অনুশীলনকালে তৎসমুহ অপেক্ষা করে। কিন্তু এস্থানে সূত্রেতে কহিতেছেন "ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে পরেও শমদমাদিবিশিষ্ট থাকিবেক"( বাঃ মোঃ বাঃ )।

১ ত। ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুরুষের চিত্তের নির্ম্মলতা স্থিরতর রাখার নিমিত্তে ইহজন্মেও যজ্ঞাদি, নিত্যসন্ধ্যাবন্দনাদি ও নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষে সে সমস্ত ত্যাগের উপদেশ নাই। বরং নিষেধ আছে। বিশেষতঃ যদি এই জন্মে কোন প্রতিবন্ধক বশতঃ মুক্তি না হয়, তবে পরপর জন্মের নিমিত্তে তাহা ধারাবাহিকরূপে চিত্তশুদ্ধিতা বা তৎফলস্বরূপ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যোগাইবেক। এইজন্য ঋষি ও আচার্য্যগণ তৎসমস্ত অনুষ্ঠানের উপদেশ দিয়াছেন।

১ থ। ফলে যাঁহারা না জানেন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যজ্ঞ ও নিত্যাদিকর্ম্মের অনুষ্ঠানে কিরূপে চিত্তশুদ্ধি জন্মায়? একথার উত্তর এই। সর্ব্বশাস্ত্রেই কহেন সেই সব অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি হয়। সেই সমস্ত উপদেশ সাক্ষাৎ ফলজনক বাক্য। তাহা অর্থবাদ নহে। তাহা বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রবিহিত। সুতরাং সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আজ্ঞা। তাহাতে নরবুদ্ধির বিচার্য্য কোন হেতুবাদ নাই। যাঁহাদের শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা আছে এবং তদনুসারে অনুষ্ঠান আছে তাঁহারা স্ব স্ব চিত্তে অচিরে সে মত পবিত্রতা উপলব্ধি করিতে পারেন। অতএব যাহা অনুষ্ঠানসাপেক্ষ তাহার হেতুবাদ কিরূপে দেওয়া যাইতে পারে।

১ দ। তথাপি হেতুবাদার্থী পুরুষদিগের সন্তোষার্থে কিঞ্চিৎ লৌকিক যুক্তি দিতেছি। বহির্নিষ্ঠা বর্জনপূর্ব্বক পরমাত্মাতে আত্মনিষ্ঠ হইবার জন্য চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। বহির্দ্রষ্টাগণের মধ্যেও তারতম্য আছে। কেহ বা ঘোরতর বিষয়স্রোতে পতিত। ঈশ্বরের কথা, শাস্ত্র ও সদ্‌গুরুর উপদেশ এবং সন্ধ্যাবন্দনা ও দেবার্চ্চনাদি তাঁহাদের ভাল লাগে না। ইহা বলাবাহুল্য যে, তাঁহারা এতদূর বাহিরে গিয়া

পড়িয়াছেন যে, তথা হইতে আত্মধামের পন্থা দৃষ্ট, শ্রুত বা অনুভূত হয় না। পক্ষান্তরে কেহবা ফলার্থে ঐ সমস্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। তাহাতে আত্মলাভগৌণ, কিন্তু স্বর্গাদি শুভগতি আশুলভ্য। অতঃপর কেহবা নিষ্কামভাবে ঐ সকল কর্ম্মানুষ্ঠানের যোগে ভগবদারাধনা করেন; বেদস্মৃত্যাগমবিহিত নিয়মপূর্ব্বক আপনাকে সেই অন্তর্যামির অধীন জানিয়া তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞাদি দেবার্চ্চনা, ঈশ্বর ও ঈশ্বরীগণের ধ্যান, নামজপ, সন্ধ্যাবন্দনাদিতপস্যা এবং সমাধি যোগাদি করেন। তাহার অব্যর্থ সঙ্গীস্বরূপ শম, দম, বিবেক, বৈরাগ্যাদি তাঁহাকে আশ্রয় করে। তাহাতে বাহির হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার চিত্ত আত্মপুরির দিকে অভিমুখী হয়। এই ভাবের নাম চিত্তশুদ্ধি। ইহা আত্মনিষ্ঠার অন্তরঙ্গ সাধন। ইহাদ্বারা ক্রমে ক্রমে চিত্তের পরাগ্‌দর্শিতা এবং অস্থৈর্য্য বিদূরিত হইয়া, প্রত্যক্ প্রবণতা এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চাৎ আত্মার মধ্যে আত্মার প্রতিষ্ঠারূপে যে পরমাত্মা বিরাজিত তাঁহাতে আত্মজ্ঞান জন্মে। চিত্তের এই প্রত্যক প্রবণতা, বিধিবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত সমুৎপন্ন হয় না। কেননা স্বাভাবিক উপাসনাদির স্থৈর্য্য ও গাম্ভীর্য্য নাহি।

১০০। সে যাহা হউক সকল শাস্ত্রেরই সিদ্ধান্ত এই যে নিত্যনৈমিত্তিক ও যজ্ঞাদিকর্ম্ম ব্রহ্মার্পিতন্যায়ে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধির কারণ হয়, এবং তাদৃশভাবে যে চিত্তশুদ্ধি হয় তাহাই বেদান্ত অধ্যয়নের, অথবা পুরাণ, তন্ত্র ও গীতাদি শাস্ত্রনিহিত মোক্ষতত্ত্ব শ্রবণ ও অনুশীলনের, পরমোৎসাহস্বরূপ হইয়া থাকে। আর তাদৃশ অধ্যয়নসম্পন্ন এবং শ্রবণ ও অনুশীলনপরায়ন সাধুর হৃদয়ে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উদিত হয় *। যদি ঐহিকে কোন প্রতিবন্ধক না

* অনেকে মনে করিতে পারেন যে, যাঁহাদের বেদান্ত অধ্যয়ন নিষিদ্ধ অথবা সম্ভব নহে এমন স্ত্রী শূদ্র ও দ্বিজগণের চিত্তশুদ্ধিতে ও ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই। কিন্তু একপ মনে করা ভ্রম। কেননা তাদৃশ স্ত্রী পুরুষগণ যদি ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিষ্কামভাবে যথাধিকার নিত্য তান্ত্রিকী বা বৈদিকী তান্ত্রিকী উভয়বিধ সন্ধ্যাবন্দনা এবং তন্ত্রশাস্ত্রানুযায়ী স্ব স্ব ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা ও শিবপূজা করেন, যদি ফলকামনা ত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বরার্থে দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, দোল, জন্মাষ্টমী আদি দেবোৎসব, ব্রতাচরণ, দান, অতিথীসেবাদি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, যদি পৌরাণিক, গুরু অধ্যাপক প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞানী ও সাধুগণের মুখে পৌরাণিকী ও তান্ত্রিকী তত্ত্বকথা শ্রবণ করেন তবে বেদ বেদান্তাদি অধ্যয়নের এবং বিশেষ বিশেষ যজ্ঞাধিকার অভাবেও তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি জন্মিতে পারে। তাদৃশ চিত্তশুদ্ধির ফলে ইহজন্মে বা জন্মান্তরে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অবশ্যই উদিত হইবে।

বেদান্ত শূদ্রাধিকরণে এই সূত্রটী আছে (১। ৩। ৩৮) "শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ" শূদ্রের প্রতি বেদের শ্রবণাধ্যয়ন নিষেধ এবং শূদ্র উপনয়নাদির অধিকারী নহে। স্মৃতিতেও এই নিষেধ আছে। এই সূত্রে এই আশঙ্কা হইতে পারে যে, তবে বুঝি শূদ্র ও স্ত্রীগণের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই। এই সংশয় দূর করিবার নিমিত্ত পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বীয়ভাষ্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "ইতিহাসপুরাণাগমেচাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকার স্মরণাৎ"। ইতিহাস পুরাণাগমেতে চারিবর্ণের (স্ত্রীপুরুষের) অধিকার আছে, ইহা স্মৃতিতে লিখেন। বেদান্তাধিকরণমালার টীকাতেও ঐরূপ সিদ্ধান্ত আছে। "নন্ত শূদ্রস্যাবেদবিদ্যানধিকারে সতি মমুক্ষায়াং সত্যামপি মুক্তির্ন সিদ্ধে-

থাকে তবে উক্ত উৎসাহ ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসার মধ্যে কালভেদ অনুভবনীয় নহে। তাহা সূচিভেদ্য পদ্মপত্রন্যায়ে প্রায় যুগপৎ সম্পন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্রসিদ্ধ উপায়ে উক্তরূপ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত, অধীতবেদান্ত ব্যক্তির ব্রহ্মজিজ্ঞাসা সমুৎপন্ন হওয়া সম্ভব নহে। তিনি বেদান্ত শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত হইতে পারেন কিন্তু অতর্ক্য ব্রাহ্মীমতির পরিবর্ত্তে তাঁহার চিত্ত তর্কনিষ্ঠ হইয়া উঠে। পক্ষান্তরে শাস্ত্রবিহিতরূপে বেদান্তাদি ভারতীয় মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন, শ্রবণ ও আলোচনা ব্যতীত, যে সকল কৃতবিদ্য পুরুষেরা কোনরূপ স্বাভাবিক উপায়ে, বা বৈদেশিক গ্রন্থাদি পাঠদ্বারা, কিম্বা বিদেশীয় আর্য্যগণের বিবৃত উপদেশ ও বক্তৃতা প্রভৃতি শ্রবণদ্বারা আপনাদিগকে লব্ধব্যুৎপন্ন নির্ম্মলচিত্ত ও ব্রহ্মজিজ্ঞাসু বলিয়া মনে করেন তাঁহাদেরও সেরূপ নিশ্চয় অভ্রান্ত ও তর্কবিরহিত নহে। তাঁহারা যে তত্ত্বটিকে ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মপ্রেম, পরমাত্মপ্রীতি, ব্রহ্মলক্ষণ, ব্রহ্মরূপ। ও ব্রহ্মনাম বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছেন হয়তো তাহা হিন্দুশাস্ত্রসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ও আত্মপ্রীতি নহে—যাহা বস্তুতন্ত্র ও অকত্রাত্মক মহামোক্ষতত্ত্বস্বরূপ। অতএব নিত্যনৈমিত্তকর্ম্ম ও যজ্ঞাদির নিষ্কাম ও ব্রহ্মার্পিত অনুষ্ঠানরূপ উপায় হইতে চিত্তের যে ঐকান্তিক নৈর্ম্মল্য এবং বেদান্তাদি মোক্ষশাস্ত্রের পাঠ শ্রবণে মতি সমুৎপন্ন হয় একমাত্র তাহাই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার হেতু। ফলাভিসন্ধিবিশিষ্ট ধর্ম্মক্রিয়া, বেদার্থবাদযুক্ত চোদনালক্ষণধর্ম্মের জ্ঞান অথবা ধর্ম্মজিজ্ঞাসা, অথবা ঈশ্বরাস্তিত্ববিরহিত বিধিকৈঙ্কর্য্য ও ধর্ম্মরঞ্জন ব্রহ্মজিজ্ঞাসাতে অপেক্ষিত নহে। কেন-না জ্ঞান আর কর্ম্মের চিরবিরোধ সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত। তাহা সমস্ত পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা জ্ঞাত আছেন।

---

দিতি চেন্ন স্মৃতিপুরাণাদিমুখেন ব্রহ্মবিদ্যোদয়ে সর্ব্ব মুক্তিসিদ্ধেঃ; (১০ অধিকরণ)। যদি এমন আশঙ্কা কর যে, বেদবিদ্যাতে শূদ্রের অনধিকার সত্ত্বে তাঁহাদের মুক্তি হয় না, ইহার উত্তর দিতেছেন যে গীতা প্রভৃতি স্মৃতি, পুরাণ ও আগমশাস্ত্র যোগে ব্রহ্মবিদ্যা উদিত হইয়া মুক্তি সিদ্ধ হয়।

বেদশাস্ত্রে যেমন স্ত্রী ও শূদ্রদিগকে বেদবিদ্যাতে অধিকার দেন নাই, সেইরূপ তাঁহাদের অনন্তমঙ্গলার্থে গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীগণের দৃষ্টান্ত সনাতন বেদবাণীস্বরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহাদের বেদবেদান্তাধ্যয়নে অধিকার ছিল এমন কোন উক্ত হয় নাই। তথাপি তাঁহারা যখন ব্রহ্মবাদিনী হইতে পারিয়াছিলেন তখন অন্য স্ত্রীগণ কেন না পারিবেন, ইহাই ঐ সনাতন দৃষ্টান্তের উদ্দেশ্য। অতঃপর সুলভা প্রভৃতি আরো অনেক জ্ঞানী স্ত্রী এবং শূদ্রজাতীয় বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতি জ্ঞানীগণ ছিলেন। এসব দৃষ্টান্ত পুরাণ ও ইতিহাসে আছে। এই ভারতবর্ষে সমস্ত পুরাণ, মহাভারত, গীতাস্মৃতি এবং আগমশাস্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যার অভাব নাই। তাহাতে বেদান্তবেদ্য পরমাত্মার জ্ঞান ও উপাসনা ভাষান্তরে বিবৃত হইয়াছে এবং জগদ্গুরু সদাশিব বেদ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা আকর্ষণপূর্ব্বক স্ত্রী শূদ্র ও দ্বিজবন্ধুদিগের কল্যাণার্থে তন্ত্রশাস্ত্রের মধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। তদনুবর্ত্তী হইয়া চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মবিদ্যা উপার্জ্জন করিলে সকলেই মুক্তি পাইবেন। ইহা দেবদেব মহাদেবের প্রতিজ্ঞা।

# ইউরোপীয়গণ ভারত-সন্তান।

"ইউরোপীয়গণ ভারতসন্তান," এ কথা শ্রবণ করিয়া হয় ত শুক্লদ্বৈপায়নগণ শিহরিয়া উঠিবেন, কিন্তু আমরা যখন প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল জগতের আদি মহেতিহাস বেদাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, তখন আমরাও যে সহজেই "আত্মনি অপ্রত্যয় চেতা" হইব, এরূপ নহে। ভারত জগতের দ্বিতীয় "প্রত্নৌকঃ",তাহাতে কোন সন্দেহই নাই কিন্তু পারস্য, তুরুস্ক,আরব, মিশর ও সমগ্র ইউরোপ বাসী সভ্য জাতি যে এই ভারতবর্ষ হইতেই ঐ সকল দেশে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাও এক প্রকার ধ্রুবই। অনেক সাহেবেরা বলিয়া আসিতেছেন যে, মধ্য এশিয়ার কোন একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে তাঁহারা পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছেন, আর আমরা ও পারসিকগণ তথা হইতে এক সঙ্গে ঈরাণে আসিয়া উপনিবিষ্ট হই পশ্চাৎ আমরা ঈরাণ হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতে আসিয়া হিন্দু নামে প্রখ্যাত লাভ করি। কিন্তু সেই আদি পিতৃভূমি কোন্ স্থান, তাহাও অদ্যাপি তাঁহারা অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইয়া দিতে সমর্থ হয়েন নাই, এবং তাঁহাদিগের অন্যান্য উক্তির সমর্থনজন্যও তাঁহারা অদ্যাপি কোন একটি বলবৎ প্রমাণেরও অবতারণা করিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে আমরা যাহা যাহা বলিব, তাহার সমর্থনজন্য আমরা যথাসাধ্য প্রমাণ প্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। মাননীয় Pococke সাহেব তাঁহার India in Greece নামক গ্রন্থের একত্র বলিয়াছেন যে—

That in the earliest times, primitive nations, related by language to each other, had their origin in the common elevated country of central Asia, and that the Iranians and Indians were once united before their emigration into Iran and India.

Page—132

অতি প্রাচীনকালে প্রাচীনতম জাতিসমূহের মধ্যে একের সহিত অন্যের কি সম্পর্ক, তাহা তাঁহাদিগের ভাষার দ্বারাই জানা যাইত। তাহারা সকলেই মধ্য এশিয়ার এক উন্নত ভূমির সাধারণ অধিবাসী ছিলেন; ইরাণীয়ান বা পারশিকগণ ও হিন্দুগণের ভাষাগত এত সৌসাদৃশ্য যে তাহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, তাঁহারা ঈরাণ ও ভারতে প্রবেশের পূর্ব্বে এক স্থানের অধিবাসী ছিলেন।

পোককের এই কথাগুলি একবারেই যে ভিত্তিশূন্য,তাহ আমরাও বলি না, গ্রীক্,ল্যাটিন, জর্ম্মাণ ও শাকসন প্রভৃতি জাতির পূর্ব্বপুরুষগণের সহিতও যে আমরা অতি পূর্ব্বে সেই আদি সূতিকাগারে একত্র বাস করিতেছিলাম, তাহাও সম্পূর্ণ সত্য কথা। কিন্তু কি পারশিক বা জেন্দজাতি অথবা কি ইউরোপীয়গণের

পূর্ব্ব পিতামহগণ সকলেই সেই আদি জন্মভূমি হইতে প্রথমে ভারতবর্ষে আসিয়া কিয়ৎকাল বসবাসের পর ভারতে আর্য্য নামে সমলঙ্কৃত হইয়া পরে ভারত হইতেই কেহ পারস্য, কেহ আরব, কেহ তুরুষ্ক, কেহ মিশর ও কেহ কেহ ইউরোপে যাইয়া নানা জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন।

পারসিকগণের জেন্দাভস্থাতে লিখিত আছে যে, তাঁহাদিগের পূর্ব্ব বাসস্থানের নাম "Aryanam Vaejo," এই "আরিয়াণাম্ ভেইজো" শব্দের অর্থ আর্য্যদিগের বর্ত্ত বা স্থান ভিন্ন আর কিছুই নহে। বহু পাশ্চাত্য মনীষী উহার প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া উক্ত কথাটীকে স্ব স্ব গ্রন্থে—

Aryana Vaejo বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেই অর্থবোধে ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। যাহাহউক আর্য্যনামধারী অসুরসেবী কতকগুলি ভারতসন্তান আমাদিগের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়া ত্রেতাযুগে পারস্যের উত্তরভাগে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহাতেই তাঁহাদিগের সেই আশ্রয়ভূমি আর্য্যাণাং অয়নং বা আর্য্যায়ণনামে প্রখ্যাতি লাভ করে। সেই আর্য্যায়ণ শব্দই বিকৃত হইয়া প্রথমে আইরাণ ও পরে ঈরাণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। এই অসুরাখ্য বৈদিক জামিশত্রু আর্য্যগণের সহিত দেবী চণ্ডীর যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাই মার্কণ্ডেয়-পুরাণে দেবীযুদ্ধ বা দেবাসুরযুদ্ধ বলিয়া সমাখ্যাত। শুম্ভ ও নিশুম্ভ এই অসুরনেতা ছিলেন, তাঁহারা সসৈন্যে দেবীর হস্তে নিধন প্রাপ্ত হয়েন। এবং এই ইরাণবাসী বল ও বৃত্র নামক অসুরই ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। এবং এই অসুরগণের একদল তুরুষ্কে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিলে তাঁহাদিগের অধ্যুষিত স্থান অসুরীয় বা সীরিয়া এবং আসুরীয় বা Assaria নামে প্রখ্যাত হয় আর তাঁহারা Assarian নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন। এবং বেদবর্ণিত ভারতীয় পণি নামক অসুরগণই জগতে Phœnisian (ফিনিসীয়ান) ও তাঁহাদিগের অধ্যুষিত স্থান Phœnisia নামে প্রথিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ হইতে যে সকল জাতি পশ্চিমদিকে গমন করিয়াছিলেন এই অসুরাখ্য আর্য্য বা পারসিকগণই তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথম ভারতীয় ঔপনিবেশিক। ইহার বহুকাল পরে ভারতের পূর্ব্বাধিবাসী তুর্ব্বশু-সন্তান যবনগণ ভারতসাম্রাজ্যের সামন্ত রাজ্য দক্ষিণ পারস্য বা দ্বিতীয় যবন দেশ হইতে তুরুষ্কে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে যাঁহারা তুরুষ্কেই থাকিয়া যান, তাঁহারা জগতে হিব্রু বা যিহুদা জাতি বলিয়া প্রখ্যাত, আর যে দল তুরুষ্ক হইতে আরবে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই মহম্মদের সময়ে মুসলমাননামের বিষয়ীভূত হয়েন। এবং তাঁহারা ভূতপূর্ব্ব চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া অদ্যাপি আপনাদিগের পতাকাদিতে অদ্ধচন্দ্র বিলসিত করিয়া আসিতেছেন। এই তুরুষ্কগত যবনগণের অন্য যে দল মিশরে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহাদিগের মধ্য হইতেই একদল লোক ইউরোপের দক্ষিণে যাইয়া সমুদ্রতটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তথায় Ionio নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন। বলা বাহুল্য উক্ত আইওনিও শব্দ আমাদিগের যাবনিক শব্দের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাইবেলও বলিতেছেন যে—

Now these are the generations*

of the sons of Noah, Shem, Ham, and Japheth. The sons of Japheth;—Gomer, and Magog, and Madai, and Javan & and the sons of Javana;—elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim By these were the isles of the Gentiles divided in their lands; every one after his tongue after their families, in their nations.

Genesis chap 10

অথ নোহের পুত্র শেম, হেম ও যেফতের বৃত্তান্ত। গোমর মাগোগ, মাদয় ও যবন প্রভৃতি যেফতের সন্তান এবং ইলীশা, তর্শীশ ও কিত্তিম দোদানীম ইহারা যবনের সন্তান। এই সকল হইতে পরজাতীয়দের দ্বীপনিবাসীরা আপনাদের দেশ বিদেশে স্ব স্ব ভাষানুসারে ব্যাপ্ত হইয়া আপন আপন জাতির নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইল।

আমরা ইহা হইতে এইমাত্র সত্য পাইতেছি যে বাইবেল আমাদের নহুষকে নোআ, যযাতিকে যেফত ও যযাতির পৌত্র (তুর্বশুর পুত্র) যবনকে যবন বলিয়া অবগত ছিলেন। আর সেই যবনদিগের যে ভাগ গ্রীশের দ্বীপাবলীতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন তাহারাই সমগ্র আইওনিও জাতি ও তাঁহাদিগের অধ্যুষিত দ্বীপপুঞ্জ আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ বলিয়া প্রখ্যাতি লাভ করে।

এদিকে পাশ্চাত্যগণ বলিতেছেন যে পিলাসজি জাতি ও হেলেনিক জাতি একই। হেলেন নামক ব্যক্তির নাম হইতে হেলেনিক জাতির নাম সমাগত। এবং হেলেনের পুত্র পৌত্রগণের নাম হইতে ডোরিয় আইওনীয় একিয় ও ইয়োলীয় নামে যে চারিটী বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল, তাহাদিগেরই সমবায়ে গ্রীকজাতি সমুৎপন্ন। কিন্তু অধুনাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও ইহাতে আস্থা প্রদর্শন করেন না, আমরাও ইহাতে আস্থা প্রদর্শন করিতে পারিতজ্ঞান্য নহি। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গ্রীশের আইওনীও জাতি আমাদিগের তুর্বশুসন্তান যবনগণের শাখা-বিশেষ মাত্র তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা আপনাদিগকে দ্বারকাবাসী কৃষ্ণের সগণ বলিয়া পরিচিত করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ তাঁহারাই ডোরিয়ান বা ডোরীয় নামের বিষয়ীভূত হয়েন। উক্ত ডোরীয় ও ডোরিয়ান শব্দ আমাদিগের দ্বারকীয় ও দ্বারকীণ শব্দের বিকার ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বলিতে পার যবনগণ তুর্বশুসন্তান, আর দ্বারকাবাসী কৃষ্ণাদি তুর্বশুর ভ্রাতা যদুর সন্তান। সুতরাং যবনেরা কি প্রকারে উক্ত ডোরীয় বিশেষণের বিষয়ীভূত হইতে পারেন? হাঁ আপাততঃ দৃষ্টিতে ইহা বিরুদ্ধ বলিয়াই অনুমিত হইতে পারে কিন্তু পরমার্থতঃ এখানে কোন বিরোধ ঘটে নাই। প্রকৃত কথা এই যে বংশের মধ্যে যিনি প্রধান ও সর্ব্বত্র বিদিত হয়েন, তাঁহার ভ্রাতার বংশীয়েরা অনেক সময়েই তাঁহার নামেই আপন বংশের পরিচয় দিয়া থাকেন। আমরা দেখিয়াছি যাঁহারা কুহি সেনের ভ্রাতার বংশীয়, তাঁহারাও অনেকে এইক্ষণে আপনাদিগকে কুহিসেন বলিয়া পরিচিত করিয়া আসিতেছেন। যথা কুং চন্দ্রপত্তায়াং ভরতেন—

অথ শ্রীবৎসমুখ্যানাং
শক্তিগোত্রসমুদ্ভবাং।
বংশাবলীং যথাজ্ঞাতং

ক্রতে ভরতমল্লিকঃ॥
শ্রীবৎসশ্চ শিয়ালশ্চ
পরশ্চন্দ্রশ্চ মুণ্ডিরঃ।
রামশ্চ ষডমী শক্তি-
গোত্রে বীজীন ঈরিতাঃ॥
কিন্তু শ্রীবৎসগৌলো যো
ডয়িসেনমহাযশাঃ।
স বীজী শক্তিগোত্রেষু
সর্বেষ্বেব প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সর্বেহমী শক্তিবংশ্যত্বাৎ
গোষ্ঠীশ্রেষ্ঠতয়া তথা।
অন্যবংশভবত্বেহপি
ডয়িনাম্না প্রতিষ্ঠিতাঃ॥

২১১ পৃষ্ঠা।

কেবল বংশ নহে অনেক স্থলে লোকে আপন আপন বাসস্থানের নামও সংগোপিত করিয়া নিকটবর্ত্তী পরিচিত প্রধান স্থানের নাম লইয়া থাকেন। যেমন বাকসার লোকেরা বলেন, আমাদের নিবাস জনায়ী, বাণাবনের লোকেরা বলেন উলুবেড়িয়া, নৈহাটীর লোকেরা বলিয়া থাকেন ভাটপাড়া ইত্যাদি। সুতরাং এই ডোরীয়গণও তুর্বসুসন্তান যবন জাতি ভিন্ন আর কিছুই নহেন। মহাকবি ৺নবীন চন্দ্র সেন বলিয়াছেন যে,আমাদের 'হরিকুলেশ' শব্দই অপভ্রষ্ট হইয়া গ্রীসে Hercules রূপে বিরাজ করিতেছে। India in greece নামক গ্রন্থের প্রণেতা প্রসিদ্ধ পোকক সাহেবও ( Pococke ) বলিতেছেন যে—

The tribe of Yudah is in fact the very Yadu. Page 221. The Afgans have claimed descent from Jews, or Ioudaioi ( Youdai-oi ); the reverse is the case. The Haib-rews, or Khaibrews are descended from the Yadu. Page 222.

তুরুন্দের হিব্রুগণও যুডাজাতি বলিয়া সমাখ্যাত হইয়া থাকেন, তাহারও হেতু ইহাই যে তাঁহারা ভারতীয় যদুর সন্তান। ফলতঃ যাদব হইতে য়ুডা ও যাদবীয় হইতে য়ুডিয়া শব্দের সমুদ্ভব হওয়া বিচিত্র নহে। গান্ধার রাজ কন্যা যাদবীয় কন্যা বলিয়া বিখ্যাত, তুর্বসুতনয় হিব্রু যবনগণও আপনাদিগকে হরিকুলেশ শ্রীকৃষ্ণের দায়াদ বান্ধব বলিয়া পরিচিত করিতে যাইয়া আপনাদিগকে যাদব বা য়ুডা বলিয়া নির্দ্দেশ করাও বিচিত্র নহে। যাহাহউক আরব ও মিশরগত যবন, হিব্রু যবন ও গ্রীসগত যবনেরা যে ভারতের তুর্বসু সন্তান তাহা যেন ধ্রুবই।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা গ্রীস দেশে "এীকয়" নামে আর একটা জাতির অস্তিত্বের কথা অবতারিত করিয়া থাকেন। এই জাতির নিদান কি, এই শব্দটীরই বা প্রকৃতি প্রত্যয় কি হইতে পারে, তাহা তাঁহারা কেহই স্থির ও ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে পোকক সাহেব তাঁহার গ্রন্থের বহুস্থানে গ্রীস দেশে শাকসম জাতিরও উপনিবেশের কথা বলিয়াছেন—

And here I would pause to direct the attention of the reader to the wellknown passage to Thucydides, so forcible an evidence of the Scythic origin of the Athenians, and so amply can formed by the geographical evidences I shall

bring forword. It is not long since." observes that sagacious writer, that the more eldeily among the rich Athenians, ceased to weai linen tunics, and to wreathe their hair in a knot, which they clasped by the insertion of a golden grass-hopper. Hence, also, this fashion was, an a principle of nation all affinity, extensively prevalent among the more ancient Ionians. Page 52.

যদি এথেনিয়ানগণ ভূতপূর্ব্ব শাইথিক জাতি হয়েন, আর আমাদিগের শক জাতিকেই যদি পাশ্চাত্যেরা সাইথিক বা সিদিয়ান বলিয়া জানেন, তাহা হইলে আমরা গ্রীশের সেই "একিয়" জাতিকে শক বা শাকাবংশ্য বলিয়া মনে করিতে চাহি। শাকা হইতে শকিয় ও শকিয় হইতে ঽকিয় ও একিয় হওয়া খুব সম্ভবনীয়। পোকক উঁহাদের পরিচ্ছদ মস্তকের কেশ এবং বেশভূষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে উঁহারা যে ভূতপূর্ব্ব ভারতবাসী তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। তবে "ইয়োলীয়" জাতি বা উক্ত শব্দের যে নিদান কি তাহা দুর্ব্বোধ্য। গ্রীশদেশে "পিলাসজী" নামে একটি জাতি বাস করিত। পোকক বলেন, উঁহাদের প্রকৃত নাম পিলাসগয়ী (Pelasgoe) এবং উঁহারা বিহার দেশের মধ্যগত পিলাস নামক গ্রামের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী। সম্ভবতঃ পিলাসগ্রামী কথা হইতে পিলাশগয়ী শব্দ ব্যুৎপাদিত, কিন্তু ভগবান্ জানেন, ইহার ভিত্তি কতদূর সমূলক। এই জাতি হইতে লাটিন জাতিও সমুদ্ভূত। পাশ্চাত্যেরা ইহাও বলিয়া থাকেন যে গ্রীশ ও রোমের হেলেনিক জাতির নিদানও এই পিলাশজী জাতি। এবং হেলেন নামক এক ব্যক্তি হইতে উক্ত হেলেনিক জাতির নাম ব্যুৎপাদিত। তাঁহারা ইহাও বলিয়া থাকেন যে, গ্রীশে যে হেলাস নামে একটি জনপদ আছে, হেলেনিকগণ উহারই আদি ঔপনিবেশিক। কিন্তু পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের অনেকে আবার এই ঐতিহ্যে আস্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন না, আমরাও ইহাতে যোগ আনা তথাস্তু বলিতে নারাজ। আমরা মনে করি যে হেলাসবাসী বলিয়া উক্ত জাতিটি হেলেনিক নামের বিষয়ীভূত, এব ভারত হইতে ইউরোপে গমনের পূর্ব্বে এরূপ কোন স্থানে বাস করিয়াছিলেন, যাহা হইতে উঁহারা পিলাশগয়ী বা পিলাশজী নামেও বিশেষিত হয়েন। আধুনিক বৌদ্ধযুগের পিলাশ গ্রাম হইতে লোক যাইয়া যে গ্রীশে পিলাশজী নামে প্রখ্যাতি লাভ করিয়াছেন ইহা যেন ঠিক প্রকৃত কথা নহে।

তবে হেলাস ও হেলেনিক জাতির নিদান কি? আমরা মনে করি যে, সগরকর্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া যেমন যবন ও শকসুহ্মরা নানা স্থানে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তদ্রূপ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় কম্বোজগণও সগরকোপে ভ্রষ্টধর্ম্ম ও বিকৃতবেশ হইয়া গ্রীশ ও ইটালিতে যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই কম্বোজ শব্দের অপভ্রংশেই "হেলাশ" Helas শব্দ ব্যুৎপাদিত—

কম্বোজ কমোজ হমোজ হনোজ
হলোজ হলোশ হেলাশ

কম্বোজেরা গ্রীশে যাইয়া এই হেলাশনামে প্রথিত হয়েন ও তাঁহাদিগের অধ্যুষিত স্থানও হেলাশনাম ধারণ করে। কালে ঐ হেলাশ হইতে হেলেনিক নাম ব্যুৎপাদিত হইয়াছে। অবশ্য কেহ কেহ এরূপ বলিয়া থাকেন যে—সংস্কৃত সূর্য্য শব্দ ভাষার বিকারে গ্রীশে Helios রূপ ধারণ করিয়াছিল। তজ্জন্য সূর্য্য-বংশীয় লোকেরা তথায় হেলেনিক নামে প্রখ্যাতি লাভ করেন। কিন্তু শক ও কম্বোজ-গণ সূর্য্যবংশীয় (বৈবস্বত বংশীয়) হইলেও আইওনিও বা যবনগণ তাহা নহেন, তাঁহারা চন্দ্রবংশীয়, সুতরাং নানা জাতির সমবায় সমুত্থ গ্রীক জাতিকে কেবল সূর্য্যবংশীয় বলা যাইতে পারে না। ঐতিহাসিকেরা আইও-নিয়ানগণকেও হেলেনিক জাতির অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং উক্ত হেলেনিক উপাধি হেলাশ দেশ হইতে পরন্তু সূর্য্যার্থক Helios শব্দ হইতে ব্যুৎপাদিত নহে। বলিবে, কম্বোজ শব্দ কি প্রকারে হেলাস শব্দে পরিণত হইল? ভাষার বিকারের ইহাই ত সনাতনবিধি? প্রত্যেক শব্দই পাঁচ ছয়টি বিকারের ভিতর দিয়া শেষে অন্য পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে। অহং হতে ও মুই, এবং অবদ্য ও Bad ইহাদের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলেই সকলে আমা-দিগের কথার যাথার্থ্য অনুভব করিতে পারিবেন।

যাহা হউক গ্রীশদেশে যত জাতিই কেন বর্ত্তমান গ্রীকজাতির দেহ প্রতিষ্ঠা করুক না তন্মধ্যে শক, যবন ও কম্বোজগণই যে প্রধান, তাহাতে আর সন্দেহমাত্রই নাই। সুতরাং গ্রীকজাতির একাংশ যবনজাতি হইলেও সমগ্র গ্রীকগণ যবনপদবাচ্য নহেন। সত্য বটে, মহারাজ অশোকের সাহাবাজগড়ী শিলা-পট্টে আলেকজেণ্ডার প্রভৃতি পাঁচজন রাজাকে জোনরাজ বা যবন রাজা বলিয়া বিবৃত করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা ঠিক হয় নাই। ফলতঃ হিন্দুরা ঐ সকল দেশের সকলকেই যবন বা ম্লেচ্ছ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, তাহারই ফলে প্রস্তরফলকে উক্ত প্রমাদের অবতারণা করা হইয়াছে। রঘুনন্দনাদি ইংরাজ ও মোসলমান প্রভৃতি সকল জাতিকেই যবন বলিয়া বিশে-ষিত করিয়াছেন, কিন্তু ইংরাজ জাতিতে যবনের কোন সংশ্রবই বিদ্যমান নাই, আর মুসলমানমাত্রেই যে যবন, এরূপও নহে। আফগানিস্থানের বহু এমন কি আমীর ওমরাহ-গণ সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় ও ভরতবংশধর, আর পারস্য ও তুরুস্কের বহু মুসলমানও অসুরবংশ-প্রভব, সুতরাং বিশুদ্ধ ভারতীয় আর্য্য সন্তান, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ বৈশ্য ও কেহ শূদ্র। ভারতবাসী মুসলমানগণের মধ্যেও শতকরা পাঁচজনও যবন কি না, তাহাতে গভীর সন্দেহ। যাহা হউক যে সকল ভারতবাসী গ্রীশে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহারাই কেহ কেহ ইটালিতে যাইয়া লাটিন জাতির দেহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাই গ্রীক ও লাটিন ভাষা সম্পূর্ণ সংস্কৃতগন্ধী ও সংস্কৃতবহুল। মহামতি পোকক বলিতেছেন যে—

But with the certainty that Sanskrit was the language of Pelasgic and Hellenic Greece. Page 15.

Every day adds fresh conviction produces fresh demonstration, of

this undeniable fact. The Greek language is a derivation from the Sanskrit; therefore, Sanskrit speaking people—i,e, Indians, must have dwelt in Greece. Page 18.

"In the parallel case of an Indian colonisation of Greece,—not only her Language, but her Philosophy, her Religion, her Rivers, her mountains and her Tribes; her subtle turn of intellect, her political institutes, and above all the Mysteries of that noble land,—irresistibly prove her colonisation from India. Page 19.

আমরাও "সংস্কৃত ভাষাই সমগ্র আর্য্য ভাষার আদি জননী" এই প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, গ্রীক ও লাটিন প্রভৃতি ভাষা সংস্কৃত হইতে অপভ্রষ্ট, সুতরাং সংস্কৃতভাষী লোকেরাই যে কোন স্থান হইতে গ্রীস ও ইটালিতে যাইয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন তাহাও ধ্রুব। কিন্তু সেই সংস্কৃতভাষী লোক কাহারা? তাহারাই ভারতের যবন, শক ও কম্বোজ জাতি। তাই ভারতের বৈদিক পবন, দ্যাপিতরঃ ও স্বর্গা প্রভৃতি জড়দেবতা এবং তান্ত্রিক যুগের Jenus (গণেশ) ও Phabas (ভবস্) প্রভৃতি নরদেবতাগণও ঐ সকল দেশে উপাস্য দেবতা বলিয়া পরিগণিত, এবং ভারতের জ্যোতিষ, বিজ্ঞান ও গণিত প্রভৃতি যাইয়া গ্রীস ও রোমে উপনিবিষ্ট হইয়াছে। মহামতি পোকক আরও বলিতেছেন যে—

I come now to one of the strongest evidenes of mythology—mythology first Indian, then Greek.

Page 89.

অর্থাৎ গ্রীসের ভাষা, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান ও সভ্যতা ভব্যতাই কেবল ভারতীয় তাহা নহে, গ্রীসের মাইথলজীও সম্পূর্ণ ভারতীয়। এই সকল মাইথলজীর উৎপত্তি স্থান ভারতবর্ষ, পরন্তু গ্রীশ নহে।

তবে কি যবনজাতক ও রোমকসিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থ সকল গ্রীক যবন ও ইটালীর রোমনগরবাসী লাটিন জাতির নহে? আমরা ত "যবন জাতির পদার্থনির্ণয়" প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, যবনজাতক গ্রন্থ হিন্দু যবনগণ কর্ত্তৃক বিরচিত? উহার প্রারম্ভ শ্লোকাবলী কৃষ্ণ ও হরিহর ব্রহ্মাদির স্তোত্রে পরিপূর্ণ? আর রোমকসিদ্ধান্তও টাইবরতীরবাসী রোমক জাতির সম্পত্তি নহে। পৃথিবীতে তিনটী রোমক পত্তন বিরাজমান, উহার আদি রোমক পত্তন কেতুমালবর্ষ বা অন্তরিক্ষের অন্তর্গত অপোগস্থানের অন্তর্গত। যদুক্ত ভাস্করাচার্য্যেণ—

> লঙ্কা কুমধ্যে যমকোটি রস্যাঃ
> প্রাক্ পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
> উদক ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ
> সৌম্যেঽথ যাম্যে বড়বানলশ্চ॥ ১৭
>
> ভুবনকোশ।

অর্থাৎ লঙ্কানগরী পৃথিবীর মধ্যগত, ইহার পূর্ব্বে যমকোটি নগর, পশ্চিমে রোমক পত্তন, উত্তরে সিদ্ধপুর সুমেরু (North pole) এবং দক্ষিণে বড়বানল।

তবে এই রোমক পত্তন ও টাইবরতীরবর্ত্তী রোমক পত্তন কেন অভিন্ন বলিয়া মনে করা

থাউক না? না তাহা নহে। কেননা আমাদিগের পরিচিত গন্ধমাদন পর্ব্বত ইহার আসন্নবর্ত্তী বলিয়া বিবৃত। তথাহি—

মাল্যবাংশ্চ যমকোটি পত্তনাৎ
রোমকাচ্চ কিল গন্ধমাদনঃ।
নীলশৈলনিষধাবধী চ তৌ
অন্তরাল মনয়োরিলাবৃতম্॥ ২৮
মাল্যবজ্জলধিমধ্যবর্ত্তি যৎ
তত্তু ভদ্রতুরগং জগুর্বুধাঃ।
গন্ধশৈলজলরাশিমধ্যগং।
কেতুমালক মিলাকলাবিদঃ॥ ২৯

ভুবনকোশ।

চীনদেশের যে স্থান ঠিক নিরক্ষবৃত্তের উপরে ও সর্ব্ব পূর্ব্বে বর্ত্তমান উহার নাম যমকোটি নগর। উহার উত্তরে মাল্যবান পর্ব্বত। আর রোমকপত্তনের উত্তরে গন্ধমাদন পর্ব্বত। উক্ত পর্ব্বতদ্বয় নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই গন্ধমাদন ও মাল্যবান্ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থান লইয়া ইলাবৃতবর্ষ পরিগণিত। আর মাল্যবান পর্ব্বত ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান ভদ্রাশ্ববর্ষ (চীন) এবং গন্ধমাদন পর্ব্বত ও আরব সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী স্থান কেতুমালবর্ষ।

তাহা হইলেই এই রোমকপত্তন আফগানিস্থান ভিন্ন ইউরোপে হইতে পারে না। তুরস্ক পারস্য ও অপোগস্থান লইয়া কেতুমালবর্ষ বা অন্তরিক্ষ পরিগণিত। আফগানিস্থানের উত্তরে যে পর্ব্বতশ্রেণী আছে তাহা হিন্দুকুশ পর্ব্বতশ্রেণী এবং সম্ভবত: উহারই প্রাচীনতম নাম গন্ধমাদন পর্ব্বত। আমরা বহুবার বেলুরতাগ পর্ব্বতকে গন্ধমাদন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। বিশ্বকোষও আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে গন্ধমাদন পর্ব্বতকে মানস সরোবরের উত্তরে স্থান দান করিয়াছেন, এতদুভয়ই প্রমাদসন্দুষ্ট।

যাহা হউক আফগানিস্থানের মধ্যে যে রোমকপত্তন ছিল তাহাই জগতের আদি রোমকপত্তন, এবং এতদ্দেশবাসী হিন্দুক্ষত্রিয় কম্বোজেরা যে জ্যোতিষ গ্রন্থবিশেষের প্রণয়ন করেন, উহারই নাম রোমকসিদ্ধান্ত। এবং এই রোমকপত্তনের কম্বোজেরা ইটালীতে যাইয়া উক্ত রোমকপত্তনের অনুকরণে টাইবর-তীরে যে দ্বিতীয় রোমকপত্তনের পত্তন করিয়াছিলেন তাহাই জগতে দ্বিতীয় রোমকপত্তন এবং কনষ্টান্টিনোপল তৃতীয় রোমকপত্তন। এইক্ষণে আরবীয় মুসলমানগণ উক্ত তৃতীয় রোমকপত্তনের অধীশ্বর বটেন, লোকে তাঁহাকে তজ্জন্য রুমের বাদসাহও বলিয়া থাকে। কিন্তু উহাও রোমান জাতিদ্বারা প্রতিষ্ঠাপিত। মহাত্মা পোকক টাইবরের রোমক পত্তনকে রাম নামের বিকৃতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাহা প্রকৃত কথা নহে। তবে ভারতবাসীরা গ্রীশ ও ইটালীতে যাইয়া যে আপনাদিগের পূর্ব্বদেশের নগর ও পর্ব্বতাদির নামের অনুকরণে উপনিবেশ ভূমির নগর ও পর্ব্বতাদির নাম রাখিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। মহাত্মা পোকক এবিষয়ে বহুকথা বলিয়াছেন আমরা তাহা অবনতমস্তকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত। তিনি বলিয়াছেন যে গ্রীশদেশে একটি পর্ব্বতের নাম Athrys উহা ভারতবর্ষের "অদ্রীশ" হিমালয়ের নামানুকরণে বিশেষিত। গ্রীশে Atica ও Abantes নামে দুইটি স্থান আছে, পোকক বলেন, উহা ভারতের আটক ও অবন্তীর অনুকরণ মাত্র। ঐরূপ হিন্দুর সুমেরু পর্ব্বতের

অনুকরণে গ্রীশীয়গণ তথায় To-mar-os নামের ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। পোকক এইরূপও বলিতে বদ্ধপরিকর যে, ভারতের এক বৌদ্ধ প্রচারক গ্রীশদেশে যাইয়া বহু বিষয়ের শিক্ষা দান করিয়াছিলেন, সেই বৌদ্ধ গুরুকেই গ্রীশেরা পুথাগোরাস ও ইংরাজেরা পিথাগোরাস বলিয়া থাকেন। বস্তুতঃ ঐ নামের কোন পৃথক্ ব্যক্তি গ্রীশদেশে ছিলেন না। তিনিই ভারত হইতে যাইয়া তথায় পুনর্জন্ম প্রভৃতির উপদেশ প্রদান করেন। উহা বুদ্ধগুরুস্ শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

Nabody needs be reminded that Pythagoras and his successors held the doctorine of metempsychosis, as the Hindoos universally do the some tenet of the transmigration of souls. 363

He who tought his philosophy, was that great missionary, whose name indicates his office and position—

Sanskrit—Budha Gooroos.

Greek—Putha Goras,

English—Pytha Goras.

Budhas Spiritual Teacher.

Page 364.

এরূপ জনশ্রুতি যে এই পিথা গোরাসই গ্রীশ দেশে জ্যামিতির সপ্তচত্বারিংশ প্রতিজ্ঞার আবিষ্কার করেন। সুতরাং উহাও যে নির্ব্যূঢ় ভারতীয় সম্পত্তি তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। কেবল ইহাই নহে, পোকক সাহেব ভারতের উপচক্ষুমান্ নাবালগদিগের ন্যায় গ্রীকগণকে ভারতের শিক্ষাদাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। পরন্তু তিনি মহামতি কোলব্রুক সাহেবের অভিমত অব্যাহত করিয়া ভারতবাসীদিগকেই গ্রীশের অধ্যাপক বলিয়া বিবৃত করিয়া গিয়াছেন—

I should be disposed to conclude that the Indians were in this instance Teachers, rather than Learners Page 363

ফলতঃ ভারতবাসীরাই যে গ্রীশাদি ইউরোপ ভূমিতে যাইয়া গৃহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার সমর্থন জন্য পোকক আরও বলিতেছেন যে—

There were neklaces of gold and of amber; there were ear-rings whose Tendant drops imitated either the form or the brilliancy of the humaın eye; the hair was curled or braided, and covered with a veil; the robe was fastend over the bosom with golden clasps; a fringe surrounded the waist, and completed the full-dress costume of a lady of the Homeric age. Page-11.

হোমরের যুগে গ্রীশদেশবাসিনী রমণীরা গলায় স্বর্ণ বা স্ফটিকের হার পরিধান করিতেন; কর্ণে যে ইয়ারিং বা মাকড়ী ব্যবহার করিতেন উহার লম্বমান অংশের বিন্দুসমূহ মানবচক্ষুর উজ্জ্বলতাকে অনুকৃত করিত; কেশ সকল কুঞ্চিত বা কবরীবদ্ধ; এবং তাহা আবার অবগুণ্ঠনদ্বারা সমাচ্ছাদিত

থাকিত; এবং তাঁহাদিগের বহুমূল্য পরিচ্ছদ সকল বক্ষঃস্থলের নিকট স্বর্ণময় বন্ধনী বা ছেপটীপিনদ্বারা সংবদ্ধ থাকিত, কটিদেশের চতুর্দ্দিক ঝালর অর্থাৎ চন্দ্রহার দ্বারা বেষ্টিত হইত। পোকক সাহেব ইহার পর গ্রীশদেশের তদানীন্তন বিলাসিতার নানা কথা বলিয়া বলিয়াছেন যে—

Now, the whole of this state of society, civil and military, must strike every one as being eminently Asiatic; much of it specifically Indian. Page 12.

এখন যদি কেহ, গ্রীশদেশের এই সকল সাধারণ গার্হস্থ্য ও সামরিক বিভবের কথা চিন্তা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, এই সকল জাতীয় চিহ্ন নিশ্চয়ই এশিয়াটিক, এবং তন্মধ্যে ভারতীয় বলিয়াই অপেক্ষাকৃত সম্ভবপর। পোকক পরে বলিতেছেন যে—

I shall exhibit dynasties disappearing from western India, to appear again in Greece; clans, whose martial fame is still recorded in the faithful chronicles of North-western India, as the gallant bands who fought upon the plains of Troy; and in fact, the whole of Greece from the era of the supposed godships of Poseidon and Zeus, down to the close of the Trojan war, as being Indian in language, sentiment, and religion and in the arts of peace and war.

Page 12.

অর্থাৎ ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কতকগুলি বংশ গ্রীশে আসিয়া যে উপনিবিষ্ট হইয়া ছিল, তাহা আমি দেখাইব। ঐ সকল বংশের সমরনৈপুণ্যের সবিশেষ বৃত্তান্ত, তাঁহাদিগের প্রামাণ্য গ্রন্থাদিতে বিবৃত রহিয়াছে। ঐ সকল ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণই গ্রীশের হইয়া ট্রয়ের সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়াছিল, দেবযুগ হইতে ট্রোজান যুদ্ধ পর্য্যন্ত তাহারা ভাষায়, ভাবে, ধর্ম্মে, এবং শান্তি ও সংগ্রামে ঠিক ভারতীয় ভাবাপন্নই ছিল।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চল জনপদ হইতে কেহ কি নির্ব্বাসিত বা দেশান্তরিত হইয়াছিল? অবশ্যই হইয়াছিল। আমাদিগের মহাভারত ও পুরাণ সমূহে সগরকোপে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও দেশান্তরিত শক-যবন কম্বোজগণের কথা সবিস্তার বর্ণিত রহিয়াছে। এই রণদুর্ম্মদ তিনটি জাতিই অন্যান্য স্থানের ন্যায় গ্রীশ ও রোমে যাইয়া উপনিবিষ্ট হয়েন। পোকক ও স্থানান্তরে তাহা বিবৃত করিতে বিস্মৃত হয়েন নাই।

That the Ethiopeans were originally an Indian race, compelled to leave India for the impurity contracted for slaying a certain monarch, to whom they owed allegiance.

Page 205.

আফ্রিকায় ইথিওপিয়া দেশবাসী লোকেরা মূলতঃ ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান। তাহার

আপনাদিগের কোন সম্রাট্‌কে অতি অবৈধ উপায়ে হত্যা করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে বাধ্য হইয়াছিল।

এই নিহত সম্রাটই আমাদিগের ভূতপূর্ব্ব অযোধ্যাধিপতি মহারাজ বাহু। আমাদিগের পুরাণাদিতে লিখিত আছে যে, শকযবন-কম্বোজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ বাহুকে রাজ্যভ্রষ্ট করিলে তিনি সস্ত্রীক ঔর্ব্বমুনির আশ্রম সন্নিধানে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন ও রাজ্যনাশ ঘটিত মনস্তাপে অল্পদিনের মধ্যেই উপরত হয়েন। (বিষ্ণুপুরাণ—১৫। ১৬। ১৭। ১৮ ১৯। ২০। ২১— ৩অ—৪ অংশ দেখ।) এই বাহুতনয় মহারাজ সগরই শকযবনকম্বোজাদি ক্ষত্রিয়গণকে ধর্ম্মভ্রষ্ট, স্বাধ্যায়হীন ও নিকপবীত ম্লেচ্ছ বা শূদ্রে পরিণত করেন এবং এই লাঞ্ছনা-নিবন্ধনই উঁহারা অনেকে স্বদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি যবনগণের মস্তক মুণ্ডিত ও কচ্ছ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সগরশাসন অদ্যাপি যবনকুলে শাস্ত্রানুশাসনবৎ প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। সেই সগরসন্তাড়িত শকযবনকম্বোজগণ তুরুস্কে যাইয়া কিয়ৎকাল বসবাসের পর নানা দিকে ছড়াইয়া পড়েন। তন্মধ্যে আরবগত যবনেরা মুসলমান ধর্ম্ম পরিগ্রহ করেন, আর শকযবন কম্বোজগণের কেহ কেহ মিশর ও ইথিওপিয়া প্রভৃতি দেশে গমন করেন, কেহ কেহ ইউরোপে যাইয়া নানাজাতীয় বীজপুরুষরূপে দণ্ডায়মান হয়েন। তাই পোকক বহুস্থানে বহুবার বলিয়াছেন যে—

I must beg the reader to bear in mind the distinct assertion which I have already made, of the national unity of Egyptian, Greek, and Indian.

Page—122

তবে যে সকল ভারতসন্তান দ্বারা গ্রীশ ও ইটালী অধ্যুষিত হইয়াছিল তাঁহারা তুরুস্ক হইতে ইজিপ্টে যাইয়া তথা হইতে গ্রীশ ও ইটালীতে গমন করিয়াছিলেন। কেননা গ্রীক ও রোমকগণ অর্থাৎ হেলেনিক জাতির প্রধানেরা তাহাই বলিয়া থাকেন, পোককও সেইরূপ কথা বলিয়াছেন –

This fact distinctly recognised, and surveyed without prejudice, even so far as to accept Hellenic authorities, when speaking of the colonisation from Egypt and Phœnicia. Page—122.

আরবগণও আবিসিনিয়ানগণকে কুশের সন্তান বলিয়া থাকেন (২৫১ পৃ)

বলিতে পার যে, ইজিপ্ট বা ইথিওপিয়াতে যে ভারতসন্তানেরা গিয়াছেন তাহার প্রমাণ কি? মিশরগণ কি তাহা স্বীকার করিয়া থাকেন? পোকক বলিয়াছেন যে, মিশরে Heliopolis নামে একটি নগর আছে, আর মিশরের সূর্য্যবংশীয় প্রথম রাজার নাম Menes। ইহা হইতেই জানা যায় যে উঁহারা মহারাজ বৈবস্বত মনুর বংশীয় ছিলেন—

The reader will not readily forget the renowned "City of the Sun," "Heliopolis;" nor Menes, the first Egyptian King of the race of the Sun, the Menu Vaiviswata, or patriarch of the Solar race; nor

his statue, that of the "great Menoo," whose voice was said to salute the rising sun.

Page—178.

পাঠক তোমরা কখনই মিশরের বিখ্যাত সূর্য্যনগর হেলিওপোলিস, মিশরের সূর্য্যবংশীয় প্রথম রাজা মেনেশ, সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ বৈবস্বত মনু, অথবা মিশরে যে মহামনুর প্রতিমূর্ত্তি আছে, যিনি উদীয়মান সূর্য্যের উপাসক ছিলেন, ইঁহাদের কথা ভুলিয়া যাইও না। ইহাদ্বারা কি পাওয়া গেল? ইহাই পাওয়া গেল যে মিশরের মেনেশ প্রভৃতি রাজারা আপনাদিগকে ভারতের সূর্য্যবংশের আদিপুরুষ বৈবস্বত মনুর বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন, মনুর প্রতিমূর্ত্তি ও সূর্য্যনগরের প্রতিষ্ঠাও তাঁহাদিগের সূর্য্যবংশসম্ভবত্বের প্রমাণান্তর। কেবল ইহাই নহে, মিশরের মিশ্রনাম ও নীলনদ প্রভৃতির নামও সম্পূর্ণ সংস্কৃতমূলক, মিশরের পিরামিড (Pyramid) কথাটীও আমাদের "পুরীমঠ" কথার অপভ্রংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মিশরের একজন রাজার নাম Rameses ও একটি আরাধ্য দেবতার নামও Asiris, এই সকল শব্দও হিন্দুগন্ধী বলিয়া মনে হয়। Asiris কথাটির নিদান ঈশ্বরস্ (শিব) বা অসুরেশ হওয়া বিচিত্র নহে। যাহাহউক যদি গ্রীকগণ ইজিপ্ট হইতেই গ্রীশে যাইয়া থাকেন তাহা হইলে তাহারাও মিশরগণের ন্যায় ভূতপূর্ব্ব ভারতসন্তান, তাহাতে কি সন্দেহ থাকিতে পারে? গ্রীশবাসিগণ বলিয়া থাকেন যে তাঁহারা Heaven বা Uranas ও Gaia বা Earthএর পুত্র—

Because all Greek divinities were the offspring of Heaven (Uranas) and the Earth (Goia).

এই আর্য বা গইয়াই আমাদের ভারতবর্ষ। পৃথুর রাজ্য বলিয়া ইহার নাম পৃথ্বী বা পৃথিবী; উহার বিকারেই Earth শব্দ ব্যুৎপাদিত। মহারাজ পৃথু গোরূপধারিণী এই পৃথিবী বা ভারতবর্ষকে দোহন করিয়া শস্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই ইহার নামান্তর গো।

তস্যা মনুর্বৈবস্বতো
বৎস আসাৎ পৃথিবী পাত্রং।
তাং পৃথী বৈন্যোঽধোক্
তাং কৃষিং চ সস্যং চা ধোক্॥
অথর্ববেদ ১১-১৩স্থ ৫ম ৮ম কাণ্ড।

উক্ত গো শব্দই Goia বলিয়া কথিত হইয়াছে। অবশ্য মহামতি পোকক গ্রীশের Goiaকে আমাদের গয়ার সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা প্রকৃত কথা নহে। যবনেরা ভারত পরিত্যাগ করিয়া পারস্যে গমন করেন, উক্ত পারস্য দেশ বরুণের রাজ্য ছিল, উহা অন্তরিক্ষের এক দেশ, সুতরাং স্বর্গ বা Heavens বটে। পূর্ব্বে ভারতবর্ষও দেবলোক বা স্বর্গ বলিয়া কথিত হইত। সুতরাং গ্রীক যবনেরা যে আপনাদিগকে Heaven ও Goiaর পুত্র বা পূর্ব্বাধিবাসী বলিবেন ইহা ঠিকই। মিলটনের একটি কবিতায় বিবৃত আছে যে—

The Ionian gods of Javan's issue held gods. Yet confessed later that Heaven and Earth their boasted parents. Book 1st Page 48.

প্রশ্ন হইতে পারে যে গ্রীশের মানুষদিগের সহিত গ্রীক দেবতাদিগের কি সম্পর্ক রহি-

য়াছে? কিন্তু আমাদের ইন্দ্রাদি দেবতাদিগের ন্যায় গ্রীক দেবতাগণও মানুষ ছিলেন ও তাঁহারা পূর্ব্বপুরুষও বটেন। আমরা ভারতবাসীরা যেমন দেবসন্তান দেবতা, গ্রীকেরাও তদ্রূপ দেবসন্তান দেবতা ছিলেন। পূর্ব্বে আমরা সকলেই দেবতা ছিলাম, এখনও ব্রাহ্মণেরা দেবতা বলিয়া বিশেষিত হইয়া থাকেন। পোকক ও বলিয়া গিয়াছেন যে—

The Devas are Brahmins, for such is the ordinary acceptation of the title.

Page—162.

---

## অনন্ত মিলন।

ধীরে তার বাহুবন্ধ খুলিনু সভয়ে,—
চাহিনু নিমেষহীন নিমীল-নয়নে;
ঘুমাল কি জীবনের শেষ কথা ক'য়ে?
আর জাগিবে না বুঝি, বাসর শয়নে
জীবনের শেষ নিশি করিল যাপন;
ছাড়াছাড়ি হবে তাই এত আয়োজন।
মৃত্যু নিয়ে যেতে চায়, দুয়ারে দাঁড়ায়ে!
প্রহর বাজিয়া গেল, মিলনের ক্ষণ
করি দীর্ঘতর বুঝি পড়িল ঘুমায়ে,
সে মিলনে আর বুঝি নাহি জাগরণ!
ঘুমাও—ঘুমাও প্রিয়ে, আমি রব জাগি';
মুদিত নয়নে থাক্ মিলন-স্বপন!
মরণ ফিরিয়া যাক্, থাক্ তোমা লাগি'
অপ্রভাত নিশি আর অনন্ত মিলন।

# ইউরোপে অধ্যাত্মবিজ্ঞান।

ক্ষুধা তৃষ্ণা যেমন মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, জিজ্ঞাসাও সেইরূপ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ক্ষুধা তৃষ্ণার তৃপ্তিতে স্থুলশরীরের পুষ্টিসাধন বুবুৎসার তৃপ্তিতে মানসশরীরের পুষ্টিসাধন হয়। বুভুক্ষার জ্বালায় একজন আর একজনের মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাইতেছে, বুবুৎসার তাড়নায় অস্থির হইয়া মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল ঘর সকল কোণ উলটপালট করিয়া দেখিতে চাহিতেছে। যখন রোগ হয় তখন এমন যে তুর্নিবার ক্ষুধা কোথায় চলিয়া যায়, সেইরূপ মানস ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষের নিকট কোন একটা সামান্য কথা বুঝিবার চেষ্টাও অতিশয় কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। যে জাতি বা ব্যক্তির মধ্যে এরূপ ঘটনা হয়, চিকিৎসা না হইলে তাহার মৃত্যু সন্নিকট বলিয়া বুঝিতে হয়। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের উপায় এবং উপকরণ সকলের পক্ষে এক নহে, সেইরূপ বুবুৎসা নিবৃত্তির উপায় ও উপকরণ সমাজবিশেষে বা ব্যক্তিবিশেষে একটু ভিন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু যে উপায়ে জ্ঞানের উপকরণ সংগৃহীত হইলে সমাজের জ্ঞানময় দেহটা সবল ও সুপুষ্ট হইয়া উঠে, তাহাকেই আমরা প্রকৃষ্ট উপায় বলিব।

য়ুরোপের জ্ঞানোন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে জ্ঞানালোচনার পদ্ধতিতে একটা মহাপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে অমানুষ প্রতিভাসম্পন্ন মনীষিগণ, গণিত দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত অত্যদ্ভুত তত্ত্বসমূহের আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা চিরকালই জ্ঞানরাজ্যের আশ্রয়স্তম্ভস্বরূপ থাকিবে। তথাপি বলিতে হইবে বিজ্ঞান নামে যে নূতন পন্থার আবিষ্কার হইয়াছে তাহা তাঁহাদের সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। ফ্রান্সিস বেকন ( Francis Bacon ) নামে কোন দার্শনিক ( ইংলণ্ডবাসী ) পদার্থ তত্ত্বনির্ণয়ের এমন একটি সুন্দর নূতন পথের আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা অবলম্বনে চলিতে আরম্ভ করিয়া পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিতগণ, গত দুই শতাব্দীর মধ্যে জ্ঞানরাজ্যে ( বিশেষতঃ পদার্থতত্ত্ব সম্বন্ধে ) যে পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছেন, সভ্যতার ইতিহাসে তাহার তুলনা আছে কি না সন্দেহ। বেকন নিজে কোন তত্ত্বের আবিষ্কার করেন নাই, অথবা তাহার অনুসন্ধান' করেন নাই। কোন্ উপায়ে তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে হয়, কোন্ পথে তাহার অনুসন্ধান করিতে হয়, কেবল এই কথা জগতকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সেই পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়া নিউটন (Newton), গ্যালিলিও (Galileo), ডেকার্টে ( Descartes ), কেপ্লার (Keplar), ফ্যারাডে (Faraday), Maxwell ( ম্যাকস-ওয়েল ) হেলম্‌হোলটজ ( Helmholtz ) কেলভিন ( Kelvin ) নূতন তত্ত্বালোকে জগত আলোকিত করিয়াছেন। সে পথ কি ? এবং তাহার বিশেষত্ব কোথায় ? পূর্ব্বে

বলিয়াছি যে বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে জিজ্ঞাসা একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি. সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রতিভাসম্পন্ন লোক কোন কার্য্য দেখিলে তাহার কারণ এবং তাহার ফলানুসন্ধানে ব্যস্ত হন, অনুমানের সাহায্যে কারণ ও ফলের স্থির হয়, অনেকগুলি দৃষ্ট বিষয়ের সাহায্যে অনুমানের সোপান গঠিত হয়। অনুমানের সোপানগুলি যতই কেন সুসংবদ্ধ হউক না কেন, দৃষ্ট বিষয়ে যদি কোন দোষ থাকে, অনুমান দুষ্ট হইবেই হইবে। বেকন দেখাইয়াছিলেন য়ুরোপ দেশে পূর্ব্বাচার্য্যেরা অনুমানের মূলভিত্তিকে নির্দ্দোষ করিবার চেষ্টা না করিয়া এক একটা সিদ্ধান্ত স্থির করিতেন। কোন অসামান্য লোক কোন একটা সিদ্ধান্ত স্থির করিলে সাধারণ লোক তাহার অনুসরণ করিতেন. এইভাবে এক একটা সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইত, সম্প্রদায়ভুক্ত লোক তাঁহাদের মতের প্রাধান্য ঘোষণা করিবার জন্য তর্কাস্ত্রে সুসজ্জীভূত থাকিতেন। সত্যনির্ণয় মূল লক্ষ্য না হইয়া মতবাদ ঘোষণায় জয় লাভ করা একমাত্র লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মহামতি বেকন বুঝাইয়া দিলেন যে অনুমানকে নির্দ্দোষ করিবার জন্য অনুমানের মূলভিত্তি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয়ের জ্ঞান যাহাতে সুবিশুদ্ধ এবং সুপরিপক্ক হয়, আদৌ তাহার চেষ্টা করিতে হইবে, মনে রাখিতে হইবে যদি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট বিষয় অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত থাকে তবে তাহার আশ্রয়ে সিদ্ধান্ত লাভের জন্য যে অনুমান ও বিচার করা হইবে তাহা সমস্তই নিরর্থক। তাহার পর অপাটবাদি দোষশূন্য প্রত্যক্ষের অবলম্বনে অনুমান করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পর পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষদৃষ্ট বিষয়ের সাহায্যে সেই সিদ্ধান্তের পরীক্ষা করিতে হইবে। এই পরীক্ষায় যে সিদ্ধান্ত স্থির থাকিবে তাহাকে সত্য সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বেকনের প্রদর্শিত এই পন্থার নাম "বিজ্ঞান।"

বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য এই যে, যাহা সত্য তত্ত্ব তাহা চিরকাল পড়িয়া রহিয়াছে, তুমি বুদ্ধি বিচার প্রয়োগ করিয়া তাহা দেখিবে, বুঝিবে, এবং আত্মাকে কৃতার্থ করিবে, তোমার বিচারের অনুবোধে সত্যতত্ত্বের অন্যথা হইবে না। সুতরাং সত্যতত্ত্বনির্ণয়ে প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা কি তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অথবা যদি বল কারণ নির্ণয়ই জ্ঞানের লক্ষ্য তাহা হইলেও ভাবিয়া দেখ, একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপারের কারণরূপে গণ্য হয়, যখন প্রথম ব্যাপার না ঘটিলে দ্বিতীয় ব্যাপারের সম্ভাবনা হয় না এবং দ্বিতীয় ব্যাপার ঘটিবার পূর্ব্ববর্ত্তিরূপে যখন প্রথম ব্যাপারকে নিয়ত দেখা যায়। যেমন বৃষ্টির পূর্ব্বে মেঘ থাকিবেই থাকিবে এবং মেঘ না থাকিলে বৃষ্টি থাকে না তখন মেঘকে বৃষ্টির কারণ বলা যায়। যদি কার্য্য কারণের সম্বন্ধ এইরূপেই বুঝিতে হয়, তাহা হইলে মেঘ ও বৃষ্টির সম্বন্ধে খবর না রাখিয়া, তাহাদের মধ্যে কার্য্য কারণ সম্বন্ধ কল্পনা করা যায় কিরূপে? তাহ বলিতেছি প্রকৃতির ঘটনাপরম্পরা লক্ষ্য করা বিজ্ঞানের প্রথম কার্য্য। আমার বুঝিবার ইচ্ছা হইল, দিন রাত্রির কাল পরিমাণের তারতম্য ঘটে কেন? এই কথাটি বুঝিবার জন্য আমাকে প্রতিদিন সূর্য্যের সংস্থানের তারতম্য লক্ষ্য করিতে হইবে, তবে একটা সিদ্ধান্তে আসিবার পথ দেখিতে পাইব। প্রকৃত ঘটনা লক্ষ্য না করিয়া, যদি কেবল অনুমানের বলে

একটা কিছু স্থির করিবার চেষ্টা করি তাহাতে "মতবাদের" সৃষ্টি হইতে পারে বটে, কিন্তু সত্য তত্ত্বের জ্ঞান হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। প্রাচীন পণ্ডিতেরা ঘটনাপরম্পরার প্রতি লক্ষ্য করার প্রয়োজনীয়তা তেমন বুঝেন নাই, তাই (Francis Bacon) ফ্রান্সিস বেকনের উপদেশের পর হইতে য়ুরোপের পণ্ডিত সমাজে একটা যুগ পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।

প্রাচীনকালের পণ্ডিতেরা কোন সামান্য ঘটনা লক্ষ্য করিয়া ভৌতিক পদার্থ পরমাণু দ্বারা গঠিত এইরূপ একটা সিদ্ধান্ত করেন। যত দিন পর্য্যন্ত লোকে পদার্থের ক্রিয়া গুণ ও ধর্মের প্রতি লক্ষ্য করিতে না শিখিয়াছিল তত দিন পর্য্যন্ত এই 'পরমাণু বাদ' একটা কথার কথা ছিল মাত্র। যেমন লোকে পদার্থের ক্রিয়া গুণের তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল, অমনি "পরমাণুগুলি কিরূপ? মৌলিক পদার্থের পরমাণু ও মিশ্র-পদার্থের ত্র সরেণুর পার্থক্য কি? পরমাণুর আকার কি? তাহাদের পরস্পরের দূরত্ব কিরূপ? তাহারা কি ভাবে ভিন্ন পদার্থে সংস্থিত? তাহারা কি নিয়মে পারবার সংগঠন করে? তাহারা একক কি ক্ষুদ্রতর কণার সংঘাতজাত? কঠিন তরলপদার্থবিশেষে তাহাদের সংস্থিতি ও গতির পার্থক্য কি? ইত্যাদি সহস্র সহস্র ঘটনা বুঝিবার প্রয়োজন হইল। পদার্থ ও ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনুসন্ধান করিতে করিতে ক্রমশঃ সকল বিষয়েই তত্ত্বরাশি স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। এই ভাবে ঘটনার প্রতি নিরবচ্ছিন্ন স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া, তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্য অবিচলিত ভাবে অনুসরণ করিয়া—এক একটি কারণের পরিবর্ত্তনে এক একটি কার্য্যের পরিবর্ত্তন কি ভাবে সাধিত হইতেছে তাহা সূক্ষ্মরূপে পর্য্যবেক্ষণ (observation) এবং পরীক্ষা (Experiment) দ্বারা স্থির করিয়া তাহার বিবরণ রীতিমত প্রণালীক্রমে লিপিবদ্ধ করা বিজ্ঞানের প্রথম সোপান। কোন একটা বিষয়কে বিজ্ঞানের পথে আনিবার জন্য হয় ত কত দেশে কত জ্ঞানীগণ যাবজ্জীবন দিনরাত্রি সাধনার ফলে এই প্রথম সোপানের গঠন করিতেছেন। এবং এই প্রথম সোপান গঠিত হইলে তাহাতে অন্তর্নিবিষ্ট লিপিবদ্ধ ঘটনা পরম্পরা বিচারের দ্বারা তাহাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করা, বিজ্ঞানের দ্বিতীয় সোপান। হয় ত এক যুগ ধরিয়া নিরন্তর পরিশ্রমের ফলে প্রথম সোপান গঠিত হইয়াছে এবং যত দিন তাহার শেষ না হইয়াছে তত দিন দ্বিতীয় সোপানের কেহ কল্পনাও করেন নাই। তাহার পর যখন সম্বন্ধ স্থির হয়—তখন সেই সম্বন্ধ কল্পনা সত্য কি না অথবা তাহাতে কোন দোষ আছে কি না নির্ণয় করিবার জন্য পুনঃপুনঃ অনুসন্ধান এবং ঘটনাবলীর পরীক্ষা করিতে হয়। এই সকল পরীক্ষায় যখন কোন সিদ্ধান্ত উত্তীর্ণ হইতে পারে, তখন তাহাকে স্বীকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ইহার নাম বিজ্ঞানের তৃতীয় সোপান।

সৌরজগতের তত্ত্ব নির্ণয় করিতে গিয়া ঘটনা পরম্পরার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন কেপ্লার। দিনের পর দিন মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া, সৌরপরিবার ভুক্ত গ্রহাদির সংস্থান ও গতি সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য এবং পরি-মাপযোগ্য—তাহা অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের ফলে—সংগ্রহ করিয়া কেপ্লার জ্যোতিসিদ্ধান্ত-

বিজ্ঞানের প্রথম সোপান গঠন করিয়াছিলেন। মহামতি নিউটন এই সংগৃহীত ফলরাশি আলোড়ন ও মন্থন করিয়া—যে অপূর্ব সম্বন্ধ নির্ণয় করেন তাহাই জ্যোতির্বিজ্ঞানের দ্বিতীয় সোপান। তাহার পর সেই সম্বন্ধের সত্যতা নির্ণয় জন্য (Newton) নিউটন নিজে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী জ্যোতিষিকগণ গ্রহরাজির স্থিতি ও গতি সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া তাহাকে অভ্যাভিচারী বলিয়া বুঝিয়াছেন। তখন নিউটন-নির্ণীত সিদ্ধান্ত সত্য সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে। তাহার পর যখন ইংলণ্ডে (Adams) (আদামস) এবং অন্যত্র Leverier) লেভেরিয়ার—সেই সম্বন্ধের যোজনা করিয়া—অনন্ত আকাশের কোলে মানুষের অদৃষ্ট অজ্ঞাত এবং অচিন্তিত এক নূতন গ্রহের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া ঘোষণা করিলেন তখন পৃথিবীর লোক স্তম্ভিত হইল। যে মানুষ নিজের ঘরের কোণে কোথায় কি ঘটনা ঘটিতেছে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না—সেই মানুষ যে সিদ্ধান্তের বলে, আকাশের দূরতম প্রদেশে-তৎকালীন সমস্ত দূরবীক্ষণের অগোচর —যে একটি গ্রহের অস্তিত্ব স্থির করিতে পারে শুধু গ্রহ নয়, গ্রহের গতি, আকার এবং গুরুত্ব সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞাতব্য তত্ত্বই স্থির করিতে পারে, সে সিদ্ধান্তের বল কি তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই ভাবে সত্য নির্ণয় করিবার যে নিয়ম তাহাকেই বিজ্ঞান বলে। সত্য বটে এই ভাবে নির্ণীত সিদ্ধান্ত নূতন ঘটনাবিশেষের আবিষ্কারের দ্বারা একটু পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এবং হইয়া থাকে। কিন্তু যেমন নবাবিষ্কৃত ঘটনাবিশেষ পূর্ব্বজ্ঞাত ঘটনাসমূহের সহিত অসমঞ্জস হয় না সেইরূপ পূর্ব্বসিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তিতাকার পূর্ব্বসিদ্ধান্তকে নষ্ট করে না। পুষ্প হইতে ফলের উৎপত্তি হইলে পুষ্পের এক ভাবে অন্যথা হয় বটে, কিন্তু পুষ্প চিরকালই ফলের কারণস্বরূপ বর্ত্তমান থাকে—এই ভাবে যে অন্যথাপত্তি তাহার নাম বিকাশ বা উন্নতি। সেইরূপ বিজ্ঞানের নূতন সিদ্ধান্ত পুরাতনের একটা অবস্থা পরিবর্ত্তন মাত্র, পুরাতন নূতনের ভিত্তিস্বরূপে দণ্ডায়মান। যেখানে এইরূপ ক্রমোন্নতি বা বিকাশ দেখা যায় না, তাহাকে মৃত বলিয়া মনে করিলে কোন দোষ হয় না। বিজ্ঞান বলিলে কোন বিষয়বিশেষ অথবা সিদ্ধান্তবিশেষ বুঝিতে হইবে না—যে কোন বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত রীতিতে সিদ্ধান্ত লাভের চেষ্টাকেই বিজ্ঞান বলা যায়। সুতরাং জ্ঞান লাভের ঐ বিশেষ পন্থার নাম "বিজ্ঞান"। যখন যে কোন বিষয়ে ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়া সিদ্ধান্ত স্থির করা যায়, তখন সেই বিষয়কে বিজ্ঞানশ্রেণীভুক্ত করা যায়। এই ভাবে প্রাকৃতিক তত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব এবং জীবতত্ত্বকে বিজ্ঞানশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে, বর্ত্তমান সভ্যজগতে সর্ব্ববিষয়েই এই পন্থার প্রয়োগ করিবার চেষ্টা হইতেছে, যে যে স্থানে এই চেষ্টা সফল হয় নাই, সেই সেই বিষয়ে এখনও বিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া হয় নাই। যেমন ইতিহাস সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি। যখন এই সকল বিষয়ে ঐ পন্থার সম্যক্ প্রয়োগ হইবে, তখনই উহাদিগকে বিজ্ঞানশ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

বিজ্ঞান শব্দটিকে এত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিবার কারণ, এই প্রবন্ধে আমার আলোচ্য বিষয় "অধ্যাত্ম বিজ্ঞান" অর্থাৎ য়ুরোপে অধ্যাত্ম বিষয় আলোচনা করিবার জন্য যেরূপ ভাবে বিজ্ঞান পদ্ধতির প্রয়োগ আরম্ভ

হইয়াছে তাহার বিবরণ। অধ্যাত্মবিষয় আলোচনার জন্য এখন য়ুরোপে কেবল মাত্র বিজ্ঞানের প্রথম সোপান গঠিত হইতেছে মাত্র, কত কালে যে এই প্রথম সোপান গঠন শেষ হইবে তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে বিষয়ের গুরুত্ব চিন্তা করিয়া মনে হয় যাহা বিংশ শতাব্দীর আগমনের পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে তাহা বোধ হয় বিংশ শতাব্দীর শেষের পূর্ব্বে একটা পরিপুষ্টাকার ধারণ করিবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য অধ্যাত্ম বিষয় কি? জিজ্ঞাসা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ প্রবৃত্তি হইলেও প্রয়োজন বোধ তাহার প্রবর্ত্তক কারণ। পৃথিবী মানুষের বাসভূমি, সেই পৃথিবীর পরিচয় লওয়া, সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বকালের পৃথিবীর পরিচয় লওয়া, মানুষের আত্মরক্ষার জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে বিষয়ের সহিত মানুষের সম্পর্ক হয়, অথবা সম্পর্কের সম্ভাবনা হয়, তাহা হইতে মানুষের বিপদের সম্ভাবনা আছে কি না অথবা তাহা-দ্বারা মানুষের আত্মোন্নতি হইতে পারে কি না ইহা জানা মানুষের আত্মরক্ষার জন্য অথবা আত্মোন্নতির জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু তদপেক্ষা আরও একটা অধিকতর প্রয়োজনীয় বিষয় আছে, তাহা মানুষের নিজের পরিচয়। যদি মানুষ নিজের কোন পরিচয় না জানে, তবে তাহার রক্ষা ও উন্নতির চেষ্টার কি কোন অর্থ থাকে? সার্থক হউক, নিরর্থক হউক, য়ুরোপে জ্ঞানীসম্প্রদায় এত দিন কিন্তু এইভাবে নিজের পরিচয়সম্বন্ধে উদাসীনহইয়া জ্ঞানালোচনা করিয়া আসিতেছিলেন, অন্য যত বিষয় হউক না কেন জানিবার জন্য তাঁহাদের কত উৎসাহ দেখা যায়, কিন্তু নিজের পরিচয় সম্বন্ধে অতি সামান্য "মতবাদের" বিতণ্ডার অধিক অগ্রসর হন নাই।

"আমি কি? রক্তমাংসনির্ম্মিত কতকগুলি যন্ত্রসমষ্টি? অথবা যন্ত্রাধিষ্ঠিত কতকগুলি শক্তিমাত্র—যন্ত্রসংঘাতে উৎপন্ন, যন্ত্রনাশে নাশশীল কতকগুলি শক্তিমাত্র? অথবা এই সকল যন্ত্র হইতে স্বাধীন, স্বতন্ত্রভাবে ক্রিয়মান ও জ্ঞায়মান কোন শক্তি এই যন্ত্রাশ্রয়ে কোন কোন কার্য্য সাধন করিয়া থাকে এবং যন্ত্রনাশের পর স্বাধীনভাবে নিজের পরিচয় দিয়া থাকে?" এই সকল বিষয়ের তত্ত্ববার্ত্তা মানুষের নিজের পরিচয়—ইহাই আমার উদ্দিষ্ট "অধ্যাত্ম বিদ্যা"। অধ্যাত্ম বিদ্যাবিষয়ক কোন কথাই যে মানুষের মনে উঠে নাই তাহা নহে, অধ্যাত্মবিদ্যা যখন মানুষের নিজের পরিচয় তখন ইহাকে উপেক্ষা করা সহজ নহে, প্রকৃত পক্ষে ইহা এতই প্রয়োজনীয় যে ইহার সম্বন্ধে মানুষ একটা কিছু ধরিয়া না লইয়া থাকিতে পারে নাই। যেটা ধরিয়া লইয়াছিল, সেইটি মানিতে আরম্ভ করে—ধরিয়া লওয়া, মানিয়া লওয়া, বিশ্বাস করা ছাড়া এই সকল বিষয়ের অন্য প্রমাণ আছে, এ ধারণা নষ্ট হইয়া যায়। যখন একদিকে বিশ্বাসের এত প্রাধান্য হইয়া দাঁড়াইল, তখন আর এক পক্ষ লোক সাধারণ ধারণার বিরুদ্ধে তাঁহাদের মতবাদের প্রচার করিলেন, তাঁহাদের শিষ্য সম্প্রদায় তাঁহাদের কথায় বিশ্বাস করিয়া সেই মতবাদের পোষণ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে অতি প্রাচীন কাল হইতে য়ুরোপে অধ্যাত্ম বিদ্যা সম্বন্ধে আস্তিক ও নাস্তিক দুই দল বর্ত্তমান আছে। একদল দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব বিশ্বাস করেন, আর একদল আত্মা বলিয়া যাহা বোধ হয় তাহাকে দেহের ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন, দেহ নাশের সহিত উহার নাশ হয় মানিয়া থাকেন।

এইরূপ বিরুদ্ধ মত পোষণকারী দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে, স্বমত-স্থাপন এবং পরমত নিরসনের একটা বাক্যুদ্ধ চিরকাল চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু কোন পক্ষই প্রকৃত ঘটনা কি তাহার অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে প্রস্তুত হন নাই। যদি দেহাতিরিক্ত কোন আত্মা থাকে এবং দেহনাশের পর তাহার অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলে ঘটনার দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ঘটনার অনুসন্ধান না করিয়া কেবল কথার ছটায় যাহা সত্য তাহা মিথ্যা হয় না, এবং যাহা মিথ্যা তাহা সত্য হয় না। তাই ঘটনার অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ করিয়া যদি দেহের আশ্রয়ে দেহাতীত কোন আত্মা থাকে তবে তাহার কার্য্য দেখা যাইবে। "আর যদি দেহনাশের পর আত্মা থাকে তাহা হইলে, জগৎ কার্য্যের মধ্যে তাহাদের একটা অভিনয় ক্ষেত্র থাকিল, সুতরাং জগৎকার্য্যের বিশ্লেষণের দ্বারা তাহা ধরা পড়িবে।" এইরূপ ভাবিয়া পূর্ব্বোক্ত দুই পক্ষের মধ্যে এক পক্ষও কোন রূপ সত্যতত্ত্বানুসন্ধান কার্য্যে অগ্রসর হন নাই। অনুসন্ধান কার্য্যে নিজেরা অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, যখন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সত্যানুসন্ধিৎসু কয়েকজন মনীষি এই কার্য্যে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ত্রুটী করেন নাই। আস্তিক পক্ষ বলিতে লাগিলেন, যাহা বিশ্বাসের কথা তাহাতে বিচার চলিবে না, যাহা অতিমানুষ-তত্ত্ব তাহাতে মানুষের অনুসন্ধানে কোন ফল ফলিবে না।' পরীক্ষার দ্বারা আত্মা বা পরকাল সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ হয় না। এই সকল কথায় যাঁহারা "অধ্যাত্ম বিদ্যা"-বিজ্ঞানের ভিত্তিতে স্থাপন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাঁহারা বিচলিত হন নাই। কারণ বিজ্ঞানেতিহাসের যুগে যুগে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। এমন দিনও ছিল যখন য়ুরোপের সভ্যতার ও জ্ঞানের জনকস্থানীয় একজন, গগনস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির তত্ত্বানুসন্ধানকে মানুষের ধৃষ্টতা বলিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক-গণ—মুখ্যতঃ নাস্তিক পক্ষ—কোন প্রমাণহীন কথা মানিতে চান না, তাঁহারা যেন মনে করিয়াছিলেন যে আস্তিকগণ তাঁহাদের বিশ্বাসের প্রমাণ সংগ্রহ করিতে বাধ্য, তাঁহারা যে প্রমাণ সংগ্রহ করিবেন, বৈজ্ঞানিক নাস্তিক সম্প্রদায় কেবল তাহার সমালোচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন। যাঁহারা জগতের তত্ত্বা-লোচনা করিতে করিতে কেবল অসীম সত্যানু-সন্ধিৎসাতে পূর্ণ হইয়াছেন, যাঁহারা নিজ দেহের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, কেবল সত্য আবিষ্কারের আশায় ভূগর্ভের অন্ধতম প্রদেশে জীবনাতিবাহিত করিতেছেন, অথবা মেরু প্রদেশের মহা শীতে জীবনপাত করিতেছেন—তাঁহারা যদিও সমালোচকভাবে অধ্যাত্ম তত্ত্বা-লোচনায় কিছু উপেক্ষা করিয়াছিলেন; যখন জানিলেন যে ইহা মানবের সর্ব্ব জ্ঞাতব্য-তত্ত্বের সার, যখন বুঝিলেন যে অধ্যাত্মতত্ত্বের আলো-চনা উপেক্ষা করিয়া তাঁহারা জ্ঞানরাজ্যের যে ক্ষতি করিয়াছেন তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে; তখনই তাঁহাদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় কেহ কেহ এইরূপ অজ্ঞানের পক্ষপাতিত্ব-রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানু-য়ারি তারিখে লণ্ডন নগরে (Professor Barrett) প্রফেসার ব্যারেট—এক সভা আহ্বান করেন এবং সেই সভায় তাঁহাদের

সত্যানুসন্ধান সম্বন্ধে এই মহাক্রটির উল্লেখ করেন। বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকের হৃদয়ে একথাটি আঘাত করে, তাই অনতিবিলম্বে এক সভা গঠিত হইয়া বৈজ্ঞানিক প্রথায় অধ্যাত্ম তত্ত্বানুশীলনের চেষ্টা আরম্ভ হইল। ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ সভার স্থাপন হয়। প্রথম প্রথম কোন কোন বৈজ্ঞানিক যোগ দেন নাই, কিন্তু আজকাল সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে য়ূরোপ এবং আমেরিকার অনেক পরিচিত বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক ইহাতে যোগ দিয়াছেন। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক বিষয় সম্বন্ধে বিষয়বিশেষে এক এক শ্রেণীর লোকের উৎসাহ দেখা যায়, কিন্তু এই অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সভায় সকল শ্রেণীর দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক যোগ দিয়াছেন। মনে হয় যেন অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর জ্ঞানালোচনায় যাহা উপেক্ষিত হইয়াছে, বিংশ শতাব্দীতে তাহার জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিবে। এই সভার নাম (Psychical Research Society) অধ্যাত্ম বিজ্ঞান-সমিতি।

এই সভা নিম্নলিখিত বিষয়গুলিকে আলোচ্য স্থির করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন।

১। শারীর চেষ্টাদ্বারা এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে নিজের মনোভাব জ্ঞাপন করিতে পারে। শারীর চেষ্টা লক্ষ্য করিয়া এবং শারীর যন্ত্রের সাহায্যে একজন অন্যের মনের ভাব ধরিতে পারে ইহা সাধারণ নিয়ম। কোনরূপ শারীর চেষ্টা না করিয়া এবং উহার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া একজনের মনের ভাব অন্যব্যক্তি জানিতে পারে কি না, ইহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে হইবে। বাহ্যযন্ত্র এবং কার্য্যনিরপেক্ষ হইয়া, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একজনের মনের ভাব অন্যের মনে উদিত হওয়ার নাম (telepathy) ভাবসংক্রমণ অথবা চিত্তসংক্রমণ। যদি মনের এইরূপ কোন স্বাভাবিক শক্তি থাকে, তাহা হইলে যাহার মনে এই শক্তি বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, সে দূরদেশ হইতে অন্যের মনের ভাব বুঝিতে পারে। বিশেষ সাবধানে পরীক্ষা করিয়া এই ব্যাপার কতটা সত্য তাহা বুঝিবার চেষ্টা করা, সভার প্রথম লক্ষ্য স্থির হয়।

২। সেই সময় য়ুরোপে একজন মানুষ অন্য মানুষকে কোনরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা অবশ ও মুগ্ধ করিয়া তাহার দেহের দ্বারা নানারূপ কার্য্য করাইতেন। ইহার নাম (Hypnotism) সম্মোহন। এই ব্যাপারের তথ্যনিরূপণ, সভার দ্বিতীয় লক্ষ্য স্থির হয়।

৩। মানুষের মনে এমন শক্তি আছে কি না যাহার বলে মানুষ অতীত ও অনাগত প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পায়, এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধানও সভার আর একটি লক্ষ্য থাকে।

৪। মানুষ মরিবার পর তাহার অস্তিত্বের কোন পরিচয় দিতে পারে কি না? এবং মৃত মানুষের সহিত দেহধারী মানুষের কোন সম্বন্ধ ঘটিতে পারে কি না এবং সে সম্বন্ধই বা কিরূপ? এ সকল বিষয়ের অনুসন্ধানও সভার লক্ষ্য ছিল।

এইরূপ কতকগুলি লক্ষ্য লইয়া সভার কার্য্যারম্ভ হয়। ক্রমে ক্রমে য়ুরোপের খ্যাতনামা অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক ইহাতে যোগ দেন। সেই দিন হইতে সভা ধীর কিন্তু সুনিশ্চিত পদক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন। সভার গুরুত্ব আজ কাল কিরূপ হইয়া দাঁড়াই-

য়াছে তাহা নিম্নলিখিত কথাটি চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে। ইংলণ্ডে সমস্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইবার পূর্ব্বে একটি সভার অনুমোদন ও স্বীকার প্রয়োজন হয়। সেই সভার নাম Royal society ; কোন বৈজ্ঞানিক এই সভার সভ্য বলিয়া গৃহীত হইলে আপনাকে ধন্য মনে করেন। গত কয়েকবার ধরিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞান সমিতিতে ( Psychical research society ) যিনি সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, তিনিই Royal society তে সভাপতি হইয়াছেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে কোন্‌শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক দ্বারা অধ্যাত্মবিজ্ঞান সমিতি গঠিত।

যেমন কোন কার্য্য আরম্ভ হইলে, বিশেষ কোন মহৎকার্য্যে, চারিদিক হইতে তাহার নানারূপ শত্রুতা হইতে থাকে, সেইরূপ এই সমিতির কার্য্যারম্ভের পর চারিদিক হইতে বিরুদ্ধাচরণ হইতেছিল, মহৎকার্য্য এইরূপ বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া ক্রমে মহত্তর হইয়া উঠে—অধ্যাত্মবিজ্ঞান সমিতিও সেইরূপ সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং সেই সকল বাধা বিঘ্নের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তবে এই সমিতির কার্য্যের স্বাভাবিক গুরুত্বের জন্য যে সমস্ত বাধা উঠিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পরীক্ষার ক্ষেত্র ভৌতিক পদার্থ, সেই পদার্থে খলতা কপটতা রূপ দোষ আসিয়া পরীক্ষার ফলে সন্দিহান করিয়া তোলে না। কিন্তু অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের পরীক্ষার ক্ষেত্র মানুষ, সেই মানুষ যদি খলতা ও কপটতা দ্বারা ফল গুলিকে দুষ্ট করিয়া তোলে, তাহা হইলে পরীক্ষক নিজে যত বুদ্ধিমান ও সাধু হউন না কেন তাঁহাকে বঞ্চিত করা তেমন অসম্ভব নয়। এই আশঙ্কা করিয়া প্রথম প্রথম পরীক্ষকগণ, পরীক্ষার অবলম্বনস্বরূপ মানুষকে সর্ব্বথা খলতা দোষ শূন্য কি না স্থির করিতে চেষ্টা করেন। এই সকল পরীক্ষা কার্য্যে যাঁহারা সামান্য মাত্র খলতার পরিচয় দিয়াছেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা একেবারে পরিহার করিয়াছেন। এই ভাবে এই সকল পরীক্ষার উপযুক্ত ক্ষেত্র খুঁজিয়া পাইতে কিছু বিলম্ব হয়। কিন্তু যাঁহাদের তীব্র অনুসন্ধান প্রবৃত্তি মহাসমুদ্রের অন্তঃস্থলের অথবা অনন্তাকাশের দূরতম প্রদেশের ব্যাপারগুলি করামলকবৎ আয়ত্ত করিয়াছে, তাহাদের আয়োজন উদ্যোগ প্রতিহত হইবার নহে। তাঁহাদের আলোচনার ফলগুলি অতি সামান্য ভাবে কিছু বর্ণনা করিব।

চিত্তসংক্রমণ ( Telepathy )। যে ক্রিয়া বা ধর্ম্মের জন্য একজনের মনের ভাব বা বৃত্তি অপর কেহ মনে মনে ধরিতে বা বুঝিতে পারে, তাহাকে চিত্তসংক্রমণ বলে, ইহার ইংরেজি নাম Telepathy। সাধারণ ভাবে এইরূপ ক্রিয়া প্রত্যেকের মধ্যে হইলেও তাহা সকলে বুঝিতে পারে না, তাই একটু বিশেষ প্রকার প্রয়োগ এবং অভিনিবেশের দ্বারা ইহা ধরা পড়ে। যে ব্যক্তি নিজের মনের ভাব অন্য চিত্তে সংক্রামিত করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি স্থির চিত্তে কোন একটি বিশেষ ভাবের প্রতি লক্ষ্য করেন, কিছুক্ষণ এইরূপ করিলে অপর ব্যক্তি নিজের মনের মধ্যে সেই ভাবের উদয় দেখিতে পান। প্রথম ব্যক্তিকে প্রযোক্তা বা প্রয়োজক ( Agent ) বলা যাইতে পারে এবং দ্বিতীয়

ব্যক্তিকে গ্রাহক বা অনুভাবক ( Percipient ) বলিয়া উল্লেখ করিব। অনুভাবকের কাজ নিজের চিত্তের গতিতে অনারব্ধ অবস্থা আনিয়া অভিনিবেশপূর্ব্বক লক্ষ্য করা। চেষ্টা করিলে সকলে এই অবস্থা আনিতে পারে না, সুতরাং কোন বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন লোক অনুভাবকের কাজ করিয়া থাকেন। অনুভাবকের শক্তিসম্পন্ন অকপট প্রকৃতির লোক পাইলেই এরূপ পরীক্ষা হইতে পারে—কারণ প্রযোক্তা সম্বন্ধে বিশেষ কোন শক্তির প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না, সকলেই প্রযোক্তার কাজ করিতে পারেন—আর যদি একজন লোক প্রযোক্তার কাজ করিলে সুবিধা মনে না হয় তবে অনেক লোক একত্রিত হইয়া প্রযোক্তার কাজ করিতে পারেন, সময়ে সময়ে এইরূপ ভাবেই পরীক্ষা করা হইয়াছে। প্রথম প্রথম পরীক্ষা কালে প্রযোক্তা এবং অনুভাবক এক ঘরে থাকিয়া কার্য্য করিতেন, অনুভাবকের চক্ষু বাঁধিয়া দেওয়া হইত, তাহার পর পরদার অন্তরালে রাখিয়া চেষ্টা করা হয়, তাহার পর গৃহান্তরে রাখিয়া চেষ্টা হয়, তাহার পর গ্রামান্তরে থাকিয়া পরীক্ষা করা হয়, এবং এক্ষণে দেশান্তরে থাকিয়া পরীক্ষা দ্বারাও কৃতকার্য্য হইয়াছিল। সুতরাং সিদ্ধান্ত স্থির হইয়াছে যে মানসসংক্রমণ ব্যাপারে দূরত্বের ব্যবধান কোন বাধার কারণ হয় না। এই সমস্ত পরীক্ষার বিবরণ দেওয়া এই সামান্য প্রবন্ধে সম্ভব নহে, তবে দুই একটি পরীক্ষা সম্বন্ধে স্থূল ঘটনা গুলির উল্লেখ করিলে, এই বিষয়টি বুঝিবার সুবিধা হইতে পারে। ১৮৮৩ সালে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ( Guthrie ) গুথরি চিত্তসংক্রমণ সম্বন্ধে কতকগুলি পরীক্ষা করেন। সেই সময় তাঁহার হাতে একটা বড় কাজের ভার ছিল, সেই কার্য্যে নিযুক্ত দুইটি বালিকার চিত্তসংক্রমণ ব্যাপারে অনুভাবকের কার্য করিবার শক্তি আছে শুনিতে পাইলেন। বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়া তাহাদের মধ্যে কোন খলতার সন্দেহ করিবার কারণ নাই বুঝিতে পারিয়া তাহাদের লইয়া চিত্তসংক্রমণ ব্যাপারের পরীক্ষা করেন। ( Liverpool ) লিভারপুল নগরের দর্শন ও সাহিত্য সভার সম্পাদক Birchall তাঁহার সহকারী ছিলেন এবং এই সকল পরীক্ষায় ( Professor Lodge ) অধ্যাপক লজও মাঝে মাঝে উপস্থিত থাকিতেন। চিত্তসংক্রমণ পরীক্ষায় প্রথম প্রথম যে সমস্ত অনুষ্ঠান হইয়াছিল তাহার মধ্যে এ গুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। মনোবৃত্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন আকারের, সুতরাং তাহাদের শ্রেণী বিভাগ করিয়া পরীক্ষা করা হয়, প্রযোক্তা সংখ্যার ঠিক করিলে অনুভাবক তাহা বলিতে পারেন কি না, এই বিষয়ে প্রথম অনুসন্ধান হয়। কোন একটি সংখ্যা কাগজে লিখিয়া যে কয়জন প্রযোক্তা থাকেন তাঁহারা স্থির চিত্তে তাহার প্রতি অভিনিবেশ করিতে থাকেন, অনুভাবক দূরে আবদ্ধ-চক্ষু হইয়া বসিয়া থাকেন, কিছুক্ষণ পরে সেই সংখ্যার নাম করিয়া দেন। প্রতিদিন ২০। ৩০টি এইরূপ পরীক্ষায় অনুভাবক এতগুলি ঠিক করিয়া বলিয়া দিতেন যে তাহা কোনরূপ অনুমানের দ্বারা সম্ভব হয় না ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইত। যে গুলি ঠিক হইত না তাহাতেও যে একটা বিপর্য্যয় হইত তাহাও অতিশয় বিস্ময়াবহ। যেমন

প্রযোক্তার কল্পিত সংখ্যা ২৫ যদি অনুভাবক ৫২ বলেন তবে দেখা যায় যে রাশি দুইটি বিপর্য্যস্তভাবে অনুভাবকের মনে উদিত হইয়াছে। অথবা প্রযোক্তা যদি ৩১ সংখ্যা মনে করেন এবং অনুভাবক ৩২ অথবা ৩০ বলেন তাহা হইলে দেখা যায় যে রাশিগত অঙ্ক সন্নিবেশের অতি সন্নিহিত ভাব মনে উদিত হইয়াছে। প্রথম বিপর্য্যয়ে যেন অনুভাবকের মনে রাশির চিত্রটি উদিত হইয়া একটু অন্য প্রকার হইয়াছে। দ্বিতীয় বিপর্য্যয়ে রাশির সংখ্যাটি উদিত হইবার সময় অন্য প্রকার হইয়াছে। যদি ২০টি পরীক্ষা করিয়া তাহার ১৬টি ঠিক হয় এবং ২টি প্রথম বা দ্বিতীয় প্রকারের বিপর্য্যয় হয় এবং ২টি একেবারে ভুল হয় তাহা হইলে এরূপ ঘটনা বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহার সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ যখন বিপর্য্যয় বা ভুল হইতে আরম্ভ হয় তখন উপর্য্যুপরি এমন হইতে থাকে যে স্বতঃই মনে হয় যে কোন একটা শক্তির বলে এইরূপ ঠিক বলা হইতেছিল, এবং সেই শক্তির অভিভবে—উপর্য্যুপরি বিপর্য্যয় বা ভুল হইতেছে। সংখ্যাসম্বন্ধীয় পরীক্ষার পরে তাস লইয়া পরীক্ষা হয়। কোন একখানি তাস ধরিয়া প্রযোক্তা বা প্রযোক্তৃগণ চিন্তা করিতে থাকেন, অনুভাবক সেইরূপভাবে দূরে বসিয়া তাহা বলিয়া দেন। ইহাতেও শতকরা ৮০।৮২টি ঠিক ঠিক হয় এবং বিপর্য্যয় ক্ষেত্রেও ঐরূপ একটা নিয়ম দেখা যায়। মানসবৃত্তি সংক্রমণের পরীক্ষার পর চাক্ষুষ বৃত্তি সংক্রমণসম্বন্ধে পরীক্ষা করেন। প্রযোক্তা কোন একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়া সেই দিকে অভিনিবেশ করিতে থাকেন। অনুভাবক পূর্ব্বের ন্যায় আবদ্ধচক্ষু হইয়া দূরে বসিয়া থাকেন, কিছুক্ষণ পরে চক্ষু খুলিয়া দিতে বলেন এবং একখানি কাগজে একটি চিত্র আঁকিয়া দেন। চিত্রিত চিত্র এবং এই অনুভাবকের অঙ্কিত চিত্র প্রায় একই রূপ বুঝিতে পাবা যায়। ১৮৮৩ সালের অক্টোবর মাসে ১৫০টি এই চিত্র পরীক্ষা হয়, তাহার মধ্যে অধিকাংশগুলি ঠিক ঠিক মিলিয়া যায়। অনুভাবকের পক্ষে যে চিত্রগুলি অঙ্কন অসম্ভব হইয়াছিল তাহার বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দেন। প্রযোক্তার চিত্রিত চিত্র এবং অনুভাবকে অঙ্কিত চিত্রগুলি অধ্যাত্মবিজ্ঞান সমিতিতে প্রেরিত হইয়াছে এবং তাহার অনুলিপি সমিতির বার্ষিক বিবরণে প্রকাশিত হইয়াছে। চিত্রগুলি দেখিলে মনে হয় যে একটি চিত্র দেখিয়া অন্য চিত্র করিতে যতটা পার্থক্য হয় তাহাব চেয়ে অধিক পার্থক্য অনেক স্থলেই হয় নাই, যেখানে বা একটু পার্থক্য হইয়াছে সেখানে চিত্রের দক্ষিণস্থ ভাগ বামাঙ্গ হইয়াছে অথবা উদ্ধস্থ ভাগ নিম্নস্থ হইয়াছে, অথবা একদিক সুস্পষ্ট হইয়া অন্যদিক অস্পষ্ট হইয়াছে, অথবা প্রথমবারের চেষ্টায় যতটা তারতম্য হইয়াছে পরের চেষ্টায় তাহার অপেক্ষা মিল হইয়াছে, কোন চিত্রে বা চতুর্থবারের চেষ্টায় ঠিক মিল হইয়াছে। এই সকল পরীক্ষার দ্বারা যে একজনের মনের ভাব অন্যের মনে সঞ্চারিত হয় তাহা নিঃসন্দেহ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়। দুই একটি পরীক্ষায় বড়ই বিস্ময়কর ফলের পরিচয় পাওয়া যায়। একবার প্রযোক্তা ( Professor Guthrie ) এবং Profesor Lodge একজন একটি সমকোন চতুর্ভুজের চিন্তা করিতেছিলেন, আর একজন

তাহার কর্ণ দুইটির চিন্তা করিতেছিলেন। অনুভাবক একটু ইতস্ততের পর কর্ণযুক্ত সমকোন আঁকিয়া দিলেন, ইহাতে দুই জনের মনের ভাব অনুভাবক গ্রহণ করিয়াছিলেন, বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়।

এই সকল পরীক্ষার পর আর এক জাতীয় পরীক্ষার চেষ্টা করা হয়। প্রযোক্তার শরীরের কোন দেশে কোন বেদনা অনুভব করিলে অনুভাবক তাহা বুঝিতে পারেন কি না ইহার অনুসন্ধান হয়। যাঁহারা প্রযোক্তা তাঁহাদের শরীরের কোন দেশে, যেমন কর্ণের পাতা অথবা অঙ্গুলের অগ্রভাগ, পিন ( Pin ) অথবা চিমটির দ্বারা কোন পীড়া জন্মাইতে থাকিলে, অনুভাবক পূর্ব্বের ন্যায় দূরে বসিয়া নিজের শরীরের সেই স্থান দেখাইয়া বেদনার প্রকৃতি বর্ণনা করেন। এক এক দিন ২০টি করিয়া পরীক্ষা করা হইত, কোন একদিনের কুড়িটির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় ১০টি ঠিক স্থানে, ঠিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছিল, এবং ৬টির বর্ণনা ঠিক হইয়াছিল কিন্তু স্থাননির্দ্দেশে সামান্য ব্যতিক্রম হইয়াছিল, অবশিষ্ট কয়টির মধ্যে ২টি ভুল হইয়াছিল এবং ২টিতে কোন অনুভব হয় নাই। যতদিন পরীক্ষা হইয়াছিল ততদিন ইহার অনুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছিল। তাহার পর এই ক্ষেত্রেই গন্ধগ্রহণ এবং স্বাদগ্রহণ শক্তির এইরূপ সংক্রমণ হয় কি না তাহারও অনুসন্ধান হয় এবং তাহাতেও পূর্ব্বের ন্যায় ফললাভ হয়। সর্ব্বজনজ্ঞাত দুই জন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এই পরীক্ষায় সংলিপ্ত ছিলেন এই জন্য ইহার একটু বিস্তৃত বিবরণ দিলাম, কিন্তু এইরূপ পরীক্ষা রাশি রাশি হইয়াছিল এবং সর্ব্বত্রই এইরূপ ফল লাভ হয়।

দূরদেশে থাকিয়া "মানস সংক্রমণ" পরীক্ষার একটু সংক্ষেপ বিবরণ দিব। ১৯০৫সালে Miss Miles এবং Miss Ramesden নাম্নী দুই জন ভদ্রমহিলা যে পরীক্ষা করেন তাহার সমস্ত বিবরণ অধ্যাত্মসমিতির সম্মুখে আসিয়াছে। Miss Miles প্রযোক্তার কার্য্য করিয়াছিলেন, Miss Ramesden অনুভাবকের কার্য্য করিয়াছিলেন। Miss Miles লণ্ডন সহরে এবং Miss Ramesden Buckingham Shire এ থাকিয়া প্রথম পরীক্ষা হয়। Miss Miles যে ভাব বা চিত্র চিন্তা করিতেন তাহা একখানি পুস্তকে পূর্ব্বে লিপিবদ্ধ করিতেন এবং Miss Ramesden প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে অনুভাবকরূপে অবস্থিত থাকিয়া নিজের হৃদয়ে যে ভাবের আবির্ভাব হইতেছে বুঝিতে পারিতেন তাহা লিখিয়া রাখিতেন এবং পরদিন ডাকযোগে Miss Miles এর নিকট পাঠাইতেন। তিনি তাহা নিজের লিখিত বিবরণের পাশে আঁটিয়া রাখিতেন। এই ভাবে অনেকগুলি বিবরণ সংগৃহীত হইলে, তাহা অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সমিতির নিকট উপস্থাপিত করেন। পরবৎসর ঐ দুই ব্যক্তি আরও কতকগুলি পরীক্ষা করেন, Miss Miles ( Bristol ) ব্রিষ্টলে ছিলেন এবং Ramesdën (Invernes Shire ) ইনভারনেস সাইয়ারে ছিলেন। সন্ধ্যা ৭ টার সময় অনুভাবক, ভাব সংগ্রহের চেষ্টা করিতেন, এবং যে ভাব সংগ্রহ করিতেন তাহা পোষ্টকার্ডে লিখিতেন এবং সেই পোষ্টকার্ড পরীক্ষার কার্য্যশেষে Miss Miles এর নিকট পাঠাইতেন। এদিকে Miss Miles সমস্ত দিনের মধ্যে অনির্দ্দিষ্টভাবে অনুভাবকের চিন্তা করিতেন এবং সন্ধ্যার সময় স্মরণ করিয়া

একখানি পোষ্টকার্ডে লিখিতেন, পরদিন প্রত্যূষে Miss Ramesden এর নিকট পাঠাইতেন, অধ্যাত্মবিজ্ঞান সমিতি এইরূপ ভাবে পরীক্ষা করিবার পরামর্শ দেন। ইহাতে পোষ্টকার্ডের উপর পোষ্ট মার্কের ( Post mark ) দ্বারা পরীক্ষাকাল নিরূপণ করিবার সুযোগ হইত। ১৫ দিন পরীক্ষার পর সমস্ত বিবরণী অধ্যাত্মবিজ্ঞান সমিতিতে পাঠান হয়। তাঁহারা এই সমস্ত পরীক্ষার ফল বিচার করিয়া দেখিয়াছেন যে প্রযোক্তার জ্ঞানপূর্ব্বক যে ভাব প্রেরণ করিয়াছিল তাহার অনেকগুলি অনুভাবকের হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়াছে। দুই একটা হয়ও নাই। আবার প্রযোক্তা যে সমস্ত ভাব পাঠাইবার ইচ্ছা করেন নাই, অথচ তাঁহার মনে উঠিয়াছিল, তাহার অনেক ভাবও অনুভাবক ধরিতে পারিয়াছেন। ইহার দ্বারা মনে হয় যে এই ভাবসংক্রামণ সম্পূর্ণ ইচ্ছাকৃত ব্যাপার না হইতে পারে।

একজনের কোনরূপ ইচ্ছা চেষ্টা নাই তথাচ তাহার মনের ভাব অন্যের হৃদয়ে সংক্রামিত হওয়ার ঘটনাও অনেক পাওয়া গিয়াছে। Fredrick Lodge লিখিতেছেন যে "তাঁহার স্ত্রী ট্রেনে আসিতেছিলেন, একটু বিশ্রাম করিব মনে করিয়া একবার চক্ষু মুদিত করিবামাত্র একখানি টেলিগ্রাফ ফারমে নিম্নলিখিত শব্দ কএকটি যেন লেখা দেখিতে পাইলেন,'Come at once your sister is dangerously ill।" ২৭শে এপ্রিল ১৮৮৯ সালে বেলা ৩৷৹ টার সময় এই ঘটনা ঘটে। রাত্রি ৯টার সময় তিনি বাড়ী আসিয়া পৌছেন, তাহার পূর্ব্বে তাঁহার নামে একটি টেলিগ্রাফ আসিয়াছিল, সেটি তাঁহাকে দিবামাত্র তিনি তাহার মধ্যে লিখিত কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি কি করিয়া জানিলে? তিনি তদুত্তরে রেলের ঘটনা বর্ণনা করিলেন। পরে টেলিগ্রামের খবর মিলাইয়া দেখা গেল যে স্বপ্নে চিত্র দর্শনের সময়েই টেলিগ্রাফ লেখা হইয়াছিল।"

এইরূপ অসংখ্য ঘটনার বিবরণ সংগ্রহ করিয়া অধ্যাত্ম বিজ্ঞান সমিতি তাহার বিচার করিয়াছেন। এবং য়ুরোপের সমস্ত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক একবাক্য হইয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, ভাবসংক্রমণ মানুষের হৃদয়ে অলৌকিক ধর্ম্মবিশেষ। উহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মানুষের হৃদয়ে কোন্ উপায়ে এই শক্তির বিকাশ হইতে পারে অধ্যাত্মবিজ্ঞান সমিতি তাহার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। সমিতির বার্ষিক বিবরণে এসকল কথা তন্ন তন্ন করিয়া আলোচিত হইয়াছে।

সম্মোহনবিদ্যা (Hypnotism)। জর্ম্মাণ দেশে Mesmer নামে কোন ভদ্রলোক অঙ্গুলিসঞ্চালন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সহিত আদেশ জ্ঞাপন দ্বারা কোন কোন মানুষকে একরূপ অবশ করিয়া ফেলিতে পারিতেন। Mesmer এইরূপ করিয়া অনেকের কঠিন পীড়া আরোগ্য করিয়াছিলেন।

এই প্রক্রিয়াতেও দুইটি পক্ষ আছে, যাহার দ্বারা এই সকল ক্রিয়া সাধিত হইত তাঁহাকে আমরা সম্মোহনকারী (Hypnotiser) আখ্যা দিব। এবং যাঁহাকে এইরূপ ক্রিয়ার অধীন করা হয় তাঁহাকে মুগ্ধ বা মুহ্যমান পাত্র ( Object of Hypnotism ) বলিব। Mesmer যখন এই সকল অনুষ্ঠান করিতেন তাহাকে Mesmerism বলা হইত; এবং

তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সম্মোহনকারীর শরীর হইতে কোন শক্তি বা পদার্থ নির্গত হইয়া মুহ্যমান পাত্রকে আক্রমণ করে। যাহা হউক তাঁহার আদেশ দ্বারা লোকের রোগ ভাল হইত দেখিয়া পাছে তিনি যীশুখ্রীষ্টের মহিমার লোপকারী হন এই আশঙ্কায় খ্রীষ্টানেরা তাঁহার বিদ্বেষ করিত। নির্ব্বাসিত হইয়া তিনি অবশেষে স্বদেশ হইতে তাড়িত হন।

তাহার পর Marquis De Puysegur এই সম্বন্ধে নানারূপ পরীক্ষা করেন। তিনি রোগের চিকিৎসা ভিন্ন অন্যান্য বিষয়েও এই বিদ্যার প্রয়োগ করেন। তিনিই প্রথমে দেখান যে সম্মুগ্ধ পুরুষকে যেরূপ ইচ্ছা সেইরূপ কর্ম্মে নিয়োগ করা যাইতে পারে। সেই অবস্থায় তাহার কোন হিতাহিত বিচারশক্তি থাকে না।

ইহার পর ইংলণ্ডে (Elliotson) এলিয়টসন্ এবং কলিকাতায় (Esdaile) এস্‌ডেইল রোগীর চিকিৎসায় প্রয়োগ করিয়া ইহার প্রভাব স্থির করেন। এসডেইল সম্মোহনের দ্বারা শরীরের অংশ বিশেষকে অনুভবশক্তিহীন করিয়া অস্ত্রচালনা দ্বারা অনেক গুলি অস্ত্র চিকিৎসা করেন।

তাহার পর (James Braid) জেমস্ ব্রেড পরীক্ষা দ্বারা স্থির করেন যে অঙ্গুলিসঞ্চালন অথবা অন্যবিধ প্রক্রিয়া প্রয়োগ না করিয়াও কোন আদেশ দ্বারা একজনকে সম্মুগ্ধ করা যায়। তাঁহার এই সিদ্ধান্তে (Mesmer) মেসমারের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত খণ্ডিত হইয়া যায়। কারণ ব্রেডের পরীক্ষার দ্বারা আদেশকারীর দেহ হইতে, আদিষ্ট পুরুষের শরীরে কোনরূপ পদার্থ বা শক্তি সংক্রমণ স্বীকার করা প্রয়োজন হয় না। ইহার পর কতকগুলি পরীক্ষা ফরাসীদেশে (Saltpetre Hospital) সল্টপিটার হাঁসপাতালে হয়, সেইখান হইতে একটি নূতন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, তাহাকে (Charcot School) অথবা চারকট সম্প্রদায় বলে। ইহার অব্যবহিত পরে আর এক সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান হয়—তাহাকে Nancy School বা নান্সি সম্প্রদায় বলে। এই পরবর্ত্তী নান্সি সম্প্রদায় চারকট সম্প্রদায়ের কোন কোন সিদ্ধান্ত খণ্ডন করেন। এই সকল ঘটনার সত্যতা কেহ অস্বীকার করেন নাই। চারকট সম্প্রদায় বলিতেন যে মস্তিষ্কে কোন গোল থাকিলে এইরূপ সম্মুগ্ধ হইয়া থাকে, নান্সি সম্প্রদায় দেখাইয়াছেন যে শতকরা ৯০ জন লোককে যখন সম্মুগ্ধ করা যায় তখন এই অসাধারণ মস্তিষ্কের দোষ কল্পনা করা সঙ্গত নহে। Bernhem নিজে ১০০০০ দশ হাজার হাঁসপাতালের রোগীকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়া শতকরা ৯০ জনকে সম্মুগ্ধ করিতে পারিয়াছিলেন। Wetter strand ওয়াটার ষ্ট্রাণ্ড ৬৫০০ লোককে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়া কেবল ১০৫ জনকে সম্মুগ্ধ করিতে পারেন নাই। (Schrenck Notzink) (শ্রেঙ্ক নটসিঙ্ক ১৮৯২ সালে একটি বিবরণ দেন তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ৮৭০৫ জনের উপর পরীক্ষায় শতকরা ৬ জনের প্রতি বিফল হয়। কেমব্রিজের শারীর বিদ্যার Demons trator Hugh Wingfield ১৭০ জনের উপর সম্মোহনবিদ্যার প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ১৮ জন ভিন্ন সকলেই Graduate ছিলেন। তিনি শতকরা

৮০ জনে কৃতকার্য্য হন। এই সকল ঘটনার বিশেষ বিচার ও অনুসন্ধান করিয়া নান্সিসম্প্রদায় ঠিক করেন যে সুস্থ, সবল এবং বুদ্ধিমান লোককেই শীঘ্র সম্মোহিত করা যায়, বরং মূর্চ্ছা রোগ অথবা উন্মাদরোগগ্রস্ত লোকসম্বন্ধেই উহা সহজ নহে।

চারকট সম্প্রদায় বলিয়াছিলেন যে সম্মোহন করিলে সম্মোহিতের কিছু ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। নান্সিসম্প্রদায় পরীক্ষার দ্বারা স্থির করেন যে কাহারও কোন ক্ষতি হওয়া দূরে থাকুক বরং ইহার দ্বারা শরীরের রোগের কিছু উপশমন হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে নান্সিসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত জয়লাভ করে।

সংক্ষেপতঃ নান্সিসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত এইরূপ—সম্মোহনকার্য্যে আদেশকারীর কোন শারীরশক্তির প্রয়োজন হয় না, এবং কোনরূপ শারীর প্রক্রিয়ারও বিশেষ প্রয়োজন নাই, সম্মোহনকারীর ইঙ্গিতে মুহ্যমান পাত্রের মধ্যে একটা নিদ্রার ভাব আসিয়া তাহার কোন কোন শক্তিকে অধিকার করে। যখন বিচার শক্তি এইরূপে অভিভূত হইয়া পড়ে, কিন্তু অন্যান্য কার্য্যকারী বৃত্তিগুলি জাগরূক থাকে, আদেশকারীর ইঙ্গিতে তখন তাহারা কার্য্য করে। দেখিয়া মনে হয় যেন সে সকল কার্য্যে তাহার ইষ্টানিষ্ট বিচার নষ্ট হইয়াছে। ইহা একরূপ অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থা। অঙ্গুলিসঞ্চালনাদি বাহ্য চেষ্টা এইরূপ অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থা আনয়ন করিবার সহায়মাত্র। এইরূপ অবস্থা, নিদ্রাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা এবং মাদকসেবনের দ্বারা মুগ্ধাবস্থা হইতে বিশেষ ভিন্ন।

এই পর্য্যন্ত অনুসন্ধানের পর অধ্যাত্মবিজ্ঞানসমিতি ইহার পরীক্ষার ভার লন। এবং তাঁহাদের নিরন্তর চেষ্টায় এবং অজস্র পরীক্ষায় সিদ্ধান্ত আরও একটু দূর অগ্রসর হইয়াছে। যদি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে স্বীকার করিতে হয় যে মানুষ অর্দ্ধনিদ্রিতাবস্থায় নিজের কার্য্যকারী বৃত্তিগুলির দ্বারা কাজ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অতিশয় দুরারোগ্য রোগও এই সম্মোহনের দ্বারা ভাল হয় কি করিয়া? সকল মানুষই নিজের কষ্টদায়ক রোগ হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা করে, কিন্তু তাহাদের সেই ইচ্ছা ত কখন কার্য্যকরী হয় না, সম্মুগ্ধাবস্থায় এমন কি ঘটনা ঘটে যে সেই ইচ্ছাই তাহাদের রোগমুক্ত করিয়া দেয়? এইরূপ একটা প্রশ্ন সমিতির মনে উদিত হয়। তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া আরও এই সম্মোহাবস্থার পরবর্ত্তী অত্যাশ্চর্য্য একটি অবস্থা দেখিতে পান। ইহাকে আমরা সম্মোহান্তর ( Post Hypnotic ) অবস্থা বলিতে পারি। ইহার বিবরণ এইরূপ—কোন সম্মুগ্ধ মানুষকে যদি কোন আদেশ করিয়া মোহ ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে অনেক স্থলে মোহ ভাঙ্গিবার পরও সেই আদেশ সে প্রতিপালন করিতে থাকে। একজন ডাক্তার তাঁহার অধীনস্থ কোন রোগীকে বলেন যে প্রতি শুক্রবারে প্রাতঃকালে কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহার হস্ত হইতে বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ হইবে। সেই আদেশের পর প্রায় ২ মাস পর্য্যন্ত প্রতি শুক্রবারে সকাল বেলায় ঐরূপ ঘটনা হইতে থাকে, তাহার পর চিকিৎসক অন্য দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া, পুনরায় সম্মুগ্ধ করিয়া তাহার নিবারণ করেন। সম্মুগ্ধ অবস্থায় যে আদেশ করা যায়, সম্মোহান্তর অবস্থায় তাহার কোন স্মরণ থাকে না, কিন্তু

তদনুযায়ী কার্য্য অবাধে সম্পন্ন হইতে থাকে। ইহাতে জিজ্ঞাস্য হয়, সম্মোহান্তর অবস্থায় আদেশ স্মরণ রাখে কে? যে জাগ্রত অবস্থায় অন্যান্য কার্য্য করিতেছে এবং স্মরণ রাখিতেছে সে নিশ্চয়ই নহে, কারণ তাহার ত সে আদেশ স্মরণ নাই। সম্মুগ্ধাবস্থায় যে আদেশ গ্রহণ করে, সেই সময়ে যে সেই আদেশ পালন করে, সম্মোহান্তর অবস্থায় সেই আদেশ স্মরণ রাখে এবং প্রতিপালন করে। সম্মুগ্ধাবস্থায় আদেশের গ্রাহক ও প্রতিপালক কিন্তু অসীম শক্তিসম্পন্ন, কারণ তাহার আদেশপালনগুণে দেহের দুরারোগ্য রোগ একেবারে ভাল হইয়া যায়, তাহারই আদেশপালনগুণে, যে মানুষ সাধারণতঃ ইচ্ছা দ্বারা হস্ততল হইতে একবিন্দু রক্ত সহস্র চেষ্টায় নির্গত করিতে পারে না, সেই মানুষের হাত হইতে নিয়মমত যথাসময়ে রক্তপাত হইতে থাকে। এই সকল দেখিয়া অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান-সমিতি সিদ্ধান্ত করেন, মানুষের দেহ মধ্যে দেহের নিয়ামক, সংস্কারক এবং গঠক রূপে একটি জ্ঞানময়, ইচ্ছাময় শক্তিসমষ্টি আছে, তাহাকে আত্মা বলা যাউক। এই আত্মা দেহের মধ্যে থাকিয়া কার্য্য করিতে করিতে কতকটা দেহের অধীন হইয়া পড়িয়াছে এবং দেহের ভাবাভাব তাহারা সুখ দুঃখ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে। আত্মার এই অংশের সঙ্গে দেহের এমনি একটা অন্বয়ব্যতিরেক সম্বন্ধ হইয়া গিয়াছে যে অনেকে এই দিকের ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া ইহাকে দেহ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারেন না, সুতরাং তাহারা দেহব্যতিরিক্ত আত্মা নাই এইরূপ সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু আত্মার এমন একটা দিক আছে যাহার অবস্থিতি ও ক্রিয়া দেহের অধীন নহে, সুতরাং তাহার ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য করিলে তাহাকে চিরকালই স্বতন্ত্র বলিয়া বোঝা যায়। এই যে সম্মুগ্ধাবস্থার কথা আলোচনা করিতেছি তাহাতে আত্মার দেহাধীন ও স্বাধীনভাব ভিন্ন রূপে প্রকটিত হইয়াছে। দেহাধীন আত্মা দেহের মধ্যে থাকিয়া সাধারণ জাগ্রতাবস্থায় তাহাতে পরিচালন, পোষণ ও জ্ঞানের ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে সম্মুগ্ধাবস্থায় দেহের ক্রিয়া সংরুদ্ধ হয়, দেহাধীন আত্মা দেহের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে, তবে আত্মার স্বাধীনভাগ চিরকাল জাগ্রত আছে, এই সময়ে যদি কোন কারণে তাহার মধ্যে একটা ইচ্ছার তরঙ্গ ফুটাইয়া দিতে পারা যায়, তবে সেই ইচ্ছার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্বাধীন আত্মার মধ্যে সঞ্জাত ইচ্ছার দ্বারা মানুষের দুরারোগ্য রোগ ভাল হইয়া যায় অথবা ঐরূপ কোন রোগের সঞ্চার হইতে পারে। স্বাধীন আত্মার জাত ইচ্ছার দ্বারা সম্মোহান্তর অবস্থায় ঐরূপ আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে সাধারণ ভাবে যে সমস্ত রোগ চিকিৎসা দ্বারা দূর হইয়া থাকে, তাহাতে আরোগ্য হইবার জীবনীশক্তি সেই স্বাধীন আত্মার নিকট হইতে আসে। সাধারণ ভাবে নিদ্রাবস্থা, স্বপ্নাবস্থা বা মূর্চ্ছাবস্থায় স্বাধীন-আত্মার সত্তা থাকিলেও তাহাদের ক্রিয়ার প্রতি লোকের লক্ষ্য পড়ে না, এবং আমাদের বর্ণিত বিশেষ সম্মুগ্ধাবস্থায় স্বাধীন আত্মার ক্রিয়ার সুযোগ বা অবসর বুঝিতে পারা যায়।

অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সমিতি আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কোন কোন লোক নিজে চেষ্টা করিয়াও ঐ সম্মুগ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ়ীভূত হইয়াছে।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানসমিতি পরীক্ষার দ্বারা স্থির করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত বিধিতে সম্মোহনের দ্বারা স্বাভাবিক দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়শক্তিকে সবল করা যায়। Aubry নামে কোন বালিকা জন্মবধির ছিলেন, ডাক্তার Liebeault তাঁহাকে সম্মুগ্ধ করিয়া অনেক পরিমাণে তাঁহার শ্রবণ শক্তির বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত উক্ত বালিকা নিজে নিজে সম্মুগ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়া শ্রবণশক্তির বল বৃদ্ধি করিয়া লইতেন। আবার বিধিমত সম্মোহনের দ্বারা সাধারণ ইন্দ্রিয় শক্তিকেও অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু যেখানে যে ইন্দ্রিয়শক্তি নাই সেই থানে সেই ইন্দ্রিয়শক্তির আবিভাবকরণরূপ সম্মোহনবিদ্যা হইতে প্রাপ্ত অপূর্ব্ব সত্য জগৎকে বিস্মিত করিয়াছে। পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া পুস্তক পাঠ। হস্তস্পর্শের দ্বারা অন্ধকার ঘরে বর্ণ চিনিবার ক্ষমতা, সম্মোহনাবস্থায় নানারূপ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানসমিতির অনুসন্ধানের ফলে ইহাও স্থির হইয়াছে যে, মানসিক রোগও সম্মোহনাবস্থায় আদেশ দ্বারা দূর করা যাইতে পারে। দুর্দ্দমনীয় চৌর্য্যপ্রবৃত্তি, যাহা মানুষ কিছুতেই ছাড়িতে পারে না, তাহা সম্মোহনাবস্থা ঘটিত চিকিৎসার দ্বারা দূর হইয়াছে। মাদকসেবনের যে দুরুল্লঙ্ঘনীয় ইচ্ছা মানুষকে পাগল করিয়া তোলে তাহাও এই সম্মোহন অবস্থার আদেশ দ্বারা ভাল হইয়াছে। যে কামুকতা দোষ মানুষকে কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত পশুর ন্যায় করে, তাহাও এই উপায়ে সংশুদ্ধ হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া ও ভাবিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞানসমিতির সিদ্ধান্ত নিতান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তসম্বন্ধে লোকের আপত্তি থাকিতে পারে, কিন্তু যে সকল ঘটনায় অনুসন্ধানের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিবরণ সমূহ লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্ব্ববাদিসম্মত বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি যে চিত্তসংক্রমণ (Telepathy) এবং সম্মোহন ব্যাপার (Hypnotism) এক্ষণে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত। এই দুই ব্যাপারেই দেহের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া স্বাধীন আত্মার কোন কোন কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় এরূপ অনুমান হয়। যতক্ষণ স্বাধীন আত্মার সত্তা বিষয়ে সাক্ষাৎ কোন প্রমাণ না পাওয়া যাইবে ততক্ষণ এ প্রমাণ দুর্ব্বল। বৈজ্ঞানিক সংশয়বাদী, সুতরাং অনুমানের এই মাত্র অবলম্বনের বলে আত্মার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নন। তাই তাঁহাদের অনুসন্ধানের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল।

স্বাধীন আত্মাসম্বন্ধে দুই জাতীয় প্রমাণকে মুখ্য বলিয়া গণনা করা হয়। দেহ নাশের পর যদি আত্মা বর্ত্তমান থাকে তবে তাহার কার্য্য লক্ষ্য করিয়া স্থির করিতে পারিলে আত্মার প্রমাণ করা যায়। দেহ নাশের পর যে আত্মা থাকে যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভৌতিক জগতে তাহার কোন কার্য্য থাকে তাহা বুঝিয়া উঠা সহজে সম্ভব নয়, কারণ ভৌতিক জগতের শক্তি হইতে সেই শক্তির পার্থক্য বুঝিয়া উঠা বড়ই দুঃসাধ্য। তাই, দেহহীন আত্মা অন্য কোন দেহের উপর যে কাজ করে তাহারই লক্ষ্য করিতে হয়। আত্মা দেহের

উপর কাজ করিলে দুই জাতীয় যন্ত্রের দ্বারা তাহা বাহিরে প্রকাশ পায়। এক মানুষের জ্ঞানেন্দ্রিয়, আর এক কর্ম্মেন্দ্রিয়। সুতরাং আত্মা সম্বন্ধে জ্ঞানেন্দ্রিয়ঘটিত প্রমাণ গুলিকে বৈজ্ঞানিকগণ এক পক্ষে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ঘটিত প্রমাণ বলিয়া অন্য পক্ষে উপস্থাপিত করেন। আমরা কিছু পূর্ব্ব হইতে "স্বাধীন আত্মা" শব্দটি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং ভবিষ্যতে ব্যবহার করিব, ইহাতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে ঐরূপ স্বাধীন আত্মার সত্তা আমরা প্রমাণীকৃত বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। তাহা নহে, আমাদের মনের ভাব প্রকাশ করিবার সুবিধার জন্য আমরা ঐ কথাটি ব্যবহার করিব। উহা আপাততঃ স্বীকারের মত গণ্য করিয়া লইলাম (ইংরেজিতে ইহাকে Tentative Hypothesis বলে) এইরূপ স্বীকারের দ্বারা প্রমাণ অনুসন্ধানের দিক-নির্ণয় করিবার সুবিধা হয়। এই স্বীকারের দ্বারা প্রমাণের নিবৃত্তি না হইয়া প্রমাণের পথ দেখিতে পাওয়া যায়। কারণ প্রমাণকে ঘটনার পথে অনুসন্ধান করিতে হইবে, বাক্যের ঘোরে হারাইতে হইবে না।

পূর্ব্বে যে সকল কথার অবতারণা করা হইয়াছে তাহাতে দেহ হইতে স্বাধীন আত্মার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহার অস্তিত্বসম্বন্ধে প্রমাণের সম্ভাবনা পাওয়া গিয়াছে বলিয়াছি,কিন্তু যদি মনে করা যায় যে, যে সকল অজ্ঞাতপূর্ব্ব শক্তির কার্য্য দেখা গিয়াছে তাহার সকল গুলি দেহাশ্রিত অতি সূক্ষ্ম শক্তি, দেহনাশের সঙ্গে তাহাদের লোপ হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাবিষ্কৃত ঘটনাগুলি যে একেবারে বুঝা যায় না তাহা নহে। এজন্য অধ্যাত্মবিজ্ঞানসমিতি দেহনাশের পর আত্মার অস্তিত্বসম্বন্ধে প্রমাণের জন্য সাক্ষাৎ হেতুর অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করেন। যে সকল হেতুর দ্বারা এই বিষয়ের প্রমাণ হয় আমরা তাহার আলোচনা করিব। মরণের পর কোন লোক আসিয়া যদি নিজের পরিচয় দেয় তাহা হইলে তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু কিরূপ করিয়া মৃত ব্যক্তি আপনার পরিচয় দিতে পারে? ইহা স্থির করা বড়ই কঠিন। সময়ে সময়ে মৃত ব্যক্তির রূপ তাহার আত্মীয় দেখিতে পান, অথবা মৃত ব্যক্তির শব্দ তাঁহার পরিচিত লোক শুনিতে পান—ইহা সাধারণ ঘটনা, অনেকেই বোধ হয় এরূপ কোন কথা শুনিয়াছেন। অধ্যাত্মসমিতি এরূপ ঘটনার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। Edmund Gurney নামে কোন দার্শনিক এই কাজে অগ্রণী হইয়াছিলেন। যে সকল ঘটনার বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার মধ্যে মৃতব্যক্তির মরণের অল্প-দিন পূর্ব্বে বা পরে বা সমকালে ঘটিয়াছে এরূপ ঘটনা অনেক পাওয়া যায়। দুই এক স্থলে মরণের পর অনেক দিন পর্য্যন্ত মৃতব্যক্তির রূপের দর্শন হইয়া থাকে, অথবা শব্দের শ্রবণ হইয়া থাকে। এ ঘটনা দেখিয়া কি বুঝিতে হইবে? সত্যসত্যই কি এই দৃষ্টরূপ বা শ্রুতশব্দ মৃতব্যক্তির আত্মার রূপ অথবা তদ্দ্বারা উৎপন্ন শব্দ? এরূপ বিশ্বাস করিতে সহজে পারা যায় না, কারণ মৃত ব্যক্তির মরণের পর বাহ্যভাবে কোন দৃশ্য-রূপ বা শব্দোৎপন্ন করার শক্তি থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে ঐ সকল ঘটনা যখন সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে তখন তাহা কি কারণে সংঘটিত মনে করিতে হয়?

শরীরের যন্ত্র বলিলে আমরা বাহিরের মোটা কএকখানি যন্ত্রের কথা সাধারণতঃ বুঝিয়া থাকি, প্রকৃত পক্ষে শরীরের প্রত্যেক ক্ষুদ্রকণাও একটি যন্ত্র। জ্ঞানশক্তি পরিচালনার জন্য চক্ষুরাদি যাহার বাহ্যযন্ত্র—মস্তিষ্কের মধ্যে তাহার অন্তঃযন্ত্রের সংস্থান আছে। বাহ্য কোন ক্রিয়া, চক্ষুরাদি বাহ্যযন্ত্রের দ্বার পর্য্যন্ত আসিলে স্নায়ুপ্রণালী দ্বারা অন্তঃযন্ত্র পর্য্যন্ত পৌঁছায়। আবার অন্তঃযন্ত্রের মধ্যে কোন ক্রিয়ার উদ্বোধ হইলে, তাহা বাহ্যযন্ত্র পর্য্যন্ত বিসর্পিত হইয়া সেই স্থানস্থ ইন্দ্রিয়শক্তির অনুরূপ জ্ঞানের উৎপাদন করে। যেমন চাক্ষুষ স্নায়ুর অন্তঃযন্ত্রের মধ্যে কোন একটা ক্রিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া সেই ক্রিয়া চাক্ষুষ স্নায়ুপ্রণালী দ্বারা চক্ষুরিন্দ্রিয় পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়া একটা দৃশ্য রূপের জ্ঞান জন্মায়। সেইরূপ মস্তিষ্কের মধ্যে অন্তঃযন্ত্রের ক্রিয়া উদ্বুদ্ধ হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত আসিয়া একটা শব্দের জ্ঞান জন্মায়। অর্থাৎ অন্তরের ক্রিয়া দ্বারা, প্রকৃত পক্ষে কোন বাহ্য বিষয় উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও এক রূপ বাহ্যজ্ঞান জন্মাইতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা স্বপ্নের সময় দেখিতে পাই—স্বপ্নে দৃষ্ট রূপ বা স্বপ্নে শ্রুত শব্দ একেবারে বাহ্য-অস্তিত্বসম্পন্ন সদ্বস্তু বলিয়াই মনে হয়—কিন্তু বাস্তবিক সে রূপের বা শব্দের কোন বাহ্য সত্তা নাই। যখন আমরা কোন বাহ্যবস্তু চিন্তা করিয়া থাকি তখনই এইরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, কেবল জাগ্রত অবস্থায় আমরা বহু বিষয়ের ভাবনায় ব্যস্ত থাকি বলিয়া কোন একটা চিন্তার বিষয়ে একাগ্র অভিনিবেশ করিতে পারি না; তাই জাগ্রত অবস্থার চিন্তিত বিষয় এবং স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ে এতটা পার্থক্য মনে হয়। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে বাহ্য বিষয় উপস্থিত না থাকিলেও মনের ভাবনায় দ্বারা তাহার বাহ্য ভাবে দর্শন হওয়া অসম্ভব নহে।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ভাবসংক্রমণের দ্বারা একজনের চিত্তের ভাব অন্য চিত্তে সংক্রামিত হইতে পারে। এই সংক্রামিত ভাব তাহার অন্তঃযন্ত্রের উপর কাজ করিয়া এই বিষয় বাহ্যভাবে দর্শনের কারণ হইতে পারে। আমরা পূর্ব্বে ভাবসংক্রমণের অন্তর্ভুক্ত সকল পরীক্ষার কথা উল্লেখ করি নাই, তাহার মধ্যে এমন ঘটনা দেখা গিয়াছে যে দূরদেশবাসী বন্ধু যেন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণ পরে অদৃশ্য হইলেন। কখন বা এইরূপ ঘটনা দুই বা ততোধিক লোক অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিয়াছেন অনুসন্ধানে জানা গেল যে দূরদেশবাসী বন্ধু কেবল তাঁহাদের কথা সেই সময় মনে করিয়াছিলেন মাত্র। ভাবসংক্রমণ ভিন্ন অন্য কোন রূপে এই জাতীয় ব্যাপারের মর্ম্ম বুঝা যায় না। এবং ভাবসংক্রমণের দ্বারা যদি জীবন্ত মানুষের দূরদেশে থাকিয়াও বন্ধুর নিকট উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় তাহা হইলে মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বে অথবা মৃত্যুর সমকালে দূরদেশস্থ বন্ধু মৃতব্যক্তির রূপ দেখিবেন, একথা ভাবসংক্রমণের সাহায্যে বুঝিতে পারা যাইবেনা কেন? এবং সময়ে সময়ে মৃত্যুর পরেও যে ঐরূপ চিত্র দেখা যায় তাহাও সংক্রান্ত ভাবের বিলম্বে উদ্বোধ হইয়াছে মাত্র, এরূপ অনুমান করিলে হানি কি? সুতরাং প্রেতদর্শন প্রভৃতি ঘটনা গুলি, মরণের পর আত্মার প্রমাণস্বরূপে গণ্য হইতে পারে না। এই জন্য

অধ্যাত্মবিজ্ঞান-সমিতি এ সকল প্রমাণ গুলি ছাড়িয়া দিয়া আর এক জাতীয় প্রমাণের অনুসরণ করিয়াছেন।

সামান্য ভাবে রূপ দর্শন বা শব্দ শ্রবণ যদিও আত্মার স্বাধীন অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, তবুও যেখানে অনেক দিন ধরিয়া নানারূপ ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে এবং তাহা কোন মৃতের আত্মার দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে এরূপ শুনা যায় তাহার অনুসরণ করিলে বোধ হয় কোন সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। ইহা মনে করিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞানসমিতি সে সকল ঘটনার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু সহজেই বুঝিতে পারিলেন ঐ ঘটনাগুলি এত জটিল যে অধ্যাত্ম-বিদ্যায় আরও একটু অধিকার না জন্মিলে উহা বুঝা যাইবে না।

কোন মানুষ একটু চেষ্টা করিলে একরূপ অসাড় অবস্থায় উপনীত হইতে পারেন। দেহ যখন এইরূপ অসাড় হয় তখন বাক্‌যন্ত্র একরূপ স্বাধীন ভাবে বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে অথবা তাঁহার হস্ত স্বাধীন ভাবে লিখিতে পারে। এইরূপ ভাবে উচ্চারিত বাক্যে অথবা লিখিত কথায় বাক্‌যন্ত্র বা হস্ত অন্যের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে এরূপ প্রকাশ পায়। কোন মৃত ব্যক্তির আত্মা আসিয়া বাক্‌যন্ত্র অথবা হস্তের উপর কাজ করিতেছে। সেই মৃত ব্যক্তি নিজের পরিচয় দেয়। এইরূপ ঘটনাকে আমরা ( Trance ) আবেশ বলিয়া বুঝিব। যাহার দেহে এইরূপ ঘটনা হয় তাহাকে ( Medium ) আবিষ্ট বলিয়া বুঝিব। আবিষ্টের যন্ত্রাশ্রয় করিয়া যে আত্মা বাস করে তাহাকে ( Control ) নিয়ামক বলিয়া বুঝিব। এই ঘটনা যদি সোজাসুজি বুঝিতে হয় তাহা হইলে মৃত ব্যক্তির আত্মার স্বাধীন সত্তা ত প্রমাণিত হইয়া যায়। অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সমিতি, ( Control ) নিয়ামক যে পরিচয় দেন তাহাতে আস্থা না করিয়া তাহার আভ্যন্তরীণ তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন. এক জনের অসাড় হস্ত অন্য ব্যক্তির ভাবসংক্রমণের দ্বারা সঞ্চালিত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া নিয়ামকের পরিচয় একটা কল্পনা মাত্র মনে করেন। সময় সময় এই নিয়ামকের সাহায্যে অন্য একটি আত্মা আপনার পরিচয় দিয়া থাকেন, এই আত্মাকে ( Communicator ) বা পরিচয়ার্থী বলা যাইতে পারে। ভাবসংক্রমণ ব্যাপার দ্বারাও এইরূপ পরিচয়ার্থী কল্পিত হইতে পারে আশঙ্কা করিয়া কএক বৎসর ধরিয়া অধ্যাত্মবিজ্ঞানসমিতি সামান্যতঃ ভাবসংক্রমণ ( Telepathy সম্পর্কশূন্য নূতন ঘটনার অনুসন্ধান করিতেছেন। সামান্যতঃ ভাবসংক্রমণসম্পর্কশূন্য বলিবার অর্থ এই যে সর্ব্ব প্রকার ভাবসংক্রমণবর্জ্জিত ঘটনা অসম্ভব, কারণ দেহহীন আত্মা যে অন্য দেহের মধ্যে কাজ করে তাহাও একরূপ ভাবসংক্রমণ। নিত্য চেষ্টার ফলে ক্রমে ক্রমে নূতন ঘটনা আবিষ্কৃত হইয়া—ভাবসংক্রমণ-বাদ পক্ষ নিরস্ত হইতেছে, আশা করা যায় অল্প দিনের মধ্যে স্বাধীন আত্মবাদ পক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে। আত্মবাদ পক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইলে, বিদেহ আত্মার সহিত দেহী আত্মার কি সম্বন্ধ, এই অত্যাবশ্যকীয় কথার অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে। যদিও এই সকল ঘটনার পর্য্যবেক্ষণ কালে বিদেহ আত্মার স্বরূপ ও পরস্পরের সম্বন্ধের দুই একটা কথা উঠিয়াছে, তাহা প্রমাণের

বিষয় নয় বলিয়া তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করা হয় নাই। আবেশ কালে আবিষ্ট ব্যক্তির নানারূপ অবস্থা ঘটিতে পারে। কেহবা নিরবচ্ছেদে যতক্ষণ পর্য্যন্ত নিয়ামকের কাজ হইতে থাকে ততক্ষণ অসাড় থাকেন। কাহারও বা যন্ত্রবিশেষ অসাড় হইয়া নিয়ামকের অধীন হইয়া কাজ করিতে থাকে। কাহারও যন্ত্রবিশেষ একবার নিয়ামকের অধীন, আবার নিজের অধীন, পুনরায় নিয়ামকের অধীন, বার বার ভিন্ন অবস্থাপন্ন হইতে থাকে।

১৮৭৪ সালে সর্ব্ব প্রথমে Stainton Moses তাঁহার আবেশ অবস্থার কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি আবেশ অবস্থায় সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য হইতেন না, তাঁহার হস্ত অসাড় হইয়া পরাধীন ভাবে কিছু লিখিত, আবার পরক্ষণেই হস্তের উপর নিজের কর্ত্তৃত্ব ফিরিয়া আসিত। Edmund Gurney এবং Myers ইহার বিষয় সমস্ত জানিয়াছিলেন। একদিনের ঘটনা; ১৮৭৪ সালের ৮ই এপ্রিল তারিখে Bedford সহরে তাঁহার পিতা ও মাতার সহিত একত্রে বাস করিতেছিলেন, কোন সময়ে তিনি লিখিতেছিলেন "আমি ইচ্ছা করি"—ইহার পর কতকগুলি খিচিমিচি দাগ পড়িতে লাগিল। তখন তিনি প্রশ্ন করিলেন, এ সমস্ত কি? কেনইবা আমাকে বাধা দেওয়া হইল? উত্তর হইল, কোন প্রেতাত্মা নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিতে চান এবং আমরা তাঁহাকে অনুমতি দিতে বাধ্য হইয়াছি। তিনি নিজে লিখিতে পারেন না, আমি তাঁহার হইয়া লিখিব, তাঁহার নাম Famy Westoboy। তুমি তাহাকে চিন?

প্রঃ। আমার স্মরণ নাই।

উঃ। তোমার মা তাঁহাকে জানেন—সম্পর্কে তিনি তাঁহার ভগিনী. তিনি গত মে মাসে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

প্রঃ। উহার কি বিবাহ হইয়াছিল?

উঃ। হাঁ, তাঁহার অবিবাহিত অবস্থার নাম Kirkham।

প্রঃ। Femy Kirkham? হাঁ আমার কতকটা মনে হইতেছে। তিনি Markbyতে বাস করিতেন?

উঃ। তিনি বলিতেছেন যে তাহার জন্ম হয় Alford এ, যে বাড়ীতে এখন Sam Stevenson থাকেন সেই বাড়ীতে। পরে তিনি Markbyতে থাকিতেন এবং বিবাহের পর Belchford এ থাকিতেন। Horn castle এ ৬১ বৎসর বয়সে তাঁহার পরলোক হয়। তোমার তাঁহাকে স্মরণ নাই। ১৮৪৫ সালে তুমি তোমার মার সঙ্গে তাহার সহিত দেখা করিতে Markbyতে গিয়াছিলে। তাহার মার মৃত্যুর পর তোমার মা তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য কিছুদিন সেখানে ছিলেন। সেই বাড়ীতে একদিন তুমি ছাগলে চড়িয়া বেড়াইতেছিলে এমন সময় ছাগলটা তোমাকে গমের পোকায় ফেলিয়া দেয় এবং গমের পোকা তোমাকে খুব কামড়াইয়াছিল। একথা তোমার মার নিকট জানিতে পার, ইত্যাদি। অনেকক্ষণ এইরূপ হইয়াছিল, পরে যখন Stainton Moses তাঁহার মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার মা বলিলেন, এত ছোটবেলার কথা তোমার মনে হইল কি করিয়া? সত্যই ত এরূপ হইয়াছিল। এবং যে ব্যক্তির কথা বলিতেছ তিনিও আমার আত্মীয় বটে।

Stainton Moses অনেক দিন পর্য্যন্ত

অনেক প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনা ভাবসংক্রমের দ্বারা ঘটিতে পারে, সুতরাং এগুলি দ্বারা প্রেতাত্মা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয় না। তাই চেষ্টা হইতে লাগিল যে প্রেতাত্মা যদি নিজের সম্বন্ধে এমন কোন বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতে পারেন যাহা অন্যের পক্ষে জানা সম্ভব নহে, তাহা হইলে প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করা যাইতে পারে। G. P. নামে কোন প্রেতাত্মার নিজের লিখিত প্রেমপত্র তাঁহার বাক্সের মধ্যে ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর সে বাক্স অন্যের হস্তগত হয় নাই। তিনি মৃত্যুর কিছুদিন পরে সমিতির পরীক্ষা-ক্ষেত্রে আবিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা সেই পত্রের লিখিত কথাগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে বাক্স আনিয়া দেখা গেল যে সমস্ত কথাই সত্য। এই জাতীয় ঘটনাগুলিকে অনেকে প্রেতাত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ বলিয়া গণনা করিতে পারেন, কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান সমিতির কোন কোন সভ্য ইহাকেও ভাবসংক্রমের সাহায্যে বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে পত্র যখন লেখা হয়, তখন পত্র লেখকের মনের ভাব অন্য মস্তিষ্কে সংক্রামিত হয়। সেই সংক্রান্তভাবের পুনরুদ্বোধের দ্বারা সেই পত্রের মর্ম্ম জানা সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং সমিতি অন্যবিধ ঘটনার অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন। প্রেতাত্মা নিজের পরিচয় দিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছে, সে নিজের সম্বন্ধে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্রগত বিশেষত্ব প্রকাশ করিলে সেই গুলিকে তাহার আত্মসত্তার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কারণ অসংখ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষত্ব দেখিয়া যেমন মানুষের পরিচয় হয়, অন্য কোন উপায়ে তেমন হইতে পারে না। এবং ভাব সংক্রমণের দ্বারা এই অসংখ্যাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিশেষত্ব একত্র সমাবিষ্ট হওয়ারও কোন হেতু দেখা যায় না। তাই এই প্রমাণকে তাঁহারা বিশেষ প্রমাণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন।

প্রথমে অধ্যাত্মবিজ্ঞান সমিতির পরীক্ষার জন্য Mrs Piper নামে কোন আমেরিকাবাসী স্ত্রীলোককে পরীক্ষাযোগ্য আবিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া মনে করা হয়। কারণ বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা তাঁহার কোন কপটতা বা শঠতার চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। ১৮৮৫ সালে তিনি আমেরিকার প্রসিদ্ধ দার্শনিক অধ্যাপক উইলিয়ম জেমসের সহিত পরিচিত হন। ১৮৮৯ সালে ইংলণ্ডে আনীত হন। অধ্যাপক জেমস্ তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণীর নিকট প্রথমে Mrs Piper এর আবেশের কথা শুনিতে পান। এবং সেই আবেশের সময় তিনি যে সমস্ত গোপনীয় কথা প্রকাশ করেন তাহা বড়ই বিস্ময়াবহ বলিয়া মনে হয়।

আরও দুই একজন আত্মীয়ের নিকট Mrs Piper এর আবেশের বৃত্তান্ত শুনিয়া অধ্যাপক জেমস্ তাঁহার স্ত্রীর সহিত উহা দেখিতে চান। এবং এই সকল ঘটনার মধ্যে কোন ধূর্ত্ততা আছে কি না তাহাই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করেন এবং স্পষ্টই বুঝিতে পারেন যে ইহার মধ্যে কোন শঠতার সম্পর্ক নাই। ১৮৯০ সালে Professor Oliver Lodge Mrs Piper এর সহিত পরিচিত হন। যখন সকলে বিশেষ অনুসন্ধানের দ্বারা বুঝিলেন যে পাইপ্যারকে লইয়া পরীক্ষা করিলে কোনরূপ

কপটতাসম্ভূত মিথ্যা ফলের সম্ভাবনা নাই, তখন অধ্যাত্মবিজ্ঞান-সমিতি পরীক্ষা আরম্ভ করেন।

Mrs Piper এর পরীক্ষার সময় নিম্নলিখিত রূপ ব্যবস্থা করা হইত। কোন নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে তাপ রক্ষার জন্য আগুন রাখিয়া দরজা জানেলা খুলিয়া দেওয়া হইত। বেশ একখানি ভাল চেয়ারে এমন ভাবে কতকগুলি বালিস রাখিয়া দেওয়া হইত, আবিষ্ট ব্যক্তি যেন সেই বালিসের মধ্যে মাথা রাখিতে পারেন। চেয়ারের সম্মুখে একখানি টেবিল রাখা হইত, সেই টেবিলে লিখিবার সরঞ্জাম, যথা—প্যাড, ১০০খানি সাদা কাগজ, ৪। ৫টি কাটা পেনসিল রাখা হইত। সমস্ত পরীক্ষার ব্যবস্থার জন্য একজন লোক নিযুক্ত থাকে, তাঁহাকে (Experimenter) পরীক্ষক বলা হয়। এই পরীক্ষক যখন আবিষ্ট ব্যক্তির নিশ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধা মনে করিতেন, তখন তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতেন। প্রথম প্রথম আবিষ্ট ব্যক্তি কথায় বলিতেন, পরে লিখিবার ব্যবস্থা হয়। এই সময় তিনি যদি কিছু মুখে বলিতেন তাহা পরীক্ষক লিপিবদ্ধ করিতেন। পরীক্ষার দিন বেলা ১০টার সময় Mrs Piper পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট ঘরে সেই চেয়ারে আসিয়া বসিতেন, এবং ৫ মিনিটের মধ্যে দীর্ঘশ্বাস লইতে আরম্ভ করিত এবং তাঁহার মাথা বালিসের মধ্যে পড়িয়া যাইত। আধ মিনিটের মধ্যে হাত খানি যেন জাগিয়া উঠিয়া টেবিলের উপর আসিত এবং পরীক্ষক পেনসিলটি হাতে দিতেন, অমনি লেখা আরম্ভ হইত। পরীক্ষক সম্মুখে থাকিতেন, যেমন একখানি কাগজ শেষ হইত সেখানি সরাইয়া লইতেন, অমনি আর একখানিতে লেখা হইত। হাতের চলনের ভঙ্গি দেখিয়া যেন হাতই স্বাধীন একজন এরূপ মনে হইত।

পেনসিল হাতে পড়িলে আশীর্ব্বাদসূচক এবং পৃথিবীতে আগমন জন্য আনন্দজ্ঞাপক দুই একটি কথা লিখিয়া নিয়ামক একটি স্বাক্ষর করিতেন। Mrs Piper র আবেশের সময় প্রথম প্রথম নিয়ামক ছিলেন একজন তাঁহার নাম Phinuit তাহার পর নিয়ামক হন Rector অথবা R. পরে আরও কেহ কেহ নিয়ামক হন। Rector যখন নিয়ামক তখন Phinuit অন্তর্হিত হন। এই দুইজন নিয়ামকের লেখার দ্বারা তাঁহাদের দুইজনের চরিত্রগত সুতরাং ব্যক্তিগত পার্থক্য বেশ বুঝা যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে নিয়ামক কেবল লেখকের কাজ করিতেন প্রকৃত পক্ষে পরিচয়প্রার্থী (Communicator) একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। এই সকল পরীক্ষার সময় অধ্যাত্মবিজ্ঞান সমিতির পক্ষ হইতে একজন দ্রষ্টা থাকিতেন, তাঁহাকে (Sitter) উপবেশক বলা হয়।

Mrs Piperকে লইয়া গত ২০ বৎসর পরীক্ষা হইতেছে। সমিতির পক্ষ হইতে এক এক জন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক পরীক্ষাকার্য্যে উপবেশক দ্রষ্টারূপে উপস্থিত থাকিয়া—৭। ৮ বৎসরে এক একটি প্রায় ৫০০শত পৃষ্ঠায় পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন—সেই সকল বিবরণ পাঠ করিলে ইহাঁদের কার্য্যের প্রকৃত গুরুত্ব অবগত হওয়া যায়। Mrs Piperকে লইয়া পরীক্ষাকার্য্য যাঁহারা আরম্ভ করেন—তাঁহাদের অনেকেই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই ইহলোকের সম্বন্ধ ত্যাগ করেন নাই।

সকলেই পরলোকে গিয়া সেখানে তাঁহারা বর্ত্তমান আছেন এই বার্ত্তার ঘোষণা আমাদের নিকট করিতে চান। অন্য লোকে পরিচয়ার্থী হইয়া আসিয়া যতটা পরিমাণ আত্মপ্রকাশ করিতে পারিয়াছেন ইহাঁদের চেষ্টায় তাহার অপেক্ষা অধিক হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে কারণ যে জাতীয় সন্দেহের অপনোদন হইলে স্বাধীন আত্মার সত্তায় লোকের বিশ্বাস হইতে পারে সেই জাতীয় সন্দেহ করিতে তাঁহারা অভ্যস্ত। সুতরাং সেই সন্দেহ অপনোদনের পথ তাঁহারা যেমন দেখিতে পাইবেন—সেরূপ অন্যে দেখিতে পাইবে না। প্রকৃত পক্ষে এক্ষণে স্বাধীন আত্মার প্রমাণ জন্য যতটা চেষ্টা এ দিক হইতে হইতেছে—ততটা চেষ্টা অপর দিক হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অপর দিক হইতে আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য একটা নূতন পথ প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ—দুই বা ততোধিক আবিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা একজন প্রেতাত্মা যদি নিজের পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন—এবং তাহার মধ্যে একটার অসম্পূর্ণতা যদি অন্যের দ্বারা পূর্ণ হয় তাহা হইলে ভাবসংক্রমণবাদ পক্ষ অনেক পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং আত্মার স্বাধীন অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার কারণ দৃঢ়ীভূত হয়। এই নূতন প্রথার নাম Cross correspondence। Mrs Verrall, Mrs Forbes, Mrs Holland প্রভৃতি অনেকেই এখন আবিষ্ট হইতেছেন। যে Hodgson, যে Meyers প্রভৃতি দার্শনিকেরা প্রথমে ইহলোক হইতে পরলোকের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য অনুসন্ধান আরম্ভ করেন—এখন পরলোক হইতে তাঁহারাই পরলোকের প্রমাণ দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ চেষ্টাও যে অনেক পরিমাণে ফলবতী হইয়াছে তাহাও আমরা দেখিলাম। যাহারা এই সকল প্রমাণ বিষয়ে বিশেষ অনুসন্ধান করিতে ইচ্ছা করেন—তাঁহারা অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সমিতি বা Psychical research societyর বার্ষিক বিবরণ পাঠ করিবেন। আমার এই সামান্য প্রবন্ধে গত ২৫ বৎসরের সমস্ত বিবরণের অতি স্থূল স্থূল কথার আলোচনা করাও সম্ভব নহে, তবে যে কথা গুলির উল্লেখ করিলে এই বিষয়ের বিশেষ অনুসন্ধানে লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতে পারে তাহা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

## হৃদয়-বীণা।

বীণা বাজাইতে যাই, বীণা ত বাজে না আব,
কিছুতে লাগে না সুর, ছিড়ে গেছে সব তার।
কত রাগ কত তান
বাজিয়াছে কত গান,
আজি সে হৃদয় বীণে গোলমাল হাহাকার।
বী।। বাজাইতে গেলে বীণা ত বাজে না আর।

কি যেন হইয়া গেছে সোনার বীণার মোর,
কি যেন হারায়ে গেছে টুটে গেছে কোন ডোর।
সুরহীন, গীতহীন,
পড়ে আছে ধূলিলীন
উৎসব হয়েছে শেষ, বাসর হয়েছে ভোর।
বীণা বাজাইতে গেলে বীণা ত বাজে না মোব।

তেমনি পাখীর গান, তেমনি উষার হাসি,
তেমনি চাদের আলো, ফুল্ল ফুল রাশি রাশি,
নিঝর তেমনি গায়
তেমনি তটিনী ধায়
সকলি তেমনি আছে, সেই ভাল বাসাবাসি।
বীণায় আমার শুধু নিবে গেছে হাসি রাশি।

হৃদে গাঁথা মোর এক আছিল রতন ওরে,
কি জানি কেন যে হায় কেবা নিল চুরি করে।
কত খুঁজিলাম তা'রে,
মিলিল না এ সংসারে,
গুমরি' উঠিছে প্রাণ, তাই সদা অশ্রু ঝরে।
ধূলিধূসরিত তাই বীণা মোর আছে পড়ে।

আজি এ দুখের দিনে বীণায় ঝঙ্কার তুলে'
মাঝে মাঝে গান গেয়ে একটু রহিব ভুলে'।
বীণা ত শুনে না হায়,
নীরবে থাকিতে চায়,
ছিন্ন তারে গ্রন্থি দিয়ে তা'রে বাজাইতে গেলে
সে যে গো কাঁদিয়া উঠে শুধু হাহাকার তুলে'।

কি জানি কেমন হায় যেন হ'য়ে গেছে মোর,
কিছুই লাগে না ভাল, ছিঁড়েছে সংসার ডোর।
মৃত্যু যেন শান্তিময়
আজ সদা মনে হয়
তা'র সে মিলিবে কবে, কবে নিশি হ'বে ভোর।
বীণা বাজাইতে গেলে বীণা ত বাজে না মোর।

---

# আর্য্যনীতি-বিজ্ঞান।

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

পুরাকালে জনকাদি রাজর্ষিপ্রমুখ নরপতিগণের মহোচ্চ আদর্শ ও তদানীন্তন প্রজাহিতব্রত ভূপতিগণের ঐকান্তিক কর্ত্তব্য পরায়ণতা দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জের রাজভক্তি সমধিক বর্দ্ধিত হইত। বিধিমতে প্রজারঞ্জন করেন বলিয়া ভূপতির নাম রাজা। যিনি যথার্থ রাজাপদবাচ্য তিনি সর্ব্বপ্রকার নিজসুখ ও স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া নিরন্তর প্রজাহিত কামনায় রত থাকেন। ইহ সংসারে রাজা ঈশ্বরের শক্তির, ন্যায়পরতার ও প্রজাপালন কার্য্যের প্রতিভূস্বরূপ। তাই ভগবদ্ভক্তির পরেই রাজভক্তির স্থান। অঙ্গিরা বংশোদ্ভব উতথ্য যুবনাশ্বনন্দন মান্ধাতা নরপতিকে এইরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, "হে মান্ধাতঃ ন্যায়পরতার সহিত সকলের রক্ষা করিবেন বলিয়া রাজা; স্বেচ্ছাচারীভাবে সকলের উপর আধিপত্য

করিবেন বলিয়া নহে। রাজা পৃথিবীর রক্ষক। ন্যায় ও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিলে রাজা পৃথিবীতে ঈশ্বর সদৃশ পূজালাভ করিতে সমর্থ হন। কিন্তু যদি অন্যায় ও অধর্ম্মাচরণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকে নরকে গমন করিতে হয়। ন্যায় ও ধর্ম্মদ্বারা প্রজাপুঞ্জ রক্ষিত হয় এবং রাজার দ্বারা ন্যায় ও ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়া থাকে। ন্যায় ও ধর্ম্মপরায়ণ রাজাই কেবল রাজা নাম পাইবার যোগ্য। যদি তিনি অন্যায় ও অধর্ম্মের দণ্ডবিধান করিতে না পারেন, তাহা হইলে দেবগণ তাঁহার গৃহ ত্যাগ করেন এবং তিনি সকলের নিন্দাভাজন হন। স্বদেশ হিতৈষণা (Patriotism) এবং স্বজাতি হিতৈষণার (Public spirit) সহিত রাজ ভক্তির অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। এই তিনটী সদ্গুণই অনেকাংশে সমধর্ম্মী এবং পরস্পরের চিরসহচর। কেহ কাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। মানব যেমন পিতামাতার সন্তান, তেমনি জন্মভূমিরও সন্তান—যেমন মাতৃগর্ভে জন্মলাভ করিয়া পিতামাতার শোণিতে পরিপুষ্ট হয় ও তাঁহাদের স্নেহে লালিত পালিত হয় সেইরূপ জন্মভূমিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহারই জল বায়ু, শস্যে পরিপুষ্ট হয় এবং তাহারই অঙ্কে পালিত ও শিক্ষিত হয়। জন্মভূমি প্রাচীন কীর্ত্তির গৌরব স্বদেশের ধর্ম্মবীর যুদ্ধবীর ও অন্যান্য মহাত্মাগণের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা, স্বদেশবাসীর প্রতি ঐকান্তিক সহানুভূতি—তাঁহাদের সুখ দুঃখে, জয় পরাজয়ে, সম্পদ বিপদে, সম্পূর্ণ সমবেদনা এবং জন্মভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ও শিল্প-বিজ্ঞানের উৎকর্ষে আত্মগৌরবজ্ঞান প্রভৃতি হৃদয়াবেগ হইতে স্বদেশহিতৈষণা ও সমাজ হিতৈষণার আবির্ভাব হয়। প্রত্যেক মনুষ্যের নিকট তাহার জন্মভূমিই জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শভূমি। সমাজহিতৈষণা (Public spirit) দেশহিতৈষণারই নামান্তর। যিনি সাধারণের হিতার্থে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের ক্ষতি স্বীকার করেন, তাঁহাকেই সমাজহিতৈষী (Public spirited) বলা যায়। স্নেহময় পিতা বা পুত্র যেমন পরিবারবর্গের মঙ্গলের জন্য সানন্দে আত্মসুখ বলিদান করেন, দেশ-হিতৈষী তেমনই দেশের কল্যাণের জন্য নিজ-স্বার্থ অকাতরে বলিদান করেন।

শিবপুরাণে—শতমন্যুর উপাখ্যানে জন্ম-ভূমির প্রতি কর্ত্তব্যনিষ্ঠার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। একদা অভির প্রদেশে মহা অনাবৃষ্টি ও দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে তদ্দেশবাসী পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়া ইন্দ্রযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে ভগবান্ ইন্দ্র প্রত্যক্ষ হইয়া সকলকে বলিলেন—'তোমরা মহাপাপ করিয়াছ সেই পাপের শাস্তিস্বরূপ এই অনাবৃষ্টি ও দুষ্কালের অবতারণা হইয়াছে। যদি কাহারও সর্ব্বগুণান্বিত বহুশ্রুত শুদ্ধ ও শান্ত একমাত্র পুত্র আপনাকে অগ্নিতে আহুতি দান করিতে পারে তাহা হইলে পর্য্যাপ্ত বৃষ্টি হইবে'। ইন্দ্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই হতাশ হইয়া পড়িলেন। সেই প্রদেশে শতমন্যু নামে এক সর্ব্ব-গুণান্বিত, বহুশ্রুত, শান্ত, দান্ত, ও বৈরাগ্যবান্ ব্রাহ্মণপুত্র বাস করিতেন। তিনি সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সর্ব্বসমক্ষে দেশের হিতার্থ, সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলার্থ আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পিতামাতা জীবিত থাকিতে তাঁহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে পুত্রের কোন

কাহারোই অধিকার নাই; তাই শতমন্যু পিতা-মাতার অনুমতি লইবার জন্য তাঁহাদের নিকট গমন করিয়া প্রণামপূর্ব্বক পিতাকে বলিলেন—"পিতঃ

"জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সী"

"জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ"

অতএব সেই জন্মভূমির জন্য এ দেহ ত্যাগ করিলে অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে। যে দেহের কোন নিশ্চয়তাই নাই, প্রাণান্তে যাহা হয় ভস্মসাৎ হইবে, না হয় শৃগাল কুকুরাদির আহার্য্য হইবে, অথবা জঘন্য কৃমিরাশিতে পরিণত হইবে সেই অকিঞ্চিৎকর জড়দেহ দানে যদি মাতৃভূমির—স্বদেশবাসী সকলের হিতসাধন করিতে পারি তাহা অপেক্ষা অধিকতর লাভ, অধিকতর নিঃশ্রেয়স আর কি হইতে পারে"? পিতা নীরব হইলেন তখন শতমন্যু মাতার নিকট গমন করিয়া আত্মোৎসর্গ করিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। মাতা সৎপুত্রের গুণ কীর্ত্তন করিয়া বলিলেন—"বাবা, আমিই অগ্নিপ্রবেশ করিতেছি তোমার মত লোক জীবিত থাকিলে জগতের বহুল মঙ্গল হইবে। তখন শতমন্যুর পিতা বলিলেন—'তোমরা দুই জনেই ধন্য, তোমাদের কাহাকেই অগ্নিপ্রবেশ করিতে হইবে না, আমিই অগ্নিপ্রবেশ করিয়া ইন্দ্রের তৃপ্তি সাধন করিতেছি"। তখন আকাশবাণী—সেই মহানুভবত্রয়ের স্বদেশপ্রেমের ও পরার্থপরতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন—'তোমাদের (আত্মোৎসর্গে) দৃঢ়নিশ্চয়তায় আবশ্যকীয় সরবণীয় কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়াছে"। অনন্তর সুবৃষ্টি হইয়া ধরাকে শস্যপূর্ণ করিল।

স্বদেশের জন্য প্রাণ পরিত্যাগেও কাহারও কুণ্ঠিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে কারণ দেশহিতৈষিতা ও স্বজাতীয় গৌরব রক্ষণেচ্ছার অভাব হইলে জাতীয় মহত্ত্ব রক্ষিত হয় না। সমগ্র দেশের উন্নতিতে, সমগ্র সমাজের উন্নতিতে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উন্নতি নির্ভর করে। সমষ্টিরও যে অবস্থা ব্যষ্টিরও সেই অবস্থা হইবে। সমষ্টির অভ্যুদয়ে ব্যষ্টির অভ্যুদয় সমষ্টির অবনতিতে ব্যষ্টির অবনতি। সমাজকে একটি বিরাট পরিবার বলিতে পারা যায়। এক পরিবারভুক্ত সকল ব্যক্তিই যেমন সমগ্র পরিবারের উন্নতির বা অবনতির ভাগী হয় তেমনি এক সমাজ বা জাতির সকল ব্যক্তিই সমগ্র সমাজের উন্নতি বা অবনতির ভাগী হয়। জাতীয় গৌরব রক্ষেচ্ছা হইতে দেশের সর্ব্বসাধারণের অভ্যুদয় বা অবনতিকে নিজের অভ্যুদয় বা অবনতি বলিয়া বোধ হয়, এবং বাস্তবিকও তাহাই বটে। সমাজহিতৈষিতা দ্বারা দুর্ব্বলকে উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার বাসনা মানবহৃদয়ে বলবতী হয়, ইহা আমাদিগকে অন্যায় ও অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে প্রণোদিত করে, রাজ্যের আইনের গৌরব রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর করে, সকলের প্রতি ন্যায়বিচারের জন্য দণ্ডায়মান হইবার প্রবৃত্তি দেয়, সমাজের অনিষ্ট দ্বারা নিজ ইষ্ট সাধন করিবার প্রবৃত্তি দূরীভূত করে এবং নিজ ইষ্ট ত্যাগ করিয়াও সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য পালনে প্রণোদিত করে। ভারতের প্রাচীন বীরগণ সর্ব্বদাই পরের মঙ্গলের জন্য বদ্ধপরিকর থাকিতেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে জনসাধারণের অভ্যুদয়ের জন্য চেষ্টা করিতে এবং সমগ্র মানবজাতির রক্ষা ও উন্নতিবিধান করিতে

উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। "যিনি কেবল নিজের ও নিজ পরিবারবর্গের মঙ্গল কামনা করেন, সেই অদূরদৃষ্টি অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি প্রকৃত প্রস্তাবে নিজের ও পরিবারবর্গের ভবিষ্যৎ সুখের মূলোচ্ছেদ করেন।

সর্বতোবাবে পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তি হওয়া সন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য। সনাতন ধর্ম্মশাস্ত্রের সর্ব্বত্রই এই বিধিটি ভূয়োভূয়ঃ উপদিষ্ট হইয়াছে। পিতামাতার আজ্ঞানুবর্ত্তিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত শ্রীরামচন্দ্র। যখন দশরথ কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্রে বাধ্য হইয়া তাহার প্রার্থিত রামবনবাসরূপ বর প্রদান করিয়াছিলেন, তখন কৈকেয়ী রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, যে তোমার জনক ভয়ে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। রামচন্দ্র উত্তর করিলেন,— "আপনিই আপনিই তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করুন, আমি ত্বরায় তাহা সম্পন্ন করিব। পিতার অভিলষিত সাধনের ন্যায়—তাঁহার আদেশ পালনের ন্যায়, আর কি পুণ্য কর্ম্ম আছে?" তাঁহার হিতৈষীগণ সকলে তাঁহাকে হৃতবুদ্ধি পিতার বাক্য অবহেলা করিতে উপদেশ দিলে, তিনি বলিয়াছিলেন "পিতৃ আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিবার সাধ্য আমার নাই, আমি পিতার আজ্ঞা পালন করিব।" তৎপরে পিতার মৃত্যু হইলে যখন ভরত রাজ্যগ্রহণে একান্ত অনিচ্ছুক হইয়া যৎপরোনাস্তি নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে তাঁহাকে সিংহাসনারোহণ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়াছিলেন, তখনও ভরতের সকল যুক্তি ও অনুরোধের বিরুদ্ধে রামচন্দ্রের সেই একমাত্র উত্তর যে "পিতার আজ্ঞা, আমি বনবাসী হইব ও তুমি রাজা হইবে। আমাদের উভয়েরই পিতৃ-আজ্ঞা পালন করা কর্ত্তব্য। আমার পিতার আজ্ঞা কখনও ব্যর্থ হইবে না।"

মহাভারতে আমরা ব্যাধরূপধারী এক ব্রহ্মজ্ঞের উপাখ্যান দেখিতে পাই। একদা কনিক নামক ব্রাহ্মণ তাঁহার পদপ্রান্তে তত্ত্বজ্ঞানশিক্ষা কামনায় আগমন করিলে, তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে স্বীয় পিতামাতার নিকট লইয়া গিয়াছিলেন। যে পরম রমণীয় প্রকোষ্ঠসমূহে তাঁহার বৃদ্ধ পিতামাতার আবাসমন্দির নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, তথায় সেই ব্রাহ্মণকে লইয়া গিয়া তিনি বলিলেন "আমার এই তত্ত্বজ্ঞান ও শান্তি কেবল পিতামাতার চরণ সেবার দ্বারা লাভ করিয়াছি"। অনন্তর পিতামাতার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণের পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন "এই পিতামাতাই আমার আরাধ্য দেবতা। দেবতার প্রতি যেরূপ পূজার্চ্চনা কর্ত্তব্য, আমি ইহাঁদের প্রতি সেইরূপ পূজার্চ্চনা করিয়া থাকি। * * * * জ্ঞানিগণ যে ত্রিবিধ অগ্নির কথা বলিয়া থাকেন আমার পক্ষে ইহাঁরাই সেই অগ্নি। হে ব্রাহ্মণ, আমার চক্ষে তাঁহারাই যজ্ঞ, তাঁহারাই চতুর্ব্বেদ। * * * পিতা, মাতা, পবিত্র অগ্নি, আত্মা ও গুরু এই পাঁচটি সকলের ঐকান্তিক ভক্তি ও পূজার পাত্র"। তদনন্তর তিনি কনিককে বলিলেন যে, বেদাধ্যয়ন আকাঙ্ক্ষায় পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া দূরদেশে আসা তাহার কর্ত্তব্য হয় নাই. "ত্বরায় গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তাঁহাদের পূজার্চ্চনা ও সন্তোষ বিধান কর, আমি ইহা অপেক্ষা উচ্চতর ধর্ম্ম জানি না"।

---